# বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ

কামরুদ্দীন আহমদ

# বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ

অখণ্ড সংস্করণ

কামরুদ্দীন আহমদ
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

ধ্রুপদ
ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন | ঢাকা

"Banglar Modhabitter Attmabikash" (Part 1 & 2 Combined) A book on Middleclass Life-style of Bangali (Bangladeshi) By Kamruddin Ahamed Published by Shokomal E. Kakon on be-half of Druphad Saityangan 46, Banglabazar/Ist floor, Dhaka 1100, Bangladesh. Druphad 2nd Print : 2006. Price Taka : Two Hundred Fifty Only.

ISBN: 984-8457-03-8

ধ্রুপদ

| | |
|---|---|
| প্রকাশনায় | ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন'-র পক্ষে<br>সুকোমল ই. কাঁকন<br>৪৬ বাংলাবাজার/২য় তলা, ঢাকা ১১০০ |
| দ্বিতীয় সংস্করণ | ২০০৬ |
| একমাত্র পরিবেশক | নওরোজ সাহিত্য সম্ভার |
| প্রচ্ছদ | মোবারক হোসেন লিটন |
| কম্পোজ | নসাস কম্পিউটার্স<br>নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ<br>৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ |
| মুদ্রণে | হেরা প্রিন্টার্স<br>৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা ১১০০ |
| মূল্য | দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র। |

উৎসর্গ

*আমার কনিষ্ঠ পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিজামুদ্দীন আজাদ*
*ও তার সঙ্গীরা যারা বাংলার জনগণের জন্যে ১৯৭১ সনে*
*যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করেছে তাদের নামে—*

## কৃতজ্ঞতা

জীবন-প্রভাত হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমার দু'চোখ ক্যামেরার মত যেসব ছবি তুলেছিল এ সুন্দর পৃথিবীর অগণিত দৃশ্যের তার অর্থ সেদিন ভাবতে পারিনি, ছবিগুলোও এলো মেলো, সাদা কালো, রঙিন নানা ভাবেই উঠেছিল। আজ জীবন-সায়াহ্নে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন জীবনস্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছিলাম তখন দেখলাম সেই নিগেটিভ্ ছবিগুলো যেন ভিন্ন রূপে আমার কাছে ধরা দিতে থাকলো। সেদিন যে ছবিগুলোর ভেতর কোন অর্থই খুঁজে পাইনি আজ তা অর্থযুক্ত মনে হতে লাগলো। সেগুলোর ভাব ভাষা যেন আমাকে আরও গভীরে নিয়ে গেলো। দেখলাম এসব তলিয়ে পাওয়া ছবিগুলো আজ যেন প্রকাশিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। তারা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমার সান্নিধ্যে যারা এলো তাদের কাছে এ দৃষ্টিগুলোর কথা প্রকাশও করে ফেললাম নানা প্রসঙ্গে। তারাও আমাকে তাগিদ দিতে আরম্ভ করলে এগুলো ভাষার লিপিতে যেন প্রকাশ করি। আমার কিন্তু এ ধারণা কোনদিনই ছিল না যে এই দৃষ্টিগুলো জীবন্ত হয়ে কোনদিন ভাষায় রূপ নেবে এবং প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমার লেখিকা বোন রিজিয়া রহমানের উৎসাহ, বন্ধু আবদুল হক সাহেবের পরিশ্রমই এ বই প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছে। ছবিগুলোর বিশ্লেষণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ বা কোন মতামতের সমর্থনেও নয়। যদি কোথাও এরূপ বিশ্লেষণে কাহারও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা লেখকের অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ—কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। বর্তমান খণ্ডে আমার তোলা সব ছবিগুলোই বিশ্লেষণ করতে পারিনি। তবে আশা আছে পরবর্তী অংশগুলোতে সবগুলোই বিশ্লেষিত হবে।

বইটি ছাপার ব্যাপারে সাহায্য করে যারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীদেবব্রত রায়। মর্ডার্ণ টাইপ ফাউন্ডার্স প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেকটর জনাব নুরুল হক সাহেবের আন্তরিক সহানভূতি না থাকলে আমার এ বই লাইনো টাইপে ছাপা সম্ভব হতো না। বইটির পাণ্ডুলিপি ও অঙ্গসজ্জা দেখে দিয়েছেন শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। তাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। সর্বোপরি, আমি লেখক নই, সাহিত্যে আমার পড়ার রুচি থাকলেও প্রকাশে ক্ষমতা নেই। ভাষার ত্রুটি, ছাপাখানার ত্রুটিজনিত বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ত্রুটিগুলো দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যা রইলো তা পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতিশীল দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিলুম।

"বাংলার (মুসলমান) মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ"-এর যেটুকু আমার নিজস্ব চোখের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাই বর্ণনা করেছি। এতে পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করবেন তাদের চলার পথে এ বই-এর সার্থকতা আছে কি না।

ঢাকা : ১৩৮২ বাংলা

—কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

## কৈফিয়ৎ

আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন যা আমি এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখেছি বা জেনেছি তা আমি লিখতে শুরু করেছিলাম অনেকটা আত্মজীবনীর রূপরেখায় যখন আমি ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের ফৌজি আইনে গ্রেফতার হয়ে গরাদের অন্তরালে ছিলাম। লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম যে কারণে, তা এ পুস্তকের সূচানাতেই বলেছি। আমার জীবনের প্রথম সাতাশ বছরের ঘটনাপুঞ্জ লেখা শেষ হতেই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং মোটে বারো দিন যুদ্ধ চালাবার পরই পাক-বাহিনী ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ও মুক্তিসেনার নিকট আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১-এর ১৭ই ডিসেম্বর আমরা কারাগার থেকে মুক্তি পাই। তারপর ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা সংসার-এর ভাঙ্গন রোধ করতে ব্যস্ত রইলাম অনেকদিন। ভাঙ্গা ঘর আবার ভাল হলো, কিন্তু ভাঙ্গা সংসার আর কিছুতেই জোড়া লাগাতে পারলাম না। তাই এ লেখাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

অনেকদিন পর একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম সাহেব, যিনি বিপ্লবী রাজনীতি করে সরকারের কোপানলে পড়ে বহু বছর কারাবাস করেছেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, জেলখানায় আমি যে লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম সেটা শেষ করেছি কিনা। উত্তরে বললাম যে, লেখাটা জেলখানায় যেখানে ইতি করেছিলাম সেখানেই রয়ে গেছে। আমাকে বললেন,—"ওটা শেষ করুন।" এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমরা একই দিনে ধরা পড়ি এবং একই সাথে সিপাইবেষ্টিত হয়ে মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে যাই, দু'জনের হাত একটি হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। আবার একই দিনে মুক্তি পাই। রাতে কেরোসিনের বাতিতে যতটা লেখা হতো ততটা পরের দিন সরদার সাহেব, ডাক্তার ওয়াদুদ, সাইন্স ল্যাবরেটরীর ডক্টর কেয়ামুদ্দীন এবং ডক্টর ফজলে রাব্বি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপক প্রফেসর আহ্‌সানুল হক সাহেবকে পড়ে শুনাতাম। অনেকটা সময় কাটাবার জন্যও বটে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কেন লিখছি ? কার জন্য ? নতুন যুগের মানুষ জীবন সংগ্রামে এত ব্যস্ত যে তাদের বই পড়ার সময় কোথায়! যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে পুরানো কথা ভাবতে সময় দেয় না, তবে মনে হয় যারা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, সকাল-বিকাল বেড়ান আর সময় কাটাবার জন্য পড়াশুনা করেন, তাদের জন্যেই আমার এ লেখা। Yeats-এর ভাষায়,—

> *"When you are old and grey and full of sleep,*
> *And nodding by the fire, take down this book*
> *And slowly read and dream of the soft look*
> *Your eyes had once, and their shadows deep."*

জেলখানায় বসে লেখার সঙ্গে বাইরে বসে লেখার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

জেলখানায় ছিল অফুরন্ত সময় আর এখন লেখা হচ্ছে নানা কাজের ভীড়ে সময়ের অভাব, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধিকক্ষণ কোন কিছুতে মনোনিবেশ করতেও পারি না। তার উপর বেশি কাজ না করতে আমার চিকিৎসকগণ নিষেধই করেছেন।

অল্প বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম—মা'র মৃত্যুর সময় আমি স্কুলের ছাত্র, আর পিতার মৃত্যুর সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার জীবনতরী তখন থেকে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে অনেকদিন নিজে চালাবার চেষ্টা করিনি—কারণ আমার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান ছিল না। নানা রকমের ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম—কোন আদর্শ নেই, নেই কোন লক্ষ্যস্থল, নেই ভালবাসা। মায়া-মমতার জন্য চিরদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু পরে বুঝেছি আমি কেবল মরীচিকার পেছনে ছুটেছি। কবির ভাষায়, "আমার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।" যাকে ভেবেছিলাম আমার প্রিয়জন, যাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম, যাদের আজও ভুলতে পারিনি, তারা সবাই আজ আমার কথা ভুলে গেছে,—

*"Life, like a dome of many coloured glass,*
*Stains the white radiance of eternity*
*Until Death tramples it to fragments—Die"*

ছোটবেলা থেকে মা'র মুখে শুনে আসছিলাম আমাকে বিখ্যাত উকিল হতে হবে—এই তাঁর একান্ত ইচ্ছে—কারণ তাঁর ভক্তি ছিল দেশবন্ধুর প্রতি, যিনি ছিলেন খ্যাতনামা উকিল। এর ফলে আমার মনে এ ধারণা জন্মাল যে, একমাত্র ওকালতি ব্যবসার ভিতর দিয়েই দেশ ও দশের সেবা করা যায় এবং নিজেকেও প্রতিষ্ঠা করা যায়। অবশ্যই পরবর্তীকালে এ ব্যবসায় নেমে বুঝতে পেরেছিলাম আমার সেই ধারণার মধ্যে অনেক ভুল রয়ে গিয়েছিল। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে উকিল না হলে সমগ্র সমাজের যে চিত্র আমি দেখেছি তা থেকে বঞ্চিত হতাম। এ ব্যবসার মধ্যে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল তার ফলে আমি মানবতাবাদ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মানুষের মধ্যে যে পশুটি লুক্কায়িত আছে তা কিভাবে এবং কখন যে ক্ষমতাশালী হয়ে তার মনুষ্যত্ববোধকে ও তার বিবেক-বিবেচনাকে পরাজিত করে তার পদস্থলন ঘটায় তা কেউ জানে না। মানুষের মধ্যে যে দেবতাসুলভ গুণ রয়েছে তাও প্রকাশ পেতে দেখেছি এমন মানুষের মধ্যে যার নিকট এটা আশা করা অসম্ভব বলে মনে হয়। মানুষ যে কতটা নীচ হতে পারে আবার কতটা সৎসাহসী হতে পারে তা প্রত্যক্ষ না করলে বুঝতেই পারতাম না এ ব্যবসায় যোগ না দিলে। আমার আজ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে পাপীকে আমরা যতটা ঘৃণা করি ততটা করি না পাপকে।

আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন মানুষই দেবতা নয়—আবার কেউ একেবারে নরপশুও নয়। একজন ভারতীয় গ্রন্থকার লিখেছেন,—

*"কোর্টে না গেলে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না। বাইরে যার ভদ্রবেশ সেও যে কত হীন হতে পারে, মানুষ যে কত মিছে কথা বলতে পারে, গৃহস্থ বাড়ির বউ যে কেমন করে বেরিয়ে যেতে পারে, মায়ের পেটের ভাই যে কেমন করে ভাইকে খুন করতে পারে, ভদ্রলোক কেমন করে ব্ল্যাকমার্কেট ও স্মাগল করতে পারে—এ সব খবর কোর্টে না গেলে জানা যায় না। সমস্ত সমাজের চেহারাখানা কোর্টে এসে উলঙ্গ হয়ে যায়, মানুষ যেন বে-আব্রু হয়ে পড়ে কোর্টে এসে। এখানে অহঙ্কারীর অহঙ্কার, দরিদ্রের দারিদ্র্য, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য সব কিছু বানচাল হয়ে যায়। এখানে এসে সাধু ভণ্ড বলে*

*প্রমাণ হয়, ভণ্ড সাধু। এখানে অনুমানের কোন স্থান নেই—স্থান আছে প্রমাণের। এখানে প্রমাণ করতে পারলে অসতী সতী হয়ে যায়। প্রমাণ দাখিল করতে পারলে খুনী এখানে বেকসুর খালাস পাবে। টাকা দিয়ে এখানে প্রমাণ কেনা যায়, প্রমাণ বেচা যায়।"*

আমি পণ্ডিত ব্যক্তির চেয়ে জ্ঞানী লোককে বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আমি বৃদ্ধা বা প্রৌঢ় লোকের সঙ্গের চেয়ে যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গ বেশি পছন্দ করি। কারণ যারা পণ্ডিত তারা পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য অতীতের পণ্ডিতদের কথাগুলি আওড়িয়ে যায়, তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন কথা বড় শুনি না। অন্যদিকে যারা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় তারা তাদের বিগত জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতেই ভালবাসেন—এদের দৃষ্টি অতীতের দিকে। আমি শুনতে চাই আগামী দিনের কথা—ভবিষ্যতের রূপরেখা। যারা বিগত দিনের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায় তাদের আমি মৃত বলে মনে করি। মানুষের সুবেশ ও সুন্দর দৈহিক অবয়ব আমাকে আকৃষ্ট করে না ততটা যতটা করে মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য আর সংস্কৃতিবান মন। যদিও আমি জীবনের সায়াহ্নে আজ পরিশ্রান্ত—বায়রনের কথায়,—

*"My days are in the yellow leaf;*
*The flowers and fruits of love are gone;*
*The worm, the canker, and the grief,*
*Are mine alone."*

জীবনে অনেক দেখেছি এবং পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে আছি। সমস্ত দেশটাই যেন বদলে গেল চোখের সামনে। শুধু ভূগোলই বদলায়নি, শুধু ইতিহাসই বদলায়নি, মানুষের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে—বিশ্বের চেহারা এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে কিছুতেই এর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছি না। সেক্সপিয়রের ভাষায়,—

*"All world's a stage.*
*And all the men and women merely players*
*They have their exits and entrances."*

আমি নিজেও অনুভব করছি যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যতটা চিন্তা করতে আনন্দ পাই ততটা পাই না কথা বলতে—পাণ্ডিত্য জাহির করতে। অথচ আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে আমাকে হাভানায় যখন একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে, তোমার কি করতে ভাল লাগে—আমি বলেছিলাম বই পড়তে, কথা বলতে, আর ধূমপান করতে। বই পড়তে এখনো ভাল লাগে, কিন্তু বাকী দু'টোর প্রতি আমার আকর্ষণ আজ আর নেই বললেই চলে। ১৯৫৮ সনের ১২ই এপ্রিলের পর আর কোনদিন ধূমপান করিনি। একসময় পার্টি রিসেপশনে যেতে আনন্দ পেতাম। কত লোকের সঙ্গে দেখা হতো, কত হাসি, ঠাট্টা, কৌতুক, কিন্তু এখন ? এখনো ব্যবসার প্রয়োজনে দু'এক স্থানে যাই, কিন্তু সবার আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। আমি কেবল দ্রষ্টা হয়েই থাকি, অংশীদার হতে পারি না।

আমার মানসিক পরিবর্তন এমন হয়েছে যে, আমার অতি স্বজন ও প্রিয়জনের ক্ষেত্রেও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু আমাকে বিচলিত করে না। মৃত বা মরণোন্মুখ মানুষ, ঝরে যাওয়া শুকনো ফুলের পাঁপড়ি, ঊষাকালের বিলীয়মান ও ফ্যাকাশে চাঁদ আমার ভাল লাগে না। আমার মনে হয় আমি যেন পালিয়ে যেতে চাই সবার কাছ থেকে। কিন্তু এটাও জানি আমি

নিজের কাছ থেকে কিছুতেই পালাতে পারছি না। ডি. এইচ. লরেন্সের ভাষায়,—

*"And it is time to go, to bid farewell to one's ownself,*
*And find and exit from the fallen self."*

চণ্ডীদাসের মত আমিও বিশ্বাস করি যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" যেমন দেশের উপর মহাদেশ, যেমন কালের উপর মহাকাল, তেমনি ইতিহাসের উপর রয়েছে ইতিহাস-স্রষ্টা মানুষ জাতি। আমি মানবতাবাদে বিশ্বাস করি। মানবতাবাদের সঙ্গে সমাজবাদের কোন বিরোধ আমি দেখতে পাই না—তবে সাম্যবাদী পণ্ডিতদের যে চুলচেরা আলোচনা ইদানীং চলেছে তার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয় না। সারাজীবনই আমি মনের দুয়ার খুলে রেখেছি আর এটা বিশ্বাস করেছি যে, আমার বুদ্ধি ও যুক্তির মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পারি-পার্শ্বিকতার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যুক্তি ও বুদ্ধি বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রথম জীবনে বাঁচার তাগিদে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেছি—পরে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার নিজের আনন্দকে পরিহার করতে হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রথমে স্বজাতিকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে—বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ হবার পর নিজেকে মানবসমাজের একজন বলে ভাবতে শিখেছি—জাতীয়তাবাদী থেকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকবাদী হয়ে উঠেছি। তবে এটাও মনে রেখেছি পণ্ডিতরা বলেছেন, "আন্তর্জাতিককতা ভাল জিনিস, ওটা না হলে আজকের দুনিয়া চলতে পারে না—আবার জাতীয়তাবাদও ভাল জিনিস, এ না হলে না হবে কাব্য—না হবে আর্ট, না হবে লোকসঙ্গীত।" আমার দেশের ভাটিয়ালীর সঙ্গে ভল্গা বোটম্যানের সুরের যত মিলই থাকুক—দু'টি গানের সুরের মধ্যে যেন দুটো বিভিন্ন প্রাণের সন্ধান পাই। "এবস্ট্রাক্ট" ছবি আন্তর্জাতিক ঐশ্বর্য—কিন্তু কোন জাতির আত্মার প্রকাশ করতে হলে শিল্পীকে দেশের মাটি ও দেশের মানুষের উপর ভিত্তি করে প্রকৃতিকে রূপায়িত করতে হবে।

আমার ব্যক্তিত্ব প্রথম প্রকাশ পায় আমি যখন নিজেকে বাঙালি বলে অনুভব করি, কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে যখন আমাকে বিশ্বের একজন অধিবাসী বলে ভাবতে পারি। বাংলার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমি যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত হতে চাই বিশ্বের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গে। বাংলার যেমন একটা আত্মা আছে তেমনি আছে এশিয়ার আত্মা তার উপর আমি মানুষ জাতির একজন, তাই মানবাত্মায় আমার আস্থা রয়েছে।

আজকাল কেউ মনে করে সমাজবাদ মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ—আবার কেউ ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মানুষ কেবল উৎপাদনের যন্ত্রাংশ। আমার কাছে মনে হয় দুটোই সত্য। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি—সমাজবদ্ধ না হলে মানুষ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে পারত না—কিন্তু তাই বলে অনেক পণ্ডিতের সমবায়ে যেমন "হেমলেট" লেখা হয় না, তেমনি কয়েকজন শিল্পী একত্রে বসে তুলি চালিয়ে "মোনালিসা" সৃষ্টি করতে পারে না।

যুগ যুগ ধরে আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছি মানুষ মানুষের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে—গোষ্ঠীর নামে, ধর্মের নামে, রাজ্য রক্ষা বা রাজ্য দখলের নামে, সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে, এমনকি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার নামে, তার একটা ছোট অংশও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা রোগে, শোকে মারা যায়নি। দু'দুটো মহাসমরে হিটলারের ইহুদী ধ্বংস, ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের বাংলায় হত্যাযজ্ঞ—জাপানের

অগ্রসর প্রতিহত করার জন্য বৃটিশ রাজের বাংলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে যত লোক প্রাণ দিয়েছে তার একটা ক্ষুদ্রাংশও স্বাভাবিক কারণে মারা যায় না।

যদিও আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, কিন্তু তখন আমার বোঝার মত বয়স হয়নি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, বৃটিশ ভারত ছাড়ার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আরো পরে পাকিস্তান সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে।

১৯৪০ সনে যদিও ইউরোপে যুদ্ধ চলছিল—কিন্তু তার ধাক্কা এসে লাগেনি আমাদের দেশে ১৯৪১ সনের পূর্বে। বার্মার পতনের পর সে ধাক্কা এল। তারপর দেখলাম গান্ধীজির ১৯৪২ সনে "ভারত ছাড়" আন্দোলন, মাতঙ্গীনি হাজরার মত কত দেশাত্মবোধে জাগ্রত মানুষের আত্মবলিদান—আবার সীতামহরির মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে কেটে টুকরো টুকরো করে বর্শার অগ্রভাগে তার মাংসখণ্ড গেঁথে জনতার মিছিল। যে কারণে চৌরিচৌরা থানায় ১৯ জন পুলিশের মৃত্যু সংবাদে গান্ধীজি অসহযোগ—খেলাফত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন—সে কারণে "ভারত ছাড়" আন্দোলনও বন্ধ করা উচিত ছিল নাকি? মহানুভবতা ও রাজনৈতিক স্ট্রেটেজি অনেক সময় একই পথে চালনা করা যায় না।

১৯৪০ সনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মুসলমানেরা সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল—সে কারণেই সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা থেকে অনেক নেতাই বিরত ছিলেন। ১৯৪০ সনে অনেকটা বাধ্য হয়ে এবং অনেকটা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ফলে তারা রক্ষাকবচের প্রশ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের ভিন্ন জাতি বলে দাবী করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আবাসভূমি দাবী করে। সংখ্যালঘু সমস্যা তখন থেকে নতুন মোড় নেয়—মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আবাসভূমিতে সংখ্যালঘুদের তারা যে সকল সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় যা হিন্দু ভারতের সংখ্যালঘুদের দেয়া হবে।

জীবনের যে মূল্যবোধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ছিল—তার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল যখন যুদ্ধের ফলে মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের একমুঠো ভাতের জন্য—একটু ফেনের জন্য হাহাকার ধ্বনিত হলো। অন্যদিকে কালোবাজারী, মুনাফাখোরদের অর্থের জৌলুষ। গান্ধীজি বললেন,—"যুদ্ধের ফলে মৃত্যু হবে সত্যের ও সাধুতার।" মনে হলো যেন সব মিথ্যা—সবই শুধু অভিনয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল যে অর্থ শুধু প্রয়োজনই মিটায় না গৌরব বৃদ্ধিও করে। যার টাকা আছে তাকেই সবাই সমীহ করে শ্রদ্ধাও করে। কারণ সংসারে যার টাকা আছে তারই ক্ষমতা আছে। তাই সবাই সরস্বতীর পূজা ছেড়ে দিয়ে কুবেরের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছে—কারণ তারা জানে ধনকুবের হতে পারলে সরস্বতীর পূজারীরা তার দুয়ারেই ধর্ণা দিবে বেঁচে থাকার তাগিদে।

আজ মনে হচ্ছে জীবনে আমি শুধু নিষ্ফল প্রয়াসই করেছি—জীবনে আমি কি পেয়েছি, কি পাইনি—তার হিসাব আজও মিলাতে পারিনি। জীবনে যা পেয়েছি তাই কি চেয়েছিলাম? না যা চেয়েছিলাম তা ভুল করে চেয়েছিলাম—তাই পাইনি। ১৯৭৪ সনের জানুয়ারী মাসে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রফেসর সত্যেন বসু ভারতের শিক্ষামন্ত্রী নূরুল হাসানকে লিখেছিলেন,—

> "The evening of life is almost invariably a satire on the eager, brilliant, hopes of the dawning manhood."

১৯৫২ সনে ইন্দোনেশিয়ায়, ১৯৫৩ সনে কিউবায় আর জেনেভায় গিয়েছিলাম আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় মেহেনতি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে, তার উপর নিমন্ত্রণ ছিল বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ও প্যারিসের শ্রম সংস্থার পক্ষ থেকে—তাই সে বছরই আমেরিকা ছাড়াও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৫৬ সনে জাতিসঙ্ঘে সাধারণ পরিষদে ও ১৯৫৭ সনে সিকিউরিটি কাউন্সিলে (নিরাপত্তা পরিষদে) সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলাম। ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশনের অনুরোধে গিয়েছিলাম পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে। আর রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি বছর।

Keats-এর ভাষায়,—

*"Much have I travelled in the realms of gold*
*And many godly states and kingdoms seen,*
*Round many western islands have I been*
*Which bards in fealty to Apollo hold."*

জীবনের প্রথম সাতাশ বছরের ঘটনাপুঞ্জ যা এ পুস্তকের এ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে জীবনের ঘাত ও প্রতিঘাত তত প্রকট হয়ে উঠেনি—তখনো সব কিছুই সুন্দর মনে হতো। আরো মনে হতো স্রষ্টা যেন পৃথিবীটাকে সৌন্দর্যে সকল দিক দিয়ে ভরপুর করে রেখেছে তাই জীবনের সেই অধ্যায়কে ভিন্ন করে ছেপে দিলাম। ১৯৪০ সনে বাঙালি মুসলমান সমাজের পক্ষে একটি যুগের অবসান তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে, "ঘড়ির কাঁটা দেখে যুগের আরম্ভ হয় না, যুগের সমাপ্তিও হয় না; প্রকাশেরও পূর্বে চলে আয়োজন, আর সমাপ্তির শেষে থাকে জের বা পরিশিষ্ট।"

দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক কথাই আমার প্রকাশিত "A Socio-Political History of Bengal"-এ বলা হয়ে গেছে। তবে আমি চেষ্টা করব তাই বলতে যা বলা হয়নি কোন ইতিহাসে বা বলা যায় না ইতিহাসে। আমার আত্মজীবনী 'রেখাচিত্র' আমার পূর্ব প্রকাশিত ইতিহাস বইয়ের অনুবাদ নয় পরিপূরক হতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আমার রাজনৈতিক জীবন, কূটনৈতিক জীবন এবং ওকালতি জীবনের প্রতি আলোকপাত—আমাদের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। শেষ হবে আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন বলতে চাইব,—

*"Thus let me live, unseen, unknown.*
*Thus unlamented let me die,*
*Steal from the world, and not a stone*
*Tell where I lie."*

অনেকদিন ভেবেছি এত লেখক আমাদের দেশে "অতীত দিনের স্মৃতি" লিখে গেছেন যে আমার এ লেখায় কোন নতুনত্ব থাকবে না, লেখা হবে তাই পন্ডশ্রম। পরে মনে হলো যে আজ পর্যন্ত যারা লিখেছেন অথবা যাদের লেখা আমার চোখে পড়েছে তাদের প্রথম জীবনের কর্মস্থল ছিল কলকাতা—তাই কলকাতার রাজনীতি ও সমাজনীতি তাদের লেখায় বেশি ফুটে উঠেছে। আমার জীবনের শুরু ঢাকায় আর শেষও ঢাকায় তাই ঢাকার রাজনীতি ও সমাজনীতিই বেশি প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। সেদিন থেকে পাঠক হয়ত লেখার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব পেতে পারেন।

ঢাকা, আশ্বিন ১৩৮২ বাংলা

—কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

## প্রথম খণ্ডের সূচনা

আজ আমি গরাদের অন্তরালে, কোনদিন মুক্তি পাব কিনা জানি না। তাই বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন আমি যা দেখেছি এবং যার সাথে জড়িত ছিলাম তাই লিখে রেখে যেতে চাই। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক মহৎ ও রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে-সব নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ও ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ করে বাংলার মুসলিম সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিধারার বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

আমার "Socio-Political History of Bengal"-এর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের নিকট আমার আজকের বিবরণ অনেকটা পুররাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রাজ-রোষে আজ যখন আমি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তখন আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিই আমার নিকট সত্য বলে মনে হচ্ছে। পণ্ডিত নেহেরু আহ্‌মদনগর ফোর্টের বন্দীশালার নির্জন কক্ষে বসে লিখেছিলেন,—

> "Time seems to change its nature in prison. The present hardly exists, for there is an absense of feeling and sensation which might seperate it from the dead past. Even news of active, living and dying world outside has a certain dream-like unreality, an immobility and an unchangeableness as the past."

কারাগারে বসে বারট্রান্ড রাসেল লিখেছিলেন,—

> "There never was such a place as prison for crowding images—one after another. They come upon me—memories of sunset long ago, all the way back into childhood. What is the use of shutting up the body of sensing that the minds remain free."

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কারাগার থেকে বেরিয়ে যে কথা কাগজে লিখেছিলেন তাও মনে রাখার মত। তিনি বলেছিলেন,—

> "What a world of difference there is between hearing and seeing from outside and actual experience. No one who has not been in prison for any length of time can even visualize the numbness of spirit that can creep over one when as Oscar Wilde writes—"each day is like a year, a year whose days are long." When day after day is wrapped in sameness and inspite of deliberate humiliation one survives. Pathic Lawrence said : "The essential fact in the life of the prisoner is that he takes on sub-human status." Herded together like

animals, devoid of dignity or privacy, debarred not only from outside company or news but from all beauty and colour, softness and grace. The ground, the walls, everything around us are mud-coloured and so our jail-washed clothes."

কারাগারের গ্রন্থশালায় বহু মনীষীর লেখা পুস্তক রয়েছে এবং আমি প্রায় সবগুলিই পড়েছি বলে আমার মনে হয়—কিন্তু এঁদের সবাই নিরাপত্তা আইনে বন্দী ছিলেন। 'মার্শাল ল'তে বা ফৌজী আইনে বন্দীদের মধ্যে কিছু লিখেছেন এমনি কোন লেখকের লেখা অন্ততঃ জেল-লাইব্রেরীতে আমি পাইনি। পার্থক্য হচ্ছে যে নিরাপত্তা বন্দী জানে না কোনদিন সে ছাড়া পাবে—কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে বা করা হতে পারে এমনি মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়ে কারাজীবন কাটাতে হয় না। অথচ যারা ফৌজী আইনে ধরা পড়েছে তারা প্রতিদিনই মৃত্যু ও দৈহিক নির্যাতনের কথা স্মরণ করে দিন কাটায়।

জেনারেল ইয়াহিয়ার বন্দীশালায় আমার বর্তমান যখন অনিশ্চিত, আর ভবিষ্যৎ অন্ধকার—তখন একমাত্র লুপ্ত অতীতকে স্মরণ করেই এখানকার অফুরন্ত সময় কাটানো যেতে পারে। প্রথম তিন সপ্তাহ জেলখানায় মেঝের উপর একখানা নোংরা কম্বল আর একখানা কম্বলকে বালিশের মত করে এক কাপড়ে বসে এবং শুয়ে কাটাতে হতো যদি না একজন দীর্ঘকাল সাজা পাওয়া আসামী তার গামছাখানা ঐ কম্বলের উপর পেতে না দিত প্রথম রাতে। দ্বিতীয় দিন অবশ্যই জেলখানায় যখন জানাজানি হয়ে গেল যে আমি ও সরদার ফজলুল করিম সাহেব দশ নম্বর সেলে বন্দী তখন দশ বছর সাজা প্রাপ্ত ঢাকেশ্বরী মিলের মালিক সুনীল বোস দু'খানা চাদর গোপনে না পাঠিয়ে পারেননি। দিনের বেলা চাদর দু'খানা লুকিয়ে রেখে রাতে সে চাদর ব্যবহার করতে হতো কারণ জেল কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে চাদর তো ছিনিয়ে নিতেনই—উপরন্তু সুনীল বাবুকে আর বিছানার চাদর পেতে হতো না। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, কেউ দেখা করতে আসতে পারে না—আমার স্ত্রী-পুত্ররা তো ঐ তিন সপ্তাহে বহু পরিশ্রম করেও জানতে পারেনি যে আমি কোথায় আছি। ক্যান্টনমেন্টে না দ্বিতীয় রাজধানীর মধ্যে কোন Prisoner of war cage-এ (বন্দীদের জন্যে ছোট ছোট সকল দিক দিয়ে ঘেরা খাঁচায়) না কেন্দ্রীয় কারাগারে ? আমার স্ত্রী আমার এক বিশেষ বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য। তার বিশ্বাস ছিল যে, খবরটা সহজে যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু আমার সে বন্ধু তাকে শুনিয়ে দিলেন যে "বাঙালী জাতীয়তাবাদ" প্রচার করে বই লিখলে তার শাস্তি পাওয়াই উচিত—আমার স্ত্রীকে অপমান করেই বের করে দিলেন। অবশ্য দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি বাংলাদেশের এক অত্যন্ত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের তিনি একজন ধ্বজাধর সেজেছিলেন।

তিন সপ্তাহ পরে অবশ্যই একখানা মার্শাল ল' পরিচালিত বাংলা খবরের কাগজ কেনার অধিকার পেলাম—তার মধ্যে সব খবরই একতরফা—তবু তারই মধ্যে খুঁজে বের করতাম মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রায়ই কোন খবরই পেতাম না—মাঝে মাঝে দেখতাম অনেক লোক ধরে এনেছে—আর খবর আসত হাওয়ায় ভেসে যে পাক-সৈন্যরা অগণিত লোককে হত্যা করছে—গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে—আর লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ভয়ে সীমান্তের অপর পাড়ে।

সন্ধ্যা হলে কামরার দরজায় পড়ে যেত ভারী তালা আর কারো মুখ দেখার উপায়

থাকত না,—তেমনিক্ষণে অতীতের আবছা ছবিগুলি মনের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করত। প্রথম তিন সপ্তাহ কোন বই পড়তে দেয়া হয়নি—কোন কাগজ বা পেন্সিল দেয়া হয়নি—সুতরাং মনের কথা—মনের ভাবনা মনের মধ্যে মিলিয়ে যেত। তিন সপ্তাহ পরে ভাগ্য কিছুটা ফিরল—একখানা চৌকির ব্যবস্থা হলো—পিঁপড়ার কামড় থেকে বাঁচলাম—চাদর এল—বাড়ি থেকে কিছু কাপড়-জামা এল—সবচেয়ে বড় আনন্দ বই পড়ার জন্য লাইব্রেরীতে যাওয়ার সুযোগ হলো—কলম এল—কাগজ এল—ভাবলাম সব ভুলে দিনের বেলা পড়ব আর রাতে লিখব।

লিখতে বসে বুঝলাম অতীতের স্মৃতি টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে আসছে। তাই এ লেখার মধ্যে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। রাজনীতিবিদদের উত্থান-পতনও এ লেখার বিষয়বস্তু নয়। এ কেবল বিগত অর্ধ-শতাব্দীর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিচিত্র ছবি আর যেসব নেতাদের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের চরিত্রের কিছুটা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতির প্রারম্ভে লিখেছেন,—

*"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুতঃ, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"*

উপরের কথাগুলি কবি ও শিল্পীর—আমি কবিও নই শিল্পীও নই। সুতরাং আমি কেবল অতীত দিনের স্মৃতি মন্থন করে জীবনের রেখাচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি যার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম বা প্রত্যক্ষ করেছি তারই বর্ণনা করে যাব। কবি গুরুর কথায়—আমার নিজের অভিরুচি অনুসারে।

জীবনপ্রভাতে যা সুন্দর বলে ভেবেছিলাম আজ জীবনসায়াহ্নে সে সৌন্দর্য কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে। যে কথা, যে আদর্শ একদিন অতীব সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলাম আজ তার সম্বন্ধে অন্তরে আমার সংশয় ও দ্বিধা জেগেছে। একদিন যা অন্যায়-অনাচার বলে ঘৃণা করেছি জীবনসন্ধ্যায় তা আর তেমন অন্যায় বলে ভাবতে পারছি না। একদিন যাকে মহান বলে জেনেছিলাম কালের চক্রে তার সেই মহত্ত্ব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। যে পৃথিবী আমার পরিচিত ছিল তা যেন পেছনে ফেলে গেছে বহুদূরে। আমার এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মতবাদ বা আদর্শের সঙ্গে আজকের দিনের মতবাদের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না। এর কারণ হতে পারে যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে আবার এও হতে পারে যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন,—

*"সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখ-সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুম সুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী,—শিকড়-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত*

*বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিন কাঁচ নাই বলিয়া, আশা সেই রঙ্গিন কাঁচ। যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত। এখন অর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করতাম। এখন জানিয়াছি. এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে। নির্জলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাঁচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।"*

আমার অজানাকে জানার বাসনা ছোটবেলা থেকেই ছিল। যখন সবেমাত্র স্কুলের ছাত্র তখনই ছাত্রদের জন্যে ছুটির মধ্যে "রেল-স্টিমার কনসেসন টিকেট" কিনে দার্জিলিং চলে গিয়েছিলাম একদল বাপ-খেধানো, মায়ে তাড়ানো ভবঘুরেদের সঙ্গে, কোথায় থাকব জানা ছিল না আমাদের কারো। একজন খবর আনলো যে আঞ্জুমনে কম পয়সায় থাকা যায়। আঞ্জুমনের কর্তাব্যক্তিরা আমাদের মত ছোট ছোট ছেলেদের কাছ থেকে পয়সা নেননি। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "সবাই বাড়ি ফিরে যাও।" আর একবার কাশীতে গিয়ে উপস্থিত। আমরা দু'জন মুসলমান ছেলে আর চারজন হিন্দু ছেলে। খুঁজে পেতে একটি হিন্দু ছেলের দূরসম্পর্কের এক বিধবা মাসীর বাড়ি থাকার ব্যবস্থা হলো। দলে যে আমরা দুজন মুসলমান রয়েছি সে কথা গোপন রাখতে হলো নইলে রাত্রিবাস করার মত আমাদের কোন স্থান ছিল না। রাত্রে আমার সঙ্গী মুসলমান ছেলেটির খুব জ্বর—আর সে জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকতে শুরু করল—ভুলে গেল সে কোথায়, কিভাবে আছে—কিছুক্ষণ পরে পরে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল "আল্লাহ্", "মা"—যাতে শব্দটা পাশের ঘরে মাসীমার কানে না যায় তার জন্য তার মুখ চেপে ধরছিলাম। ওঃ সে যে কি ভীষণ বিপদের রাত্তির কেটেছে! কেবলই মনে হচ্ছিল এই বুঝিবা ধরা পড়ে গেলাম। সকালের দিকে তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল—শরীর তখনো তার খুব দুর্বল তবু সবাই মিলে "রাম রাম" বলে বেরিয়ে পড়লাম। এমনি ছিল সে যুগে ছাত্রদের এড্‌ভেঞ্চারের নমুনা। পনেরো টাকায় রেলগাড়িতে এক মাস ভ্রমণের ব্যবস্থা। অনেক সময় আরো কঠিন এড্‌ভেঞ্চারে অনেকে বের হত। যেমন বরিশাল জেলার ফরমুজুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দপ্তর সম্পাদক ও পরিষদ সদস্য) হেঁটেই কলকাতা নিয়ে উপস্থিত। রাস্তা জানা নেই—রেললাইন ধরে চলা আর মাঝে মাঝে খেয়া পার হওয়া, কতদিন লেগেছিল তা আজ আর আমার স্মরণ নেই—কিন্তু চেহারাটা হয়েছিল যেন বনমানুষ।

আজ আমার অনেক অজানাকে জানা হয়েছে—অনেক পরই আপন হয়েছে—অনেক আপন বহুদূরে চলে গেছে তবু যেন তৃপ্ত হয়নি আমার জীবনের। মনের দুয়ার আমি কোনকালেই বন্ধ করিনি—চিরদিনই এক হিসেবে ছাত্র থেকে গেছি।

জীবনভর আমি হিসেব করে চলতে চেয়েছি—কিন্তু হিসেবে বরাবরই ভুল থেকে গেছে। নইলে জীবনটা আজ এমনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো না। মানুষের সকল পরিকল্পনা কখনো সফল হয় না—কারণ বাইরের ঘটনা-প্রবাহকে মানুষ কোনদিন আয়ত্বে আনতে পারে না। তাই তার নিজের জীবনের পরিকল্পনা তার সকল চেষ্টার পরও ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন মানুষই তার জীবনে তার সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কিছু জানতে পারে না—তাই তার পরিকল্পনার ব্যর্থতার ব্যাপারে সে হয়ে পড়ে অসহায়—আশ্রয় নেয় কোন এক শক্তির—কোন এক স্রষ্টার। সেজন্যই বোধহয় প্রায় সকল মানুষই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের উপর যতটা বিশ্বাস স্থাপন করে ততটা করে না তার নিজের কর্মশক্তির উপর।

তাই আজ অতীতের স্মৃতির যে রেখাচিত্র আমি আঁকতে বসেছি তা পড়ে পাঠক আনন্দ পাবেন এ আশা আমি করি না। আমি তবু লিখছি আমার কারাজীবনের একটানা অবসরকে ভরে তোলার জন্যে। এতদিন পর আজ বুঝতে পেরেছি যে ভারতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেসের নেতারা জেল জীবনে কেন আত্মচরিত লিখতে বসতেন। আমার মনে হয় নির্জনতার যে শাস্তি তা থেকে অব্যাহতি খোঁজার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা—অন্য কারণ বন্দী-জীবনে আর কোন কিছু লেখা চলে না কারণ অন্য কিছু লিখতে হলে চাই রেফারেন্স বই আর সুস্থ পরিবেশ ও মানসিকতা যা জেলখানায় বা জেল-লাইব্রেরীতে পাওয়া সম্ভব নয়। কবিদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আত্মকাহিনীতে রেফারেন্সের প্রয়োজনই নেই বললেই চলে। তার উপর বন্দী যদি বয়োবৃদ্ধ হয় তখন সে আর কিইবা লিখতে পারে। বিখ্যাত ফরাসী লেখকের ভাষায়,—

> "I am no longer the enthusiast dreamer, the resolute ardent and firm man, the bold challenger of destiny, the brain that built up future upon future, the young mind, encumbered with plans, projects, pride, ideas and resolves.
>
> To the youth I say you are entering life, and I am leaving it; you go to the play, to the restaurants, you are witty, you please ladies, you are pretty fellow, while I spit on my legs in the winter. You are rich with the only wealth there is, while I have all the proverty of the old age, infirmity and isolation. You have your two, and thirty teeth, a good stomach, a quick eye, strength, appetite, health, gaiety, a forest of thick hair, while I possess some thin white hair, I have lost my teeth, I am losing my legs. I am losing my memory. Such is my state. You have a whole future before you, full of sunshine, while I am beginning to see nothing as I have advanced so far into night. You are loved, that is a matter of course, while I am not beloved. The wretchedness of an old man interests nobody and that is the coldest of all distress."

আমার কারাবাস চলেছিল চার মাস। প্রায় বেশির ভাগ সময়ই নির্জন কোঠায় একাকী থাকতে হয়েছে—আর প্রায় সর্বক্ষণই মনে হয়েছে কখন পাকসৈন্য এসে ধরে নিয়ে যাবে

ক্যান্টনমেন্টে "ইন্টারোগশনের" নাম করে। হয়তবা আর জীবন্ত ফিরে আসব না। মৃত্যুর ভয় থেকে বেশি ভয় হচ্ছিল দৈহিক নির্যাতনের—মানসিক অপমানের, লাঞ্ছনার অথবা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার তাণ্ডবে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে জীবনের অবসান। আমি বন্দীদশায় জেনেছিলাম কেমন করে পিটিয়ে মারা হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ্ সেক্রেটারীর ভায়রা ভাই সিরাজউদ্দীনকে—কেমন করে তিনটি যুবককে প্রথমে বেত মেরে ও পরে অজ্ঞান অবস্থায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো দেহের বিভিন্ন অংশে লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীর ওদের পুড়িয়ে মেরেছিল। কেমন করে বরিশালে এক সংসদ সদস্যকে উলঙ্গ করে পা উপরদিকে ঝুলিয়ে মেরে বুকের হাড়গুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। আরো এমনি কত বিচিত্র ও নিষ্ঠুর ঘটনা।

কিন্তু আমার কাছে অদ্ভূত ঠেকল যখন হঠাৎ ১৭ই ডিসেম্বর জেলগেট খুলে দেয়া হলো, আর আমি হাজার হাজার কয়েদীদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বাড়ি এসে আয়নায় প্রথম মুখ দেখলাম—আমার চুলগুলি কই সাদা হয়ে যায়নি—আমার দেহের কোন অংশ তো বিকল হয়নি। এমনকি মুক্তি পাবার পর আমার মধ্যে খুব কিছু একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করিনি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে সে দিনগুলি আমার অন্তরে চিরদিনের মত স্থান করে নিয়েছে—জীবনে যেন আজ আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই মরণের কোন ভীতি, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা সব যেন উঠে গেছে অন্তর থেকে—বেঁচে আছি শুধু কর্তব্যের তাগিদে। আজো ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই বর্বর ও নিষ্ঠুর শয়তানদের অট্টহাসি।

ঢাকা

**—কামরুদ্দীন আহ্‌মদ**

## ভূমিকা : দ্বিতীয় খণ্ড

"বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ" প্রথম খণ্ড লেখা হয়েছিল যখন আমি ইয়াহিয়া সরকার কর্তৃক মার্শাল ল' রেগুলেশনে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই। দেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর। জেল গেট খুলে দেয়া হয় ১৭ই ডিসেম্বর। প্রথম খণ্ড লেখা সমাপ্ত হয় ১০ই ডিসেম্বর। তারপর এক সপ্তাহ এমন ভীষণ মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে কেটেছিল যে, পাণ্ডুলিপিটা কোথায় পড়েছিল তাও মনে ছিল না। বাড়ি এসে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, ওটা ফেলে আসিনি অন্যান্য অনেক কিছুর মত। জেল গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার হাজার কয়েদী চোর, ডাকাত, খুনী, লম্পট, ঠগিবাজ, রাজনৈতিক বন্দী, মার্শাল ল' রেগুলেশনে বন্দী সবাই সবকিছু ভুলে ছুটে চলেছে গেটের দিকে। সিপাইরা ভয়ে পলাতক, জেলাররা অফিস ছেড়ে কোন এক কামরায় গা-ঢাকা দিয়েছে। জেল গেটে কার কি জমা আছে...কে দেবে। রাজনৈতিক বন্দীরা বেরুল সবার শেষে.....কারণ আমার যুক্তি ছিল যে, এতদিন যদি আমরা থাকতে পেরেছি দু'একদিন একটা সরকারী আদেশের জন্যে আমরা কেন দেরী করতে পারব না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমার একমাত্র এটাসীকেস্‌টা ছাড়া আর সব যেমন জুতা, স্যান্ডাল, কাপড়-জামা সবই দিলাম একজনের কাঁধে। বললাম বাইরে পৌঁছিয়ে দিলে তাকে বক্‌সিস দেব কারণ শীতের দিনের লেপ, চাদর, বালিশ আমার পক্ষে বাইরে বইয়ে আনা আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সম্ভব ছিল না— জেলখানার শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় তাদের কোন সাহায্য পাওয়ারও উপায় ছিল না।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড লেখা হয়েছিল এক বিশেষ পরিবেশে আর দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, এখন আমি মুক্ত এবং স্বাধীন দেশের নাগরিক। এই খণ্ডে যা লিখব তা অনেকটা আমার দেখা বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস, দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টানদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি এবং বেশির ভাগ মুসলমান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ বলতে আমি মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্তের কথাই বলতে চেয়েছি।

তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃষকরা জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কিন্তু সে সব বিদ্রোহ নেতৃত্বের অভাবে ও আদর্শের অভাবে কখনো সর্ব-বাংলার রূপ নেয়নি। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কিছু সংখ্যক নেতা এসব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে নাম করা যায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, গফরগাঁওর মাওলানা শামসুল হুদা, বগুড়ার রজিবুদ্দীন তরফদার, দিনাজপুরের হাজী দানেশ, ময়মনসিংহের আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী, কুমিল্লার রমিজউদ্দীন যাঁরা গোড়াতে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজা-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী আসামে হিজরত করার পর এবং ফজলুল হক সাহেবের প্রজা-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ঐ ধরনের আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়। কারণ ফজলুল হক সাহেব সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত

শ্রেণীভূক্ত ও নিজেই সাটুরিয়া স্টেটের মোতায়োল্লী সূত্রে একজন ছোটখাট জমিদার—শহরে লেখাপড়া শিখেছেন বাল্যকাল থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করেন, যা তখনকার দিনে বাংলাদেশীয় লোকদের জন্য সরকারী উচ্চপদ। তিনি সেই চাকুরী ইস্তফা দিয়েছিলেন কারণ, হিন্দু উপরওয়ালাদের নিকট থেকে তিনি সুবিচারের আশা করতে পারেননি। স্বভাবতঃই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজের সমকক্ষ করা। হিন্দুদের বুঝিয়ে দেয়া যে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে হেয় করে দেখা চলে না। জনাব ফজলুল হকের নিকট তাই কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। একমাত্র শর্ত তাঁকে নেতৃত্বে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর ভাগ্যও ছিল ভাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। তারা পাটের দাম পেয়ে ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়। ফজলুল হক দেশের অন্তরের খবর রাখতেন। সুতরাং জমিদার, জোতদার, মহাজনদের বিরোধিতা ছাড়াও তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে থাকেন।

আমার রাজনৈতিক জীবনে তেমন কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়নি আমাদের দেশে। একমাত্র ১৯৪৫—৪৬ সনের তে-ভাগা আন্দোলন ছাড়া। তে-ভাগা আন্দোলন যতটা সাঁওতাল এবং তপশীলি হিন্দু কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়েছিল ততটা ছড়ায়নি মুসলমান কৃষকদের মধ্যে তবে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদের নেতৃত্বে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এ আন্দোলন সংক্রমিত হয়েছিল। অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, এ আন্দোলনে মুসলমান কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছিল—ফজলুল হক সাহেব ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার পর।

আমার মতে শেরেবাংলার কৃষক-প্রজা আন্দোলন এবং মুসলিম লীগ আন্দোলন সমপর্যায়ের আন্দোলন, দু'টো আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের উচ্চকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করা ও হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করা এবং নিজেদের ভদ্রলোক হিসেবে বিকশিত করা। যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল ১৯৫৩ সনে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে। পাকিস্তান হবার পরই কেবল নতুন বুর্জোয়াঁ মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয় যারা শিল্প বা পেশার উপরে নির্ভরশীল।

কোন কৃষক বিদ্রোহই আমার এ পুস্তকের মধ্যে তেমন স্থান পায়নি যেমন পায়নি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব লিখিত পুস্তক (A Socio-Political History of Bengal And the Birth of Bangladesh দ্রষ্টব্য।)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও বৃটিশরাজের সমঝোতার ফলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ "হাউস অব কমন্স"-এ আইন পাস করে বৃটিশ ভারতে "ভারত এবং পাকিস্তান" দু'টো রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু দুটো দেশেই বিভিন্ন ধর্মবলম্বীয় লোকেরা বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে থাকে সেদিক দিয়ে দেশ বিভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। ভারতে যদি দাঙ্গা বেশি হয়ে থাকে তার কারণ ভারতভূমি থেকে তার অংশবিশেষের বিচ্ছিন্নতা অন্তর দিয়ে কোন ভারতবাসীই মেনে নিতে পারেনি। এটা অস্বাভাবিক নয় তাদের পক্ষে। ধর্ম যতদিন জীবনকে ধারণ করবে ততদিন এশিয়ায় এ সমস্যার সমধান হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

অথচ ধর্মের বাঁধন না থাকলে অজ্ঞ, নিরক্ষর লোকদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা কেবল আইন করে আনা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। হয়ত শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় সেটা

হতে পারে তবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কোন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে এলেও সে দেশে বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শ্রেণী পার্থক্য দেখা দেয়।)এটা আমার অভিজ্ঞতা যে সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন ব্যবস্থা যারা আজ পর্যন্ত বিপ্লবের মাধ্যমে করেছে তারাও পার্টির সদস্যদের শ্রেণীর উর্ধ্বে রেখেছে। শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা একটা জাতির পক্ষে সাময়িক চিত্র মাত্র হতে পারে, কিন্তু সর্বকালের জন্য কোন দেশ শ্রেণীহীন হয়ে থাকতে পারে না। কথাটা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বলে সবার মনে হবে কিন্তু সমাজবাদী দেশগুলো সম্বন্ধে আমরা এ ধারণা জন্মেছে। আমরা সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে পারি কিন্তু মানুষের বুদ্ধিশক্তির ধারক মস্তিষ্কের শক্তি, যাহার উপর উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল তা জাতীয়করণ করতে পারি না। কল-কারখানায়, মাঠে-ময়দানে, অফিসে বা প্রশাসনে আমার যে নেতৃত্ব বা "ক্যাডার" সৃষ্টি করার প্রয়াস পাই—তার কারণই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে মস্তিষ্ক শক্তির প্রয়োজন তা মেনে নেয়া।

১৯৬৭ সনে প্রকাশিত আমার বাংলার ইতিহাসে নয়া চীনের তদানীন্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন-ই-র একটি বিবৃতির উল্লেখ করেছিলাম। ১৯৭১ সনে সে বিবৃতিটির সারমর্ম আরো সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। চেন-ই বলেছিলেন,—

> "The blood baths, communal and racial conflicts we see in the new emergent nations of Asia and Africa are due to the conspiracy of the colonial powers who before giving independence saw to it that there remain the causes of conflict, so that they are asked to intervene."

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। তাই মানুষকে কোন এক মহাশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় বিপদে আশ্রয় খোঁজার জন্যে। সুতরাং এখানে ধর্মের প্রতি টান মানুষের থাকবেই এখানে ধর্ম খারাপ বলে কোন লাভ নেই শুধু দেখতে হবে ধর্মের নামে যেন সাম্প্রদায়িকতা না প্রশ্রয় পায়। যে দেশে জনগণ সমস্যা সচেতন নয় সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ। অনেক সময়ই তাই গণতন্ত্র জনগণতন্ত্র না হয়ে শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শতকরা আশিজন যেখানে নিরক্ষর সেখানে সমস্যা সচেতনতা সম্ভব বলে মনে হয় না।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র চালু হওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করেন কিন্তু সমাজতন্ত্রের কতগুলো পূর্বশর্ত আছে—যা বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র করা যায় না। কেবল মাত্র ওটাকে রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে স্ব-স্বার্থে ব্যবহার করা চলে।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমার মতামত আমার Socio-Political History of Bengal-এ লিখেছি সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মানবতাবাদে দীক্ষা না নিয়ে কোন মতবাদকে আদর্শ করে এগিয়ে যেতে চাইলে পথ হারাতে হবে...তাই হয়েছে অনেক সমাজবাদী দেশে, অনেক গণতান্ত্রিক দেশে, আর অনেক জাতীয়তাবাদী দেশে অতীতে এবং বর্তমানে। মনে রাখতে হবে কার্ল মার্কসের একটি কথা,—"Man is the root of mankind".

জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়। মানুষের ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং স্নেহও যেমন পেয়েছি, চরম ঘৃণা, তাচ্ছিল্যও পেয়েছি, অপমানিতও হয়েছি। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আমাকে একদিন বলেছিলেন, "তুমি তো রাশি মান না, আমি অনেকটা মানি। "কন্যারাশি"তে যার জন্ম তার জীবনে তার প্রাপ্য সফলতা

আসতে পারে না।" হেসে বলতেন, "অর্ধশতাব্দী রাজনীতি করে আমি পনেরো মাস বাংলার প্রধানমন্ত্রী আর চৌদ্দ মাস পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছি—অথচ স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন চিরজীবনই সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন এটা ঈর্ষা করে বলছি না—এটা রাশির ফল—" এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শহীদ সাহেব প্রতিবছরই ভৃগু পণ্ডিতের কাছ থেকে বছরের ফলাফল দুশ' টাকা দিয়ে গণাতেন পরের বছর আবার ভৃগু পণ্ডিতকে টাকা পাঠাবার সময় লিখে দিতেন যে, "গত বছরের গণনার কোন ফল পাইনি—কিন্তু ভাল কথা শুনতে এবং ভাবতে ভাল লাগে তাই আবার নিষ্ফল ভাগ্য গণনার জন্যে নতুন করে দু'শ টাকা পাঠাচ্ছি।" ফটোগ্রাফীর মত, বলনাচার মত—ভাগ্য-গণনাও ছিল তাঁর একটা 'হবি'।

জীবনের প্রথম থেকেই আমার মন আন্তর্জাতিকতাবাদ-বিলাসী—তাই জাতিসঙ্ঘে প্রতিনিধিত্ব আমাকে যত আনন্দ দিয়েছে—তা আর কোথাও পাইনি।

বাঙালীর জীবনে ষাট বছরের ঊর্ধ্বে বেঁচে থাকাই যেন একটা অভিশাপ। বাংলার আবহাওয়া—ভাল স্বাস্থ্য বহুদিন রক্ষার পক্ষে অনুপযোগী—তাই ষাটের ঊর্ধ্বে বাঙালীকে আমি চিরকালই দেশের উপর একটা বোঝা বলে মনে করেছি—আজো করি। ষাটের পরে আর বাঙালীর উৎপাদন শক্তি বা সৃষ্টিশীলতা থাকে না বলে আমার বিশ্বাস সে শুধু গিলিত চর্বন করে অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়।

তাই আমি ষাটের পরেই লিখছি অতীতের কথা।

—কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

৫৪৩/এইচ
রোড # ১৩
ধানমন্ডী আ/এ
ঢাকা-১২০৫

## প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সূচী, ভূমিকা ও কৈফিয়ৎ

### বিষয় সূচী

কৃতজ্ঞতা/০৭, কৈফিয়ৎ/০৮, সূচনা/১৪, ভূমিকা : দ্বিতীয় খণ্ড/২০ শৈশব/২৯, ছাত্রজীবন/৪৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও তদানিন্তন সমাজ/৭০, রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব/৯৬

### দ্বিতীয় খণ্ড

**প্রথম অধ্যায় :** পাকিস্তান আন্দোলন/১২৫, লাহোর প্রস্তাব ও তা নিষ্ফল করার ষড়যন্ত্র/লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত করা/দ্বি-জাতিতত্ত্বের সংজ্ঞা/পাকিস্তানের উপর গবেষণা ও তাকে রূপদানের প্রচেষ্টা/পীরপুর রিপোর্ট ও ডিফেন্স কমিটি গঠন, ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা/তদন্ত কমিশন, আদমশুমারী/জাতীয় দেশরক্ষা কাউন্সিল, এ. কে, ফজলুল হক সাহেবের মুসলিম লীগ ত্যাগ, শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা—মুসলিম লীগের গণসংযোগ অভিযান/মুসলিম ছাত্রসমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, অভিজাত মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক কৌশল, ১৯৪১ সনে জাপানের যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা/ ঢাকার নবাবের শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে প্রথম ঢাকা আগমন/সিরাজগঞ্জে জিন্নাহ্/পাক্ষিক পাকিস্তান, নাটোর ও বালুঘাটের উপ-নির্বাচন/ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে উপ-নির্বাচন/জাপানীদের বর্মা দখল, নেতাজীর আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন/ক্রীপসের দূতিয়ালী, "ভারত ছাড়" আন্দোলন/মেদিনীপুরের স্বাধীনতা, মাতঙ্গিনী হাজরা, শ্যামাপ্রসাদের মেদিনীপুর ভ্রমণ নিষিদ্ধকরণ/সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নজীরের শাহাদৎ, ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও দুর্ভিক্ষ/ফজলুর রহমান সাহেবের রাজনীতি/মুসলিম লীগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ—শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমস্যা/আবুল হাসিম সাহেব মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত/হাসিম সাহেবের ঢাকা আগমন/হাসিম সাহেবের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা এবং মুসলিম লীগকে প্রগতির পথে আনার পদ্ধতি/ মোগলটুলী পার্টি হাউস/জিন্নাহ্ গান্ধী আলোচনা/ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচন/খাজা শাহাবুদ্দীনের রাজনৈতিক দাবা খেলা/কলকাতা যুব-নেতাদের সঙ্গে পরিচয়/প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন/প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড/কমরেড মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ/সাপ্তাহিক মিল্লাত ও নির্বাচনী অফিস/কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন, ঢাকা-ময়মনসিংহ কেন্দ্রে মৌলভী তমিজউদ্দীন খান ও স্যার আবদুল হালিমের মধ্যে প্রতিযোগিতা/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচন, স্যার আবদুল হালিম গজনভীর বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ/জিন্নাহ্‌র দুর্ভাবনা, মুসলিম লীগ বিজয়ী, শুকরিয়া দিবস/ঢাকা মুসলিম

লীগ অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন/কুমিল্লার অবস্থা/জিন্নাহ্‌র বাংলাদেশ ভ্রমন/বাংলার নেতাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা/গফরগাঁও কনফারেন্স/ফরিদপুরে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সৃষ্টির পন্থা/ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে নির্বাচন অভিযান/মুসলিম লীগের শতকরা ৯৬টি আসন লাভ/মনস্তাত্বিক কোণ থেকে জিন্নাহ্‌ সাহেব/ আবুল হাসিম সাহেবের দেশের বাড়িতে কর্মী-কনফারেন্স/ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আজীবন সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের মুক্তিপ্রাপ্তি/মুসলিম লীগের কনফেডারেশন প্রস্তাব গ্রহণ এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া/মুসলিম লীগের মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান ও নেহেরুর অন্তবর্তী সরকার গঠন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস/ঢাকায় সংগ্রাম দিবস, ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা/লর্ড ওয়াভেলের বাংলাদেশের অবস্থা পরিদর্শন/দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশ/বৃটিশ সরকারের স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি ও আলোচনা/মুসলিম লীগ সভাপতি পদের জন্যে নেতাদের কোন্দল/শিখদের পাঞ্জাব বিভক্ত করার প্রস্তাব, মাওলানা ভাসানীর "আসাম দিবস", বঙ্গীয় কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব/মুসলিম লীগের বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : পাকিস্তান ও বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ/১৯৭** পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অভ্যর্থনার জন্যে খাজা হাবিবুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে অভ্যর্থনা কমিটি, ঢাকার নবাব বংশ/জিন্নাহ্‌র মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ/অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতি গণ-আজাদী লীগের দৃষ্টিভঙ্গী, শামসুল হকের হক্‌ কূল এবাদ-এর প্রতি নিষ্ঠা/শেরেবাংলার দৃষ্টিতে জিন্নাহ্‌, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন-মজলিস/"ওয়ার্কারস্‌ ক্যাম্প",/খাদ্য পরিস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলন/শামসুল হক ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা/গান্ধীজিকে হত্যা/খাজা নাজিমুদ্দীন এবং হামিদুল হকের নির্বাচন কেন্দ্র অনুসন্ধান, শহীদ সাহেবের শান্তি মিশন/ভাষা আন্দোলন/রাষ্ট্রভাষা চুক্তি/জিন্নাহ্‌র ঢাকা আগমন/মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, শহীদ সাহেবের শান্তি মিশনের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ব বাংলা থেকে তাঁকে বহিষ্কার/জিন্নাহ্‌ সাহেবের অসুস্থতা ও মৃত্যু/শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেবের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবাস্তব নীতি/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি/ছাত্র ফেডারেশনের শেষ অধিবেশন, টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচন/শহীদ সাহেবের কলকাতা ত্যাগ ও ইত্তেহাদ কাগজ বন্ধ, মাওলানা ভাসানীর আসাম ত্যাগ/পাকিস্তানে শহীদ সাহেবের রাজনীতি/আওয়ামী মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন/গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে পূর্ব বঙ্গে আন্দোলন এবং "কমিটি অব্‌ এ্যাকসন ফর ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন" গঠন/"গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনসন",/রাজশাহী জেলে গুলী ও রাজনৈতিক কর্মীদের লাঞ্ছনা/লিয়াকত আলীর পূর্ববঙ্গে আগমন এবং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা/আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি/১৯৫০ সনে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা/লিয়াকত নেহেরু প্যাক্ট/শ্রমিক আন্দোলন/অচ্ছুত হিন্দুদের পূর্ব বাংলা ত্যাগ এবং পাকিস্তান শ্রমিক সংগঠন/পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি হিসেবে আমার প্রথম বক্তৃতা/আইয়ুব খানের এড্‌জুটেন্ট পদ লাভ/হামিদুল হকের PRODA মামলা, এবং আইয়ুব খান কম্যান্ডার-ইন-চীপ নিযুক্ত/শেখ আবদুল্লাহ্‌র প্রতি লিয়াকত আলী খানের চ্যালেঞ্জ, আবুল হাসিম সাহেবের ভারত ত্যাগ/পিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা/প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে হত্যা/ইউথ্‌ লীগ/আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনসন/১৯৬৭ সন পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা/১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি/আবুল হাসিম সাহেবের ঢাকা আগমন, আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের কোন্দল/২০শে

এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি/কনভেনর ও শামসুল হকের পলায়ন, যুবলীগের নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার, প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধ, বাংলা জাতীয়তাবাদ, খাজা নাজিমুদ্দীনের বিপদ/মার্শাল ল' জারি, ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা, সিনথিয়া, রাজনীতিবিদ এবং ইন্‌টেলেকচুয়ালদের দৃষ্টিভঙ্গী/আমার হাভানা যাত্রা, নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী/আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অধিবেশন/আমেরিকার বাইরের চেহারা/বগুড়া মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ/লণ্ডনে কয়েকদিন, আনুরিন বিভানের সঙ্গে সাক্ষাৎ/নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতি/মানিক মিঞা/১৯৫৩ সনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি/পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি/"ভদ্রলোকের" সংজ্ঞা ও ইতিহাস/পূর্ববঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মধ্যবিত্তের সমাধি/নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্টের জন্যে চাপ সৃষ্টি/যুক্তফ্রন্টের সেক্রেটারিয়েটের কাঠামো তৈরী, সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিক কাগজে পরিবর্তিত।

❐

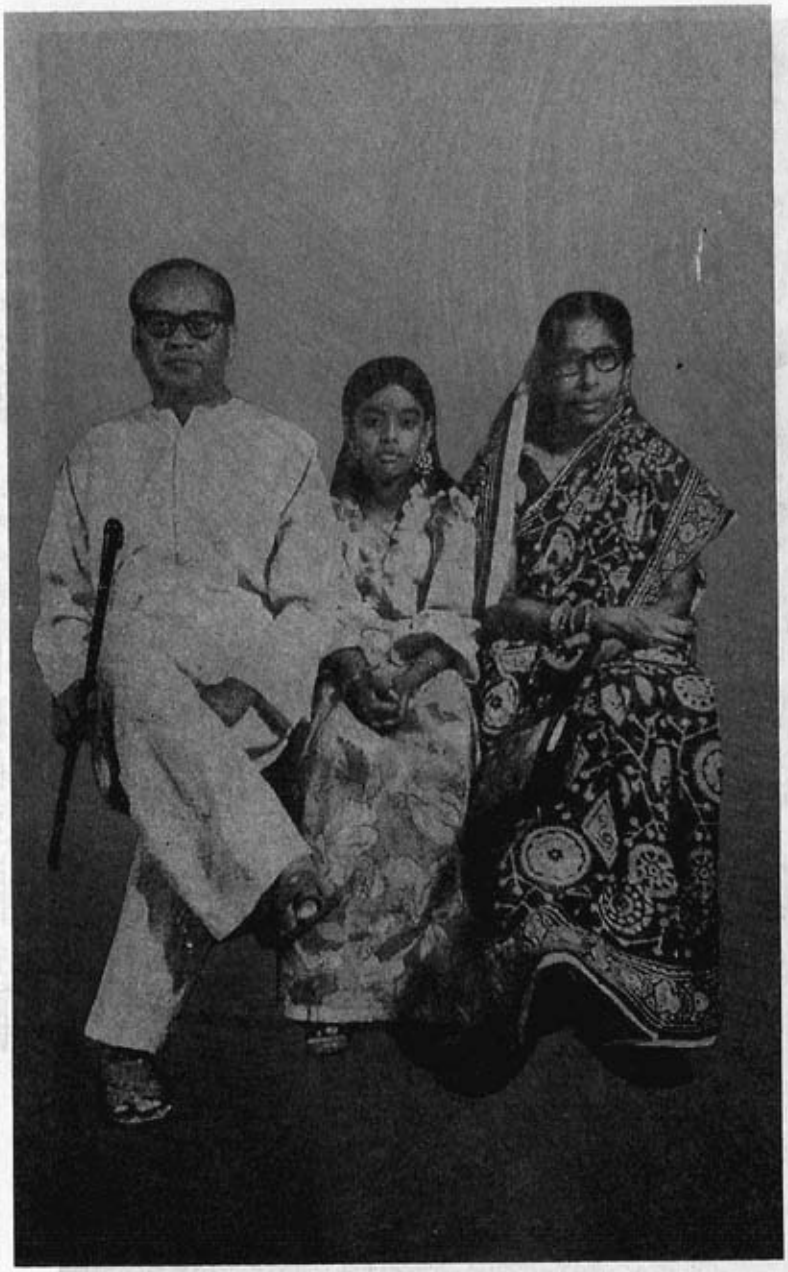

বাঁ দিক থেকে গ্রন্থকার : কামরুদ্দীন আহমদ কন্যা সালমা আহমদ রীতা/১৯৬৫
স্ত্রী যোবেদা আহমদ/১৯২৬

ডান দিন থেকে : পুত্র জহির উদ্দীন আহমদ/১৯৪১, স্ত্রী যোবেদা আহমদ/১৯২৬, পুত্র আজাদ আহমদ/১৯৪৮, মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে শহীদ, কামরুদ্দীন আহমদ গ্রন্থকার, পুত্র খালিদ আহমদ/১৯৪৪

# শৈশব

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আমার জন্ম হয়। সে দিনটি ছিল সোমবার, ইংরেজি ১৯১৩ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর আর বাংলা ১৩২০ সালের ২৩শে ভাদ্রের ভরা ভাদর। মা'র কাছে শুনেছি সারা রাত অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল—ভরা নদী, খাল-বিল যেন দু'বাহু বাড়িয়ে আমাকে কোলে তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি আর পানি—কিন্তু যখন আমি ভূমিষ্ট হই তখন পূব-আকাশে ঊষার আলোর ছটা দেখা দিয়েছিল। আমার জন্মলগ্নে বিশ্বজোড়া একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

কিছুদিন পূর্বেই সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তার রেশ তখনো সবার মন থেকে মুছে যায়নি। ইউরোপে তখন বিভিন্ন শক্তিসমূহ একে অন্যের বিরুদ্ধে জোট পাকাতে ব্যস্ত। হিটলার বলছে এশিয়ামাইনর পর্যন্ত জার্মানীর পথ চাই—তাদের সবার মুখে একই কথা বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত তাদের দখল মেনে নিতে হবে। জার্মানীকে আর কোণঠাসা করে রাখা চলবে না। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ইংলিশ চ্যানেলের অপর পাড় থেকে শান্তির ললিত বাণী প্রচার করে চলছে—ঠিক আবার একই সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের লণ্ডনডারী শহরে হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ঘনঘটা চলছিল। প্রায় সকল রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যখন একে অন্যের সর্বনাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর তখনই আবার দেখা গেল লুভার থেকে অন্তর্হিত "মোনালিসার" ছবিটি বহু চেষ্টার ফলে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অদ্ভুত আমরা মানুষ জাতি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বক্ষণে যেমন ইউরোপে হিংসা ও প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্র চলছিল তেমনি জাগ্রত ছিল মানুষের অন্তরে সৌন্দর্যের প্রতীককে রক্ষা করার দুর্নিবার প্রচেষ্টা। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে, অজানাকে জানতে আর প্রকৃতিকে বশে আনতে জীবনপণ করে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আকাশে উড়ার জন্য যন্ত্র অবিশ্যি তৈরী হয়েছিল ১৯০৩ সনেই—কিন্তু দ্বিতীয় দশকেই বিমান ভ্রমণ শুরু হয়। মার্কনীর বেতারের সাহায্যে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থাও এ দশকেরই আবিষ্কার। এক কথায় আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

এশিয়া মহাদেশেও বিজ্ঞানের ধাক্কা এসে লাগে। মিল, বেন্থামের চিন্তাধারা শিক্ষিত সমাজকে প্রেরণা যোগাতে থাকে। ১৯১২ সনে ডাক্তার সানইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন যে পরিকল্পনা করেছিলেন—বাংলার মধ্যবিত্তের আন্দোলনের চাপে তা আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়। ১৯০৫ সনের বাংলা ঠিক ১৯১১ সনের বাংলা নয়। বিহার

ও উড়িষ্যা কেটে নিয়ে এক ভিন্ন প্রদেশ গঠন করা হল। আর শ্রীহট্ট জেলা বাদ দিয়ে বাকি বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল নিয়ে মুসলমান সংখ্যাগুরু বাংলাদেশ নতুন করে জন্ম নিল। বৃটিশের নতুন চালে বৃটিশরাজ, হিন্দু ও মুসলমান সবারই মুখ রক্ষা হল। বাংলা বিভক্ত হলো, মুসলমান খুশী হলো কারণ তাঁদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠিত হল। আর হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভক্তির রেখাটা একটু পশ্চিম দিকে সরিয়ে দিয়েই নিজেদের বিজয়ী বলে ঘোষণা করল। অন্যদিকে মুসলমানেরা ভাবল তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, হিন্দুরা ভাবল, রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী নেওয়ার ফলে বাঙালীর প্রতি অবিচার করা হলো—বৃটিশ ভাবল আসামের চায়ের বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের জন্য কোন আনন্দের ব্যবস্থা করা গেল না। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হলো কিনা, মুসলমানেরা আরোও বেশি উপকৃত হলো কিনা এটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা তখন কেউ করল না—তবে বৃটিশরাজের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে পুরনো বাংলাকে ছোট করার পরিকল্পনা সফল হল। কবিগুরুর ভাষায়,—

*"পথ কহে আমি দেব*
*রথ কহে আমি*
*মূর্তি ভাবে আমি দেব*
*হাসেন অন্তর্যামী।"*

কারণ বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হবার ২৫ বছর পর দেখা গেল যে, বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার আশা বিলীন হয়ে গেছে—১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো—জনাব এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে। সুতরাং ১৯৪৬ সালে ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু মধ্যবিত্তরা তাদেরই আন্দোলনে সৃষ্ট বাংলাদেশকে কেটে দু'খণ্ড মূল বাংলাদেশ থেকে পৃথক হয়ে গেল—আর মুসলমান মধ্যবিত্ত যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাংলাকে একত্র রাখতে।

যাক্ যা বলছিলাম হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব ১৯১১ সনে জয়ের নেশায় বিভোর; আর সে বছরেই সে বিজয়ের আনন্দকে আরো আনন্দময় করে দিল, মোহনবাগান দল কলকাতার ফুটবল ময়দানে অর্ধ শতাব্দী ধরে অপরাজেয় শ্বেতাঙ্গ ফুটবল টিম—ক্যালকাটা টিমকে হারিয়ে দিয়ে। সুরেন ব্যানার্জীর পাশেই স্থান পেল গোষ্ট পালের ছবি। কলকাতার ফুটবল ময়দানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল একইভাবে পরবর্তীকালে পাকিস্তান হবার প্রাক্কালে মোহমেডান স্পোর্টিং-এর বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল শক্তিশালী সাহিত্যিক ও কবি—তেমনিভাবে হয়েছিল পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাক্কালে। কবি ফররুখ আহমদের কবিতা, কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী—এদিক দিয়ে উল্লেখ্য।

বৃটিশ সরকার ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ১৯১২ সনে কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করায় যে দুঃখ হয়েছিল তা অনেকটা কেটে গেল যখন বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল নিয়ে প্রদেশ গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে—আর পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯১৩ সনে যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

পেয়ে। বাংলা ভাষা ঠাঁই পেল বিশ্বের অভিজাত দরবারে। এশিয়াবাসীর জন্য এ পুরস্কার হলো পরম গৌরবের বস্তু।[১]

আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় ষোলঘর গ্রামে। কথিত আছে, রাজা কেদার রায় মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এ গাঁয়েই পরাজয় বরণ করেছিলেন। এ অঞ্চলে যারা রাজা মানসিংহকে সাহায্য করেছিল তারা সকলেই পরবর্তীকালে মোগল দরকার থেকে পুরস্কার পেয়েছিল। আমার পূর্ব-পুরুষ মরহুম বড় খান সাহেব "তালুক বড় খাঁ" নামে একটি লাখেরাজ তালুক পেয়েছিলেন—কিন্তু সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নয়, আমরা যে লাখেরাজ তালুক ভোগ করেছিলাম—তা ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মোহরাঙ্কিত দানপত্রের ভিত্তিতে।

ষোলঘর ছিল সেকালে অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের সকল দোকানেই কেনা-বেচা চলত। অন্যান্য গ্রামের মত ষোলঘরে কোন সাপ্তাহিক হাট মিলত না। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি ছিল ১৯৩০ সনের পূর্ব পর্যন্ত। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ-হিন্দুরা ছিল বেশি শিক্ষিত—কিন্তু মুসলমানেরা ছিল উপরস্থ ও স্বাধীন তালুকদার। ফলে হিন্দুরা যতই শিক্ষিত ও বিত্তশালী হোক, তাদের খাজনা দিতে হতো মুসলমান তালুকদারকে বা জমিদারকে—যদিও এঁরা খুব বড় তালুকদার বা জমিদার ছিলেন না। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ি আমাদের গ্রামে। তাঁদের বাড়িতে ধূমধাম করে আশ্বিনের পূজা হতো—তখন আমরা যেতাম তাঁদের বাড়িতে যদিও তাঁরা ছিলেন আমাদের সিকিমি প্রজা। আমাদের বসার ব্যবস্থা হতো সম্মুখ সারিতে।

আমরা যখন ছোট তখন আমাদের গ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন শরৎ ঘোষ। তাঁকে লোকে বলত সাহেব শরৎ। কারণ তিনি সেদিনেও খাবার সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার করতেন আর কাঠের পায়ার উপর এনামেলের পাত্রে পানি ঢেলে তাই দিয়ে। হাত-মুখ ধোয়ার কাজ সারতেন যেন সেটা একটা আধুনিক "বেসিন"। তিনি অবশ্যই কোনদিন বিলেত যাননি—কিন্তু বিলেত ছিল তাঁর কাছে সভ্যতার পীঠস্থান। তাই বোধহয় পরবর্তীকালে তাঁর ছোট ছেলে ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়ায় নিশ্চয় খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। যদিও ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ ফিরে এসেছিলেন পোশাকে, আচারে ব্যবহারে, কথায় ও কাজে একেবারেই সাহেব—কিন্তু তিনি অন্তরে ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ছাত্র হিসেবে অবশ্যই তাঁর বড় ভাই রাখাল দাস ঘোষ ছিলেন অনেক মেধাবী—জীবনে কখনো কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেননি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চলা-ফেরা কথাবার্তা, পেশোক-আশাক ছিল একজন পুরাদস্তুর দার্শনিকের মত। অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে ছিলেন মোটামুটি অজ্ঞ—ইংরেজী সাহিত্যের বাইরে যে একটা বিরাট পৃথিবী রয়েছে সে যেন তাঁর মনেই আসত না। মার কাছে শুনেছি যে, রাখালবাবুর এম. এ. পরীক্ষার ফলের তারবার্তা নিয়ে ডাক-পিয়ন যখন এল তাঁদের বাড়িতে তখন রাখালবাবু বেরিয়ে এসে তারবার্তাটি চাইলেন

পিয়নের কাছে। পিয়ন বললে বখ্‌শিশ ছাড়া সে টেলিগ্রাম দেবে না। রাখালবাবু কি করেন ? বাড়ির মধ্যে গিয়ে মাকে সেকথা বলায় মা বললেন, "রাখাল! খবর নিশ্চয়ই ভাল, তুই একটা আধুলি ও একটা টাকা নিয়ে যা—আধুলি যদি না নিতে চায় তবে টাকাটা দিস্।" রাখালবাবু এসে ডাক-পিয়নকে বললেন, মা একটা আধুলি ও একটা টাকা দিয়েছেন, তুমি যেটা চাইবে সেটাই পাবে—পিয়ন বললে, "বাবু আমি দুটোই চাই।" রাখালবাবু বিপদে পড়লেন—ঘরে গেলেন আবার মাকে জিজ্ঞেস করতে—মা বললেন, "দুটোই দিয়ে দাও—বোকার মত যখন দুটোই দেখিয়ে দিয়েছ।" তারপর বললেন, "এ টেলিগ্রামটা নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে এস।" আমাদের বাড়ি এসে মাকে যখন এ খবর দিল—মা বললেন, "রাখাল আমাদের মিষ্টি কোথায় ?" "তাইত মাসীমা" বলেই ছুটে গেল বাজারে মিষ্টির দোকানে—সের দশেক জিলেপি নিয়ে এল একটা টুকরী করে—গুরুজনরা সবাই বললেন হয়েছে—আমাদের আর মিষ্টি খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী জীবনে কলেজের শিক্ষকতা করলেন কিন্তু উপর দিকে আর যাওয়া হয়নি, ক্লাসের বকাটে ছোকরাদের দমন করতে পারতেন না ফলে প্রায়ই প্রিন্সিপ্যাল নিজে এসে ক্লাসের শৃঙ্খলাটা বজায় রাখতেন। তাঁর কাপড়-জামার দিকে একেবারেই খেয়াল ছিল না। কে বলবে যে, তিনি সাহেব শরৎ ঘোষের ছেলে বা সাহেব কে. ডি. ঘোষের ভাই।

আর একটা বিশেষত্ব ছিল আমাদের গ্রামের সেটা হচ্ছে বর্তমান শতাধীর প্রথম থেকেই বিক্রমপুরের মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় বর্ণ-হিন্দুদের সঙ্গে তাল রাখার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। তাঁদের উপর যে কারণেই হোক, মোল্লা-মৌলভিদের ইংরেজী বয়কট করার আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। গ্রামে ছিল দুটি হাই স্কুল—পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রমপুরে পঁয়তাল্লিশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। আমাদের গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে ছিল শ্রীনগর থানা—সেখানকার জমিদার ছিল হিন্দু। সুতরাং পূজা-পার্বনে শ্রীনগরেই হৈ চৈ হতো বিস্তর। বিশেষ করে চৈত্র-সংক্রান্তি ও বৈশাখী মেলায় আষাঢ় মাসে রথযাত্রায় আর আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবে আনন্দ-স্ফূর্তি চলত কার্তিক পূজা পর্যন্ত। রথযাত্রায় পাওয়া যেত চিনির তৈরী রথ, পুতুল ইত্যাদি। চিনির ও গুড়ের তৈরী নানা রকমের বাতাসা আর বিন্নি ধানের খৈ আর নানান জাতের কলা। বৈশাখী মেলায় বিক্রয় হতো মাটি ও কাঠের তৈরী নানা ধরনের পুতুল ও অন্যান্য খেলার সামগ্রী। সেসব খেলনা অবশ্যই জাপানী প্লাস্টিকে তৈরী খেলনার মত সুন্দর ছিল না—কিন্তু সেগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ দান করত তা আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা বিদেশী খেলনার মধ্যে পায় না। এখনকার দামী পুতুলগুলি যেন বিশেষ শ্রেণীর সন্তানদের জন্য—তাই সবার মুখে সমান হাসি এখন আর দেখা যায় না।

আমার পিতামহ মরহুম মঈনুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর আর দাদী-আম্মার বয়স ছিল একত্রিশ। আমার পিতার বয়স তখন আঠারো বছর। আমার দাদী আম্মা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ছয় পুত্রসহ বিধবা হন। আমার দাদী-আম্মার এক ভাই ছিলেন, নাম ছিল তাঁর ওসমান আলী ভূঁইয়া। তিনি

ছিলেন ঢাকা জেলার প্রথম মুসলমান আদালতি উকিল। তিনি পি. এল. পাশ করে "প্লিডার" বা উকিল হয়েছিলেন। তাঁর আরজি, জবাব, মুসাবিদার পারদর্শিতার কথা আমি বহুকাল পরে ওকালতি করার সময় বৃদ্ধ উকিলদের কাছে শুনেছি। তাঁর টাকার অভাব ছিল না—বিবাহ করেছিলেন একাধিক, তবু টাকার সঙ্গে যেসব উপসর্গ জুটত তা থেকে তিনি পরিত্রাণ পাননি। মদিরা পান ও বাঈজীর নাচ-গান দু'টোর প্রতিই ছিল তাঁর সমান আকর্ষণ। দাদী-আম্মার কাছে শুনেছি যে, তিনি যখনই আমাদের বাড়ি আসতেন তখন বড় বজরা নৌকা ভাড়া করে আসতেন আর রাত কাটাতেন সে বজরায় কারণ সেখানে তাঁর সখের ও আনন্দোৎসবের সবরকম ব্যবস্থাই থাকত। আমার এক দাদুর এক ভাই মরহুম নিজামুদ্দীন সাহেব ছিলেন ফরিদপুরের দুদু মিঞায় সাগ্‌রেদ। তিনি ছিলেন নিষ্ঠবান মুসলমান এবং ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতেন। তিনি সে যুগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেও সরকারী চাকুরীর কথা না ভেবে ফরায়েজী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গেছেন। ওসমান ভূইঞা তাঁকে মনে মনে ভয় করে চলতেন। সুতরাং তাঁর আনন্দোৎসব দূরে ঐ বজরায় চলত। আমার পিতার বেশি পড়াশুনা না হবার কারণের মধ্যে দাদী-আম্মার ভাই উকিল সাহেবের সংসর্গ অন্যতম।

আমার দাদী-আম্মা ছিলেন খুব পরহেজগার। তিনি নিয়মিতভাবে নামাজ পড়তেন ও রোজা রাখতেন, সকালবেলা কোরান তেলাওয়াৎ করতেন—হাতে সব সময় তসবী থাকত।

আমাদের বাড়িতে আমার মা যেদিন বাড়ির 'বড় বউ' হয়ে এলেন সেদিন থেকেই আমার দাদী-আম্মা চাবির গোছা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। চাবির দায়িত্ব আর তিনি কোনদিনই নিজে গ্রহণ করেননি—তিনি তাঁর ধর্ম-কর্ম নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। খুব কম কথা বলতেন—এমনকি, আমাদের সঙ্গেও। ১৯৩৬ সনে আমার পিতার মৃত্যুকালেও তিনি জীবিত ছিলেন। চুয়ান্ন বছর বয়সে আমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। এর ফলেই অবশ্য আমরা আমাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই। পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে দাদী-আম্মার মৃত্যু হয়। তাই তিনি আমাদের অংশ লিখে দিয়ে যেতে পারেননি।

শৈশবের স্মৃতি আজ অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কেবল টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯১৪ সনে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমি নিতান্তই ছোট। ১৯১৯ সনে আমাদের বাড়ির পারিবারিক আবহাওয়াটা অসোয়াস্তিকর হয়ে উঠেছিল বলে আমার মনে আছে—কারণ আমার পিতা ও মাতার মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল যার জন্য আমার মাকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছিল। দাদী-আম্মা আমার মাকে প্রবোধ দিতেন। আমি সবকিছু বুঝতাম না। পরে জেনেছিলাম যে, আমার পিতার মতামত ছাড়াই মা আমার নানী-আম্মার নিকট থেকে হেবা সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি তাঁর একমাত্র ভাইকে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। আমার দাদী-আম্মার অনেক প্রচেষ্টার ফলে ১৯২২ সনে মা ও বাবার মধ্যে একটা মিটমাট হয়। ঘটনাটা খুব সাংঘাতিক কিছু ছিল না—এটা ছিল অনেকটা আত্মসম্মান ও অভিমানের ব্যাপার। আমার নানীর বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে মাইল পাঁচকে দূরে আটপাড়া গ্রামে। আর আমার নানার বাড়ি ছিল

সে যুগে নৌকায় দু'দিনের পথ—আওনা গ্রামে। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন আমাদের দেশে লঞ্চ সার্ভিস হয়নি। নানার মৃত্যুর পর নানী আটপাড়াতেই বসবাস করতেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা এবং সেই সূত্রে বাড়ি-ঘরও অনেক খাস-খামারের একমাত্র মালিক। তিনি বোধহয় মনে করেছিলেন মা'র পক্ষে তাঁর পিত্রালয়ে যাওয়া দূরুহ হবে—আর আমার একমাত্র মামার পক্ষে আটপাড়ার বাড়ি-ঘর, জমা-জমি দেখা সম্ভব হবে না। নানী বোধহয় ভেবেছিলেন যে, নানার সম্পত্তি আমার মামা একাই ভোগ করবে আর তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি আমার মা'ই ভোগ করবে। কিন্তু কিন্তু বিপদ বাঁধল যখন আমার মামা, নানী ও মা'র সঙ্গে চরম অভিমান করে কলকাতা চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে চাকুরী গ্রহণ করে বাড়ি আসা ছেড়ে দিলেন। কারণ তাঁর বুঝিবা ধারণা হয়েছিল যে, নানী তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। মা এ সমস্যার সমাধানের জন্য নানীর প্রদত্ত সম্পত্তি মামাকে দানপত্র করে দিলেন। আর এর জন্য যে বাবার একটা মতামত নেয়ার প্রয়োজন মা সেটা আদৌ ভেবে দেখেননি। এর ফলে বাবার যে আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে বা স্ত্রীর উপর তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ন হলো বলে মনে করবেন সে কথা মা'র মাথায় বোধহয় আদৌ আসেনি। আমার নানী ১৯২১ সনে ইন্তেকাল করেন—মা'র দুঃখের অবসান তিনি স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেননি। শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট নিয়ে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তাঁর ভুলের জন্য মা'র এই দুঃখ, নানীর মৃত্যুর পর কিভাবে তাঁর বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস ও বেহাত হয়েছিল তা আমরা জানি না। কারণ মা বা আমরা কেউ আর আটপাড়াতে বেড়াতেও যাইনি। যদিও আমাদের নিজেদের পাল্কি-বেহারা ছিল বা বর্ষাকালে চলার জন্য নিজেদের বড় নৌকাও ছিল। আওনা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে—আড়িয়াল বিল ছাড়াও ইছামতি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হতো। নৌকায় ডাকাতির বা ঝড়-বন্যার ভয় ছিল খুব তাই সেখানে যাওয়া ছিল ভয়ানক বিপদ-সঙ্কুল।

শৈশবে আমি আমাদের গ্রামে দেশলাইর প্রচলন বেশি দেখিনি। চিকন পাটখড়ির অগ্রভাগে গলান গন্ধক লাগিয়ে ঘরে রাখা হতো ও কাঠ-কয়লার আগুনে তাই দিয়ে বাতি জ্বালানো হতো। বিত্তশালীদের ঘরে সবেমাত্র হ্যারিকেনের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ লোকের ঘরে রেড়ির বা সরিষার তৈলের প্রদীপ ও কেরোসিনের কূপির প্রচলন ছিল—ঘরের বাইরে যেতে হলে তারা 'ল্যান্টার্ন' ব্যবহার করত। গাঁয়ে অভিজাত ঘরের ছেলেরা জুম্মার নামাজ, ঈদের সময়, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবের দিন আচকান, পায়জামা ও জড়োয়া টুপী ব্যবহার করত। অক্সফোর্ড-সু যাকে ইংরেজী জুতা বলা হতো তার প্রচলন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। ঈদুল আজহা, বিবাহ ও ফাতেহার সময় গরু খাসী জবাই করে আত্মীয়-স্বজন, রায়ত-প্রজা ও গরীব-দুঃখীকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করত। নিমন্ত্রিত অতিথীবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনরা চীনে মাটি বা এনামেলের থালায় আর সাধারণ লোকদের কলাপাতায় খাবার ব্যবস্থা হতো। হিন্দু প্রতিবেশীদের জন্য দৈ ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা থাকত। ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতি পরবের দিনে মা ও চাচীরা গভীর রাত জেগে সেমাই, সামুচা, চালের গুঁড়ার রুটি, নানা প্রকার হালুয়া, নারকেলের নাড়ু ও ডালের হালুয়া ও বরফি তৈরী করতেন। গাঁয়ের ছেলেরা অনেকেই বিশেষ করে মুসলমান

ছেলেরা পাঠশালা বা মক্তবে পড়তেন—কিন্তু যারা বিত্তশালী বা অভিজাত তারা কিছুদিন বাড়িতে পড়াশুনা করেই ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হতেন। গ্রামের মুসলমানেরা লুঙ্গী ও কুর্তা ব্যবহার করতেন। ঐ কুর্তাকে আমাদের দেশে "পাঞ্জাবী" বলা হতো। নামটা কেন যে "পাঞ্জাবী" হলো তা আজো আমি জানতে পারিনি। পরবর্তীকালে "পাঞ্জাবীরাই" আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, আমাদের কুর্তাকে আমরা "পাঞ্জাবী" বলি কেন ? অবশ্যই বহুকাল পরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে বর্মাদেশে আমি যখন রাষ্ট্রদূত তখন সেখানে তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেফের গায়ে অমনি ধরনের কুর্তা দেখে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে, ইউক্রেনে ঐ ধরনের কুর্তা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনকালে কোন রকম যোগাযোগ হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আমাদের যাঁরা গুরুজন ও মুরুব্বি তাঁরা সাদা লুঙ্গী, সাদা কাপড়ের লম্বা কুর্তা, কল্লিদার টুপি ও চটিজুতা পরতেন কেবলমাত্র নামাজের পূর্বে অজু করার সময় কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন। ঢাকা শহরে প্রচলিত কিস্তিটুপি ঢাকা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায়নি। সাদা কাপড় পরিধান কতকটা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে সে যুগে ধরে নেয়া হতো।

গ্রামের হিন্দুরা সবাই ধুতি পরত—তবে বিত্তশালীরা ধুতি ও পাঞ্জাবীর সঙ্গে ভাঁজ করা চাদর কাঁধে রাখত। শীতকালে অবশ্য মুসলমানেরাও শীত নিবারণের জন্য চাদর বা আলোয়ান ব্যবহার করত। হিন্দু পাড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় কাঁসার ঘন্টা বাজানো হতো—ধূপ-ধুনা দিয়ে আরতি দেয়া হতো। মাঝে মাঝে কীর্তনের ব্যবস্থা হতো—যেমন হতো মুসলমানদের বাড়িতে মিলাদ মহফিল; হিন্দু ভদ্র লোকদের বাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যার দিকে গলা সাধ্‌ত বা গান-বাজনা করত। তখনকার দিনে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল না থাকায় লোকে দৈনিক খবরের কাগজের পরিবর্তে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজের গ্রাহক হতো।

অভিজাত ঘরের মেয়েরা ঢাকাই শাড়ী, শান্তিপুরী শাড়ী, জামদানী শাড়ী ব্যবহার করতো, সিল্কের ব্যবহার তেমন ছিল না—কেবল বিয়ের সময় বেনারশী শাড়ী ব্যবহার করা হতো। আটপৌরে কাপড় বলতে তখন পাতলা বিলেতি কাপড় বোঝা যেত। গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরা অল্প দামের তাঁতের কাপড় ব্যবহার করত। শৌখিন পুরুষরাও অনেকে শান্তিপুরি ধূতি ও গীলা করা আদ্দি কাপড়ের পাঞ্জাবী ব্যবহার করত। মুসলমানদের মধ্যে এসবের প্রচলন কম ছিল। এ সকল কাপড় যারা ব্যবহার করত তারা ফুলতোলা পেটেন্ট চামড়ার পাম্প-সু ব্যবহার করত। হিন্দু মেয়েরা সাধারণতঃ জুতা পরত না। তবে এ ধরনের পোশাক বেড়াবার জন্য ব্যবহার করা হতো। হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র সরকারী চাকুরে ছাড়া আর কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি।

আশ্বিন মাসে সাধারণতঃ শহরের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকত। তাই এ সময় হিন্দু-মুসলমান চাকুরে সবাই গ্রামে ছুটি কাটাতে আসত। অন্য গাঁয়ের কথা জানি না। তবে বিক্রমপুরের গ্রামাঞ্চলে এটাই সাধরণতঃ দেখা যেত। গ্রামে এ মাসটা বেশ আনন্দ-উৎসবে কাটত। আমাদের গ্রামে বর্ষাকালে চলাচলের জন্য নৌকাই কেবল ব্যবহার করা হতো—তাই প্রায় সকল বাড়ির ঘাটেই ডিঙ্গী নৌকা বাঁধা দেখা যেত।

বর্ষাকাল চলে গেলে ঐ নৌকাগুলি পুকুরেই ডুবিয়ে রাখা হতো। বড়লোক হিন্দুরা ঘটা করে দূর্গা পূজা করত, আমরাও ছোটবেলা প্রতিমা দেখতে যেতাম। নৌকা বাইচ হতো সাধারণতঃ প্রতিমা বিসর্জনের দিন। বাইচের নৌকাগুলি লম্বা কিন্তু পাশে কম থাকত—নানা রঙ্গে সজ্জিত করা হতো দু'টো পাশই—লাল, হলদে, নীল, সবুজ ও সাদা রং দিয়ে ছবি বা ফুল আঁকা থাকত—মাঝে মাঝে বাঘ বা চিতার ছবিও দেখা যেত—সম্মুখে বা পেছনে ময়ূরের ছবি থাকত—আবার কোন কোন সময় জলপরীর ছবিও দেখা যেত। বিজয়া দশমীর পর আনন্দ কমে যেত তবে বার দশরার মিষ্টান্ন বা লক্ষ্মীপূজার নাড়ু হিন্দুবাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে এসে যেত। এছাড়াও চৈত্র মাসের শেষের দিকে হিন্দু প্রজারা কাসুন্দী বানিয়ে পাঠিয়ে দিত।

গ্রামের সাধারণ লোকেরা কাঁসা ও পিতলের বাসন-পেয়ালা ব্যবহার করত। কারণ বোধহয় বিপদে-আপদে ওগুলো বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করা চলত। একমাত্র ভদ্র মুসলমান পরিবারের মধ্যেই চীনা মাটির বাসন ও কাচের গ্লাসের প্রচলন ছিল।

তখনকার দিনে গ্রাজুয়েট হলেই ডিপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যেত। আর যাঁদের অতটা পড়াশুনা করার অনিচ্ছা ছিল তাঁরা অন্ততঃ সাব-রেজিস্ট্রার হতে পারতেন। সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার কম হলেও গ্রামের লোকেরা তাঁদের সম্মানের চোখে দেখত। সরকারী চাকুরী হতো স্থায়ী আবার অবসর গ্রহণ করার পরেও অর্ধেক বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা থাকার জন্যেই বোধহয় তাঁরা এ সম্মান পেতেন। টাকার মূল্য এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল বলে তাঁরা মোটামুটি সুখে জীবনযাপন করতেন। অনেক সময় আবার সাহেবদের সুনজরে পড়লে বা কংগ্রেস ভলান্টিয়ার কর্তৃক অপমানিত হলে লেখাপড়া তেমন না জানলেও বড় চাকুরী পাওয়া যেত। গল্প আছে যে, এমনি একজন ডিপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—যাঁকে একদিন এক সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁকে কোর্ট নাজীরের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাকে সাব-ডিপ্‌টির কাজে বহাল করতে। সে তখন যুবক। কিছুদিন পরে নাজির শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন যে, যুবকটির যে বিদ্যা তাতে সে ঐ কাজ করতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উত্তরে লিখলেন, "Try him as a Deputy Magistrate". অর্থাৎ সে যদি সাব-ডিপ্‌টির কাজ না করতে পারে তবে তাঁকে ডিপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পরীক্ষা কর। এরপর নাজির আর উচ্চবাচ্য করনেনি। আর এক ডিপুটি সাহেবের কথা জানি, যাঁর সই কেউ পড়তে পারত না। সইয়ের চেহারাটা দেখতে পাল্কীর মত ছিল—তাই সকলে তাঁকে "পাল্কি ম্যাজিস্ট্রেট" বলে জানত। তিনি আমাকে একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন যে, তাঁর লেখা কোনদিনই সোজা লাইনে চলত না—নীচের দিক থেকে ক্রমাগত উপরের দিকে চলে যেত। একসময় এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার তাঁকে বলেছিলেন,—

> "Semetics write from right to left, Aryans write from left to right, Japanese write from top to bottom but you Maulavi Saheb write from bottom to top."

গ্রামের যে সব ভদ্র মুসলমান পরিবার কেবল তালুকের আয়ের উপর নির্ভর করত তাঁদের সময় কাটত, পরের কুৎসা করে নয়—রায়ত-প্রজার বিচার-আচার করে। কেউ কেউ শখ

মেটাবার জন্য ষাঁড়ের লড়াই, পাঁঠার লড়াই, মোরগের লড়াই বা কবুতরের লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতেন বিশেষ করে পৌষ-মাঘ মাসে। গ্রামের সাধারণ ছেলেরা হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, সাঁতার বা ঘুড়ি উড়িয়ে সময় কাটাত—কেউবা মাছ ধরত—তবে স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলত। হিন্দু পাড়ার ক্লাব, কুস্তির আখড়া, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়ামের ব্যবস্থা গ্রামে বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে বেশ চালু হয়েছিল।

মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ির বৈঠকখানায় সাধারণতঃ একজন মুন্সী থাকত—প্রায় সকল মুন্সীর বাড়িই কিন্তু নোয়াখালী জেলায় ছিল। তাঁরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আমপারা পড়াতেন ও বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় আজান দেয়া, ইমামতি করা, মিলাদ পড়া, খতম পড়া বা জানাজা পড়া। এছাড়া পশ্চিম দেশীয় পীর সাহেবরা গ্রামে এসে লোকদের হেদায়েত করতেন ও পানি-পড়া বা তাবিজ-কবচ দিতেন—পরিবর্তে নগদ টাকা, মুরগী, হাঁস, ঘি, ডিম নিতেন আর পোলা ও জর্দা খেতেন মুরিদানের বাড়িতে।

আমাদের গ্রামে কৃষকরা বেশির ভাগই বর্ষাকালে বেকার থাকত। আর হিন্দু মহাজনের নিকট থেকে ঋণ করে পরিবারের ভরণপোষণ করত। মহাজন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে টাকা ধার দিতেন—সে ঋণ আর কোনদিন শোধ হতো না। গ্রামের সাধারণ লোকের সকালের নাস্তা ছিল মুড়ি, মোয়া, চিড়া, দৈ ও খৈ। চাষাবাদের সময় চাষীরা পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যেত। গ্রামের লোকের এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক বা ইউনানী ওষুধের উপর আস্থা ছিল খুব কম। তারা আয়র্বেদ কবিরাজদের উপর বেশি ভরসা রাখত।

বাবার সঙ্গে মায়ের একটা মিটমাট না হওয়াতে আমার স্কুলে যেতে দেরী হতে লাগল। দাদী-আম্মা তাই স্থির করলেন, আমাকে ঢাকায় আমার সেজ কাকার নিকট পাঠিয়ে দেবেন। ঢাকা শহর আমাদের বাড়ি থেকে পনেরো মাইল দূরে। আমার সেজ কাকা তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে চাকুরী করছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান গ্র্যাজুয়েট। আমাদের সংসারে যে আবহাওয়া চলছিল তাতে আমাকে দূরে রাখাই দাদী-আম্মা সমীচিন মনে করেছিলেন। আমার মা ছিলেন "মা-জাতের" মেয়ে। তিনি গৃহস্থালি, রান্না-বান্নার তদারক, ছেলে-মেয়ে, শ্বাশড়ী, ননদ, দেবর, জায়েদেব নিয়ে একটা বিরাট সংসারের ভার যতটা সম্ভব একাকী বহন করতে চাইতেন আর বাবা চাইতেন অনন্দটুকু। স্ত্রীর নিকট থেকে তিনি বোধহয় আশা করতেন যা উপন্যাসের নায়ক আশা করে তাঁর নায়িকার কাছ থেকে—মা'র সে প্রতিভা ছিল না, সুতরাং সম্পত্তির ব্যাপার ছাড়াও আমাদের সংসারে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। আমরা সেটা অনুভব করতাম—কিন্তু তখন কোন কারণ খুঁজে পেতাম না।

আমার শৈশবের একটি ভীষণ দুর্যোগের রাতের কথা আজো মনে আছে। সেটা ছিল ১৯১৯ সনের আশ্বিন মাস। বাড়িতে পুরুষ লোক বলতে ছিল শুধু এক চাচা আর চাকর সামছু। আমরা আদর করে ওকে ডাকতাম "সামা" বলে। সেদিন বিকেল থেকেই ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে থাকে।—আমাদের

চারজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমার মা ও দাদী-আম্মা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন—কিন্তু ঝড়ের বেগ এত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ ও উড়ন্ত টিনের কড় কড় শব্দ ও পাশের বাড়ির ঘন ঘন আজানের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। দাদী-আম্মা ও মা পাশের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন—কারণ সেখানে অনেক পুরুষ মানুষ ছিল। মা হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে যেই মাত্র দরজা খুলেছেন অমনি একটা প্রবল দমকা বাতাসে হ্যারিকেন নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশটাও যেন কেন অত রাতেও লাল দেখা যাচ্ছিল। পথ চলার সহায় রইল কেবল বিদ্যুতের ঝলকানি। সামা আমার দু'ভাইকে কোলে তুলে নিলো, মা আমার ছোট বোনকে তুলে নিলেন—আর আমি চাচার পেছনে পেছনে চললাম। কিন্তু তখনই আম গাছের একটা বড় ডাল আমার উপর পড়ল—ভাগ্য ভাল মাথায় পড়েনি। ডান পা'টা বহু কষ্টে টেনে বের করে ঐ বাড়িতে পৌঁছলাম। পা কাটায় রক্ত পড়ছিল—যার ফলে আমার ডান পা'টা একটু খোঁড়া হয়েছিল। মা তো আমার জন্য চীৎকার করে অস্থির—আমাকে যেন কে তুলে নিয়ে ছোট একটা কোঠায় যেখানে পাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের রাখা হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেল—সে যে কি ভয়ানক রাত। সকালে ঝড় কমে এল—বাইরে এসে দেখলাম উঠানে পানি থৈ থৈ—গোলার চাল ভিজে ভাতের মত হয়ে গেছে। সেগুলোই একটু সিদ্ধ করে খাবার ব্যবস্থা করার জন্য যোগাড়-যন্ত্র চলতে লাগল। চারদিকে অথৈ পানি আর পানি। কত যে মৃতদেহ চারদিকে। এরই মধ্যে দেখা গেল সুন্দরী একটি যুবতী মেয়ের গায়ে স্বর্ণালঙ্কার, লাল চেলী কাপড় পরিধানে—কপালের সিঁদুর তখনো ধুয়ে-মুছে যায়নি। শাঁখার চুড়িজোড়া বালার উপর চক্ চক্ করছে—থানায় খবর পাঠানো হলো—তারপর কি হয়েছিল আমার মনে নেই।

সে বছরই চৈত্র মাসে আমাদের গ্রামে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিল। চাচীরা তাঁদের পিত্রালয়ে বা চাচাদের নিকট চলে গেলেন। মা পালালেন না, প্রথম কারণ, বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী, দ্বিতীয় বোধহয় বাবা একবার বাড়ি আসতে পারে এ ধারণা তাঁর হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার ভীষণ জ্বর উঠল—দু'তিন দিনের মধ্যেই মুখে, হাতে ও পায়ে বসন্ত দেখা দিল—পরে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম—কলাপাতার উপর মাখন মেখে তার উপর শোয়ান হলো—ঘাসের পাতার সাহায্যে গায়ে দুধ ছিটান চলতে লাগল। প্রায় এক মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার মুখের চেহারা এমন বিকট ও বিশ্রী হলো যে, আমি বহুকাল পর্যন্ত আয়নার দিকে তাকাইনি।

বর্ষাশেষে কোথা থেকে একটি একটি করে নৌকা এসে আমাদের খেলার মাঠের পাশের খালের কাছে ভিড়ত—তারপরে একসঙ্গে অনেকগুলো করে আসতে থাকত, লগির সাথে নৌকাগুলো বাঁধা হতো—মনে হতো যেন বাঁশের ঝোঁপ অবশ্যই পাতা ছাড়া বাঁশ—রাতের অন্ধকারে নৌকার প্রদীপের চেয়ে পানির মধ্যে যেন প্রদীপগুলির নাচ সুন্দর দেখাত। এদের লোকে বাদিয়া বলত, এরা বেদে বা জিপ্সী কিনা তা আমি বলতে পারি না—নৌকাগুলোই এদের বাড়ি-ঘর। মেয়েদের জন্য কাচের চুড়ী, ছেলেদের জন্য

খেলনা, টিয়া-পাখী ও ময়না পাখীর বাচ্চা বিক্রয় করত। বানর ও সাপের খেলা দেখতে আমরা জমা হতাম—সাপ ধরার মন্ত্র শেখার জন্য তাদের অনেক অনুরোধ করেছি—অবশ্য কোন ফল হয়নি—আশ্বিনের শেষের দিকে পানি যখন কমে আসত তখন তারা আবার নৌকা ছেড়ে দিতো আবার কোন্ অজানা দেশের সন্ধানে তা কিছুই জানতাম না। ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ওদের নৌকাগুলো সব ভেঙ্গে দেয়, ফলে আর তেমনি নৌকার বহর আমার চোখে পড়েনি।

১৯২০ সনে আমার ঢাকা যাবার কথা ছিল কিন্তু স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, মা সে বছর আর আমাকে ঢাকা যেতে দিলেন না। ফলে পড়াশুনা আরম্ভ করতে এক বছর দেরি হয়ে গেল। পরের বছর আমি ঢাকার এসে আমার সেজ কাকার বাসায় উঠলাম। তখনকার দিনে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকা যাবার পথ বর্ষাকালে নৌকাযোগে। সারারাত নৌকা চলত—খাল, বিল ও নদীর উপর দিয়ে। রাত যত গভীর হতো ততই নিস্তব্ধতা বাড়তে থাকত—একমাত্র দাড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ আর মাঝির হালের কোঁকানি—কিন্তু যার জন্য আমার মন অধীর হয়ে থাকত তা ঐ মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালী গান। শারী গান বা মুর্শিদী গানও গাইত তারা—সে যে কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আজকাল অবশ্যই দ্রুতগামী লঞ্চ সার্ভিস হয়েছে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি যাওয়া যায়—কিন্তু ঐ ক'টা ঘণ্টা কাটানোই যেন নরকবাস সমতুল্য মনে হয়। মোটরের অনবরত কান ফাটানো ঘট্ ঘট্ শব্দ আর যাত্রীর ভীড় ভ্রমণের আনন্দ শেষ করে দেয়। পুরনো দিনের কথা, Wordsworth-এর ভাষায় বলা যায়,—

*"For oft, when on my couch I lie*
*In vancant or in pensive mood,*
*They flash upon that inward eye*
*Which is the bliss of solitude."*

ঢাকা আসার পর শুনলাম যে, আমাকে প্রায়ই এক বৎসর কাকার কাছেই পড়তে হবে নইলে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করা অসম্ভব হবে। কাকার বাসা ছিল দেওয়ান বাজার। টিচারস্ ট্রেনিং কলেজের "ডিমোনেস্ট্রেশন স্কুল" যা সাধারণ লোকে আরমানিটোলা স্কুল বলত সে স্কুলেই আমাকে ভর্তি হতে হবে। পরবর্তীকালে সে স্কুলের নাম হয়েছিল "ল্যাবরেটরী স্কুল"। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ডক্টর ওয়েষ্ট, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মিস্টার বিস্ ও হেড্মাস্টার ছিলেন মিস্টার টি. জে. কলিন্স। স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। ১৯২২ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে "এড্মিশন টেস্ট।" পরীক্ষা দিলাম—জীবনের প্রথম পরীক্ষা—ফল বেরুলে দেখা গেল আমি তৃতীয় স্থান দখল করেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা দু'জন মুসলমান ছেলেকে সেবার ভর্তির জন্য গ্রহণ করা হয়। বাকি ছেলেরা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, হিন্দু, গুর্খা ও "ন্যাটিভ ক্রীশ্চিয়ান।" স্কুলের ইউনিফরম ছিল খাকী হাফ্ প্যান্ট, হাফ শার্ট, খাকী মোজা ও কালো বুটজুতা। এক এক ডেস্কে দু'জন করে বসতে হতো। একমাত্র মনিটর ছাড়া—তার জন্য ব্যবস্থা ছিল সিঙ্গল ডেস্ক।

তখনকার দিনে ঢাকায় বালকদের জন্যে সরকারি স্কুল ছিল তিনটি, আমাদের স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল ও মুসলিম হাই স্কুল। মুসলিম হাই স্কুলেই বেশির ভাগ মুসলিম ছেলেরা পড়ত—সব ছাত্রই সেখানে মোহ্‌সিন স্কলারশীপ পেত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। কলেজিয়েটে বেশির ভাগই ছিল হিন্দু ছেলে—শিক্ষার মাধ্যমে ছিল বাংলা আর আমাদের স্কুলের মাধ্যম ছিল ইংরেজী। এছাড়া কয়েকটি মিশনারী স্কুলেও ইংরেজী মাধ্যম ছিল।

ঢাকা ছিল ছোট মফঃস্বল শহর। ইটের খোলার রাস্তাই ছিল বেশি। ধূলায় ধূসরিত থাকত সারাদিন—একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া। বসন্তে ও গ্রীষ্মে বিকেল বেলা বড় বড় রাস্তায় হৌজের পাইপের সাহায্যে ভিজিয়ে দেয়া হতো। বিশেষ করে যে সব রাস্তায় ঢাকার নবাব সাহেব বা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা চলাফেরা করতেন। শ্বেতাঙ্গ অফিসার সবাই রমনায় নতুন শহরে বাস করত। রমনার নতুন শহর সৃষ্টি হয়েছিল ১৯০৬ সন থেকে ১৯১১ সনের মধ্যে যখন ঢাকায় পূর্ব-বাংলা ও আসামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক সাহেব তখন ঢাকার ডেপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট এবং একমোডেশন অফিসার।

নবাব সাহেবের টম্ টম্ যেসব ছোট রাস্তায় যেত সেখানেও গরুরগাড়ি বা ভিস্তির সাহায্যে পানি ছিটিয়ে দেয়া হতো। বেশির ভাগ মুসলমান বাড়িতে পান করার জন্য ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের জন্য ভিস্তিরা পানি সরবরাহ করত। এক ব্যাগ পানির (অর্থাৎ প্রায় চার কলস পানি) জন্য চার পয়সা দিতে হতো।

ঢাকার বাকরখানি, শিক-কবাব ও শুখারুটির খুব নাম ছিল। বড় একখানা বাকরখানি পনির ও ঘিয়ে ভাজা হলে দাম হতো দু'আনা। সাধারণ বড় বাকরখানি চার পয়সা। একখানা বাকরখানি ও দু'আনার শিক-কবাব হলে সকাল বেলার নাস্তা হয়ে যেত। চালের মন সাড়ে তিন টাকা। বালাম চাল—শহরের লোকেরা খেত, আউশ, বোরো খেত না—আর ইরির তো জন্মই হয়নি। কাঠ-খড়ির মণ আট আনা অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সা। মধ্যবিত্তের বাস করার উপযোগী বাড়িভাড়া ছিল দশ থেকে পনেরো টাকা। গরুর মাংস দু'আনা, খাসীর মাংস চার আনা। মাছ, মুরগী, ডিম, তরি-তরকারী, মসলা পানির দরে বিক্রি হতো। ঢাকার দুধ অবশ্যই ভাল ছিল না। গয়লারা পানি মেশাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করত না। যদিও কড়ির প্রচলন নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল ইতিপূর্বেই তবু ডবল পয়সা, পয়সা, আধা-পয়সা, পাই-পয়সার পরে কড়িও চলত—বিশেষ করে মুদি দোকানে। মুদি দোকান থেকে চার পয়সার জিনিস কিনলে "ফাউ" পাওয়া যেত। মাছের বাজারেও সে নিয়ম ছিল। একশ' আম কিনলে দু'শ আম পাওয়া যেত। আম দু'টোকে একটা গোনা হতো।

কোন কোন ভদ্রলোক নিজেদের বেড়াবার জন্য টম্ টম্ রাখতেন। সাধারণ লোকের যানবাহন বলতে ঘোড়ার পাল্কি গাড়ি। মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যে কঠিন পর্দা প্রথা ছিল। গাড়ির খড়খড়িও খুলত না। মেয়েরা বোরকা পরা থাকলেও কেউ কেউ গাড়িতে বা বাড়িতে উঠা-নামা করতে মশারী ব্যবহার করত।

ঢাকার প্রবাদ ছিল, "খাজা, কুট্টি, শাঁখা—তিনে মিলে ঢাকা"। প্রবাদটা একেবারে মিথ্যে ছিল না। রইস মুসলমান বাসিন্দারা যাদের সাধারণভাবে কুট্টি বলা হতো তারা

কথাবার্তায় যেমন রসিক ছিল তেমনি ছিল তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। লেখাপড়া এরা একেবারেই শিখত না, কিন্তু বুদ্ধি ও সাহস দুইই তাদের ছিল। পাকিস্তান হবার পরে বাস্তুহারাদের চাপে ও অন্যান্য জেলা থেকে স্থায়ী বাসিন্দারা ধীরে ধীরে শহরে এসে জমা হওয়ায় তারা হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয় আয়ুব-মোনেম সরকার দ্বারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত সিদ্দিক বাজারের মতি সর্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুগের অবসান হয়ে গেছে।

ঢাকা শহরে চকবাজার থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত ছিল মুসলমানদের একটা সমাজ—আর এক সমাজ চকবাজার থেকে লালবাগ পর্যন্ত। এক সমাজের বিবাহ উৎসবাদির নিমন্ত্রণপত্র অন্য সমাজে যেত না—অনেকটা আশরাফ আতরাফের ব্যাপার। এখন আর সে সবের অস্তিত্ব নেই।

খাজা সাহেবরাই ঢাকার মুসলমানদের নেতৃত্ব করতেন। বুদ্ধি বা বিদ্যার জন্য নয়—বৃটিশরাজ তাদের সুনজরে দেখতেন বলে। খাজা সাহেবদের মস্ত বড় জমিদারী ছিল কিন্তু ঢাকার রইস বাসিন্দাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থাই তারা করেননি। এর কারণ জানা গেল যখন ১৯২১-২২ সনে আবুল হুসেন এম. এ., এল.এল. খাজা আহসানউল্লাহকে লিখিত তাঁর পিতা নবাব আবদুল গণি সাহেবের একখানা পত্র তার খবরের কাগজে প্রকাশ করেন। এ পত্রখানা তার হাতে পড়ে যখন ঢাকার আবদুল গনি চৌধুরী বঙ্গীয় পরিষদে ওয়াকফ্ আইনের উপর একটি বিল উপস্থিত করার জন্য আবুল হুসেন সাহেবের সাহায্য চান। আবুল হুসেন সাহেব নওয়াব ষ্টেটের ওয়াকফ্ জমিদারীগুলোর কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন, নবাব সাহেব তার পুত্রকে লিখেছিলেন যে, তিনি যেন মনে রাখের যে ঢাকার কুট্টিরা তাদের প্রজা নয়—অথচ তাদের প্রজার মত ব্যবহার করতে হবে—খানদানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ সব লোক যদি লেখাপড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করতে—কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা না করতে। ঐ চিঠি প্রকাশ হবার পর আবুল হুসেন সাহেবের প্রতি নবাবেরা কেবল বিরূপই হয়নি তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টাও করেছেন। কেবলমাত্র শহরের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের জন্য অনেকটা বেঁচে গেছেন।

মফস্বল হতে আগত ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী, বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় যারা ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতে এসেছিলেন—তাদের মধ্যে অনেকেই স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার ফলে রাজ সরকারের উচ্চ পদে তারাই অধিষ্টিত হতে পেরেছিলেন। শহর-বন্দরের ব্যবসা যে যুগে হিন্দুরাই চালাত। নবাব সাহেবের জমিদারী চালাবার জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে হতো। হিন্দু উকিল ও হিন্দু ডাক্তারদের উপরই তারা নির্ভর করত বলে নবাব বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়িতেই যাতায়াত করত। ঢাকার সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষার ভার নেবার কেউ ছিল না। নবাবদের প্রয়োজনেই কেবল তাদের ব্যবহার কর হতো।

মফস্বল থেকে বেশ কয়েক ঘর মুসলমানও ঢাকা শহরে বাড়ি-ঘর করতে থাকেন। তারা বেশির ভাগই গ্রামের জমিদার বা তালুকদার। শহরে বাড়ি করতেন সমাজে মান বাড়াবার জন্য। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছিল বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীতো ছিলই না। এদের বেশির ভাগই গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। তাদের অনেকেই যে সব আনন্দ-স্ফূর্তির কোন ব্যবস্থা গ্রামে ছিল না বা গ্রাম সমাজে যে সকল কাজকে অন্যায় ও অসামাজিক বলে গণ্য করা হতো সে সব আনন্দ বা জীবন উপভোগ করার জন্য তারা শহরে বাড়ি করতেন। সে কারণে তারাও ঢাকার রইসদের ব্যাপারে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অমনোযোগী ছিলেন। অবশ্যই বর্ণ হিন্দুদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে কারণ তারাও হিন্দু রইস, শাঁখারী বা তাঁতীদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেননি। কুট্টি, শাঁখারী ও তাঁতীদের মত খাজা সাহেবদেরও লেখাপড়ার দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না। যারা শিক্ষিত হবার চেষ্টা করেছেন তারা তাদের ঘর-জামাই সন্তান। ঐ বাড়ির খুব কম ছেলেরাই মুসলিম হাই স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে কলেজে প্রবেশ করেছেন। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন তাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। তবে উর্দু ও ইংরেজী ভাষাটা মোটামুটি চলনসই বলে যেতে পারত। নবাব সাহেবদের একটা বিশেষ দৃষ্টি ছিল যাতে মেয়েদের স্বামীরা জমিদারীর অংশ দাবী না করে; সুতরাং তাদের বিবাহ দেয়া হতো এমন সব স্বামী বেছে যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধিতো ছিলই না তাদের নামও কেউ জানত না, যেমন খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা শাহাবুদ্দিন শহরবানুর ছেলে বলেই সাধারণে পরিচিত। তেমনি সৈয়দ আবদুল হাফিজ ও সৈয়দ আবদুস সেলিমকে আমিনা বিবির সন্তান বলেই শহরের লোক জানত।

বুর্জোয়াঁ হিন্দু সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে শহরে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। কারণ শহরের রইছ কুট্টিরা থাকল বস্তিতে, শাঁখারীরা রইল শাঁখারী পট্টিতে আর খাজা সাহেবরা আহসান মঞ্জিলের চার দেয়ালের ভেতরে। ইউরোপের মত এদেশেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই গড়ে উঠতে থাকে শহর, বন্দর ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার।

খাজা পরিবারের বহু লোককে আমি ছোট বেলা থেকে জানতাম যারা নারায়ণগঞ্জ তো দূরের কথা চকবাজার পার হয়ে লালবাগ পর্যন্ত যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে কলকাতায় রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করার পর থেকে আহসান মঞ্জিলের যারা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছিল তারা ঢাকার বাইরে যেতে আরম্ভ করল।

কুট্টির ঝগড়া-ঝাটি হলে মামলা-মোকদ্দমা করতে কোর্টে যেত না। ঢাকা শহর বাইশ পঞ্চায়েতে বিভক্ত ছিল—তারাই বিচার-আচার করত, পঞ্চায়েতের বিচারের বিরুদ্ধে নবাব সাহেবের নিকট আপীল চলত। শহরের মুসলমান রইছরা ওস্তাগারী, গাড়ি চালানো, মাংস বিক্রি প্রভৃতি ব্যবসা করত। পরবর্তীকালে তারা চা বা সরবতের দোকান ছেড়ে কাপড়, জামা, জুতার দোকান খুলতে লাগল। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করা যায় মির্জা আবদুল কাদের সর্দারের। ছোটবেলায় খাজা ইসমাইল সাহেবের কাজ করত।

কোকেনখোর খাজা সাহেবদের কাছ থেকে সে বেশ টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়েছিল। তার প্রতাপ ছিল খুব। আমি যখন সবেমাত্র স্কুলের ছাত্র তখন সরদার সাহেব "ডায়মন্ড থিয়েটার" ক্রয় করে এবং বিদ্যুৎ ও আরো কয়েকজন নটীর সাহায্যে থিয়েটারটা কিছুদিন চালু রাখে। পরে ছায়াছবির যুগ আরম্ভ হলে সিনেমা ব্যবসা আরম্ভ করে। লায়ন সিনেমা ঢাকার একটা পুরানো সিনেমা হল। বায়ান্ন গলি তেপ্পান্ন বাজারের শহর ঢাকার মুসলমান সাধারণ বাসিন্দারা তার থিয়েটার দেখার জন্য ব্যস্ত থাকত।

সে যুগে বাংলাদেশের সব জেলায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু ঢাকায় ঐসব ধরনের জ্বর বড় একটা দেখা যেত না। যদিও ঢাকা শহর মশার উপদ্রবের জন্য বিখ্যাত ছিল—কিন্তু সেগুলো এনোফিলিস মশা ছিল না—ঢাকার মশায় কামড়ালে ফাইলেরিয়া হয় এই ছিল সবার ধারণা। কারণ বোধহয় ঐ রোগটার প্রাদুর্ভাব ঢাকায় ছিল খুব বেশি।

১৯১১ সনে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হবার ফলে সলিমুল্লাহ অন্তরে খুব আঘাত পান কারণ, প্রথমতঃ ঢাকা আর রাজধানী থাকল না; দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের নিকট পরাজয়। ইংরেজ সরকার প্রথমে তাকে বৃটিশ রাজের সর্বোচ্চ খেতাবসমূহ যেমন, G.C.S.I., G. C.I. E. প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করেন পরে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৫ সালে স্যার সলিমুল্লাহর মৃত্যু হয় আর ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে যথেষ্ট আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমিও আমার কাকার সঙ্গে সে উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথম পর্দা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল স্টেজের উপর মস্তবড় একটা ভারতের মানচিত্র। এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজন শিক্ষক আর এক পাশে একজন ছাত্র ও শিষ্য। শিক্ষক মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছাত্রকে বললেন, "হে বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব ভারতের মানচিত্র।" দু-জনের মধ্যে কথোপকথন আজ আর আমার মনে নেই। তারপর কেমন করে যেন মানচিত্রের মাঝখানটা খুলে গেল—সেখানে দেখা গেল একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের মুখ—আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতার বন্দনা "সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলাং" গানটি বহু কণ্ঠে গীত হল। তারপর দেখান হলো একটা ছায়াছবি—অবশ্যই নির্বাক—ম্যাজিকল্যান্টার্নের সাহায্যে। ছবিটি ছিল মহাভারতের অংশ বিশেষ। আমার কেবল মনে আছে ভীম আর দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ—আর দুর্যোধনের পতনের পর ভীম একটা বিরাট বৃক্ষ উৎপাটন করে কৌরব সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর শুরু হলো নাটক "দেবলাদেবী"—অভিনয় কিছুক্ষণ দেখেছিলাম ভালই লাগছিল—কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

মফস্বল থেকে আগত মধ্যবিত্ত মুসলমান ভদ্রলোকেরা মাহুতটুলী, বেচারাম দেউরী, বেগমবাজার, সাতরওজা, দেওয়ান বাজার প্রভৃতি মহল্লায় বসবাস করতেন। অবশ্যই এছাড়া আউলাদ হুসেন লেনে, জিন্দাবাহার লেনেও কিছু কিছু পরিবার আস্তানা গেড়েছিলেন।

বুর্জোয়াঁ হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে শহরটাকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে—হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আরম্ভ হয়। হিন্দু বাবুদের মুসলমানদের প্রতি একটা ঘৃণা না হলেও তাচ্ছিল্লের ভাব ছিল—আমি যেসব হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশতাম তারাও মিষ্টি খেতে দিত খাবার পাত্রে নয়—উপর থেকে একটা মিষ্টি হাতে ছেড়ে দিত—ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে। এ সম্বন্ধে নীরোদ চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে আল বেরুণীর বরাত দিয়ে বলেছেন,—

> "The Hindus" writes Alberuni, "believe tl 'here is no country but theirs, no nation like theirs, no scie like theirs. They are haughty, foolishly vain, self-conceited, d stolid. They are by nature niggardly in communicating that which they know, and they take the greatest possible care to withheld it from men of another caste among their own people, still much more, of course, from any foreigner." He further added, "There is very little disputing about theological topics among themselves, at the utmost, they fight with words, but they will never stake their soul or body, or property on religious controversy, on the contrary, all their fanaticism is directed against those who do not belong to them—against all foreigners. They call them "Mlechha" i.e. impure, and prohibit any connection with them."

আমার মনে হয় অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রতি তাদের এহেন ব্যবহারের চাইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যা ১৯২৬ সন থেকে ঢাকায় প্রতি বছর ঘটছিল তার পেছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ। এসব দাঙ্গাসমূহের বিশেষত্ব ছিল যে দাঙ্গায় মুসলমান নিম্নশ্রেণীর লোক ও হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা অংশ গ্রহণ করে। হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কেবল শাঁখারীরা অংশ নিয়েছিল এর কারণ বোধহয় যে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বঙ্গভঙ্গ রহিত করার জন্য হিন্দু মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের মহল্লাগুলিতে কুস্তির আখড়া ও ক্লাব গড়ে তুলতে থাকে। ছুরি, লাঠি, তলোয়ার, পিস্তল ও রিভলবার চালনা শিক্ষা নেয়। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হবার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাদের সে শিক্ষা কাজে লাগিয়েছিল—অবশ্যই এ কথা ভুললে চলবে না যে সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের মধ্যেও আত্মঘাতী মারামারিতে লিপ্ত হতো। অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস প্রভৃতির মধ্যে হানাহানি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

নীরোদ চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

> "When we were very young, that is to say when the "Swadeshi Movement had not coloured our attitude to the Muslims, we presented four distinct aspects in our attitude towards them as it was shaped by tradition. In the first place we felt a retrospective hostility towards the Muslims for their one time domination on us, the

Hindus; secondly, on the plane of thought we were utterly indifferent to the Muslims as an element in contemporary society; thirdly, we had friendliness for the Muslims of our own economic and social status with whom we came into personal contact; and fourth, feeling was mixed concern and contempt for the Muslim peasants, whom we saw in the same light as we saw low-caste Hindu tenants, or, in other words, as our live-stock. Of these four modes of feeling—the first was very positive and well-organized intellectually; the rest were mere habits, not possessing very deep roots.

Nothing was more natural for us than to feel about Muslims in the way we did. Even before we could read we had been told that the Muslims had once ruled and oppressed us, that they had spread their religion in India with Koran in one hand and sword in the other, that the Muslim's rulers had abducted our women, destroyed our temples, polluted our sacred places. As we grew older we read about the wars of the Rajputs, the Marhattas and Sikhs against the Muslims, and of the intolerance and oppressions of Aurangzeb. In the 19th century Bengali Literature the Muslims were always referred to under the contemptuous epithet of "Yevana". The historical romances of Bankim Chandra Chatterjee and Ramesh Chandra Dutta glorified Hindu rebellion against Muslim rule and showed the Muslims in a correspondingly poor light. Chatterjee was positively and fiercely anti-Muslim. We were eager readers of these romances and we readily absorbed their spirit....The so-called two-nation theory was formulated long before Mr. Jinnah or the Muslim League : in truth, it was not a theory at all; it was a fact of history. Everybody knew this as early as the turn of the century. Even as children we knew it from before Swadeshi Movement."

ঢাকার দুটো উৎসবের মিছিল খুব নামকরা ছিল। একটি জন্মাষ্টমীর মিছিল ও অন্যটি মহরমের মিছিল। জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাতীর উপর হাওদায় উঠতেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ। রৌপ্য নির্মিত বড় বড় চৌকি ও অন্যান্য দেখবার জিনিস ছাড়াও নিশান হাতে লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিল দেখার জন্য মফস্বল হতেও বহু দর্শকের সমাগম হতো। নবাবপুর রোডের দালানের ছাদগুলো ভর্তি হয়ে যেত মেয়েদের ভীড়ে।

মহরমের মিছিলে থাকত সাজানো তাজিয়া, দুলদুল ঘোড়া আর নানা রঙ্গের হাজারো নিশান। "হায় হাসান", "হায় হুসেন" ধ্বনি আর তাজিয়ার উপর থাকত হাজার জালালী কবুতর। কিন্তু জন্মাষ্টমীর মিছিল যেমন হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সকলেরই কাছে প্রিয়

ছিল মহরমের মিছিল তেমনটি ছিল না। মহরমের অগ্রভাবে চলত লাঠি ঘোরানো, তলোয় খেলা আর পিছনে চলত জ্বলন্ত টর্চের মিছিল। যদিও সে যুগে ঢাকায় শিয়া মুসলমান একরকম ছিল না বললেই চলে তবু যথেষ্ট মুসলমানের সমাগম হতো ঢাকার ঐ মিছিল দেখার জন্য। মুসলমানেরা ঐ মিছিল বের করত শান-শওকতের সাথে যতটা, ততটা নয় ধর্মের টানে। আসল কারণ বোধহয় হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

হিন্দু পাড়ায় প্রতি বছরই নাটক হতো। খুব কম মুসলমান ছেলেরাই নাটকে অংশ নিত। মুসলিম হাই স্কুল হকি খেলায়, আমাদের স্কুল ক্রিকেট খেলায় ও অন্যান্য স্কুলগুলো ফুটবল খেলায় পারদর্শী ছিল। ঢাকার সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ানো ছিল বিশেষ প্রিয়। ঢাকার শেষ নবাব খাজা হবিবুল্লাহ বেশ পয়সা খরচ করে কয়েক নাটাই সুতা মেজে শতখানেক ঘুড়ি নিয়ে শ্রীপঞ্চমীর দিন ছাদে যেতেন—তার খাবারই কেবল ছাদে যেত না—তাকে চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হতো। এছাড়া পায়রার খেলার প্রতিও ঢাকার লোকের খুব আসক্তি ছিল।

# ছাত্রজীবন

১৯২২ সাল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন ধারা প্রচলন করেন সিনর মুসোলিনি—ফ্যাসিজম তারই সৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ দেশে সাম্যবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিবাদ সাম্যবাদী একনায়কত্বের পাল্টা জবাব। আমাদের দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পর খেলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়েছিল—বৃটিশের তুরস্কের প্রতি মনোভাবের ফলে। মওলানা মোহাম্মদ আলী ও গান্ধীজির মধ্যে একটা সমঝোতার ফলে ১৯২০ সালে খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়—অনেকেই মনে করেছিলেন এ আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে—তা সফল হয়নি। ১৯২২ সালে চৌরি-চৌরা থানায় কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা অগ্নি সংযোগ করে যার ফলে ২১ জন পুলিশ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে—আর গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করে দেন। স্বরাজ পাওয়া গেল না—খলিফা আব্দুল মজিদ নির্বাসিত হলেন অথচ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। জওহরলাল তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—"গান্ধীজি অনেক সময় অনেক কাজ করেন যা যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না—কারণ তার বিশ্বাস ছিল তার অন্তরের ডাক বা 'ইনটুইশনের' উপর।" তবে ভারতের মধ্যে গান্ধীজির গণ-আন্দোলনের প্রথম পরীক্ষা হিসেবে এ আন্দোলন সফল হয়েছিল বলে আমার ধারণা। ভারতের জনগণ আন্দোলনে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হয় বা হতে পারে সে সম্বন্ধে তার মোটামুটি জ্ঞান লাভ হল। মহাযুদ্ধের পর বৃটিশের রাজনৈতিক দাবা খেলায় তুরস্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কামাল আতাতুর্ক "অসুস্থ" তুরস্ককে সুস্থ করে তোলার জন্য তুরস্ককে আধুনিকীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার মনস্থ করেন—তবে ধর্মযাজক হিসেবে হয়ত খেলাফতকে সহ্য করতেন কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের দু'জন নেতা মহামান্য আগা খান ও সৈয়দ আমির আলী, আতাতুর্ককে খেলাফতের পূর্ণ মর্যাদা দেবার অনুরোধ জানাবার ফলে খলিফা তুরস্ক থেকে বহিষ্কৃত হলেন—কামাল পাশা ধরে নিয়েছিলেন যে তারা বৃটিশ সরকারের স্বার্থেই ঐ আবেদনটি পাঠিয়েছিলেন।

ঐ বছরই আমার ছাত্রজীবন শুরু। আমার ভর্তির দিনই ছোট একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমি "ফরমে" ননাম লিখলাম KAMRUDDIN। হেডমাস্টার কলিন্স মৌলভী সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার নামের বানান আরবী মতে ঠিক হয়েছে কিনা। কারণ এ দেশে এসে কলিন্স সাহেব প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে মুসলমান ছেলেদের নাম আরবীতে রাখা হয় এবং নামের একটা বিশেষ অর্থ থাকে। তার বোধহয় আরো ধারণা ছিল যে আরবীর শিক্ষক সঠিক ইংরেজী বানান বলতে পারবেন। মৌলভী সাহেব ফরমটার দিকে তাকিয়েই গম্ভীরভাবে বললেন যে বানান ভুল হয়েছে। নাম

লিখতে হবে "Quamruddin" হেডমাস্টার সাহেব আমাকে আরেকটা ফরম দিলেন শুধু নামটা লেখার জন্যে। আমি অস্বীকার করলাম। আমার যুক্তি ছিল "ক" যখন পুরুষের নামের আদ্যক্ষর হয় তখন "K" দিয়ে লিখতে হবে—আর মেয়েদের সময় "Q" দিয়ে লিখতে হবে। যেহেতু ইংরেজীতে রাজার বেলা "King" আর "Queen" রাণীর বেলা। ইংরেজী উচ্চারণে "K" আর "Q" এর মধ্যে প্রভেদ নেই। আরবী "বড় কাফ"-এর সঙ্গে "Q" এর চেহারার মিল আছে বলেই "Q" কে "বড় কাফ"-এর মত উচ্চারণ করলে ভুল হবে। মৌলভী সাহবের চেহারা লাল হয়ে গেল—ভাবল আমি একটা "বেয়াদব"। প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রী মিসেস ওয়েস্ট যিনি স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা পড়াতেন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকায় আমার যুক্তির বোধহয় একটা মূল্য দেয়া হল। স্মিত হেসে আমার সঙ্গে একমত হলেন। কলিন্স সাহেবও আমাকে বললেন, "You write your name with "K" if you so like". গত অর্ধ শতাব্দী ধরে আমি আমার নাম "K" দিয়ে লিখে যাচ্ছি কিন্তু মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেটা ক্রমাগত শুদ্ধ করে "Q" দিয়ে লিখে যাচ্ছেন। তবে আমার ঐ "K" দিয়ে নাম লেখাটাকে আমার প্রথম প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে আমি মনে করেছি এমনকি জনাব আবুল হাসিম সাহেব তার আত্মজীবনীতে দু'স্থানে "Q" দিয়ে এবং পরবর্তী সাত জায়গায় "K" দিয়ে আমার নাম লিখেছেন।

বিমল বলে একটা ছেলে প্রথম দিনই ক্লাসের মনিটর নির্বাচিত হয়। ছেলেটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি চট্‌পটে ও বুদ্ধিমান। লেখা-পড়ায়ও সে ছিল খুব ভাল। আমাদের ক্লাসে একুশ জন ছাত্র ছিল। প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ওয়েস্টের লেখা New Method Reader আমাদের ইংরেজী পাঠ্য ছিল। তৃতীয় শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদেশী ছেলেদের পড়ার উপযোগী করে সিরিজটি লেখা হয়েছিল। নীচের ক্লাসে প্রত্যেকটি "লেসন" গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম শোনান হতো—তারপর আমাদের পড়তে বলা হতো। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের চেয়ে আমরা হেডমাস্টার কলিন্স সাহেবকে বেশি ভয় করতাম—কারণ বোধহয় তিনি যখন টহল দিয়ে বেড়াতেন তখন তাঁর হাতে থাকত একখানা ছোট বেত। প্রিন্সিপ্যাল ও হেডমাস্টার দু'জনের বাসা ছিল রমনায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। কলিন্স সাহেব স্কুলে আসতেন বাইসাইকেলে আর ডক্টর ওয়েস্ট ও মিসেস ওয়েস্ট আসতেন "সাইডকার" লাগানো মটর সাইকেলে। তখনকার দিনে প্রাইভেট মটরগাড়ী বড় একটা ছিল না। পথে কোন ছোট ছেলেকে একাকী স্কুলে যেতে দেখলে তাকে মিসেস ওয়েস্ট গাড়ীতে তুলে নিতেন। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় অনেকদিন তাঁদের গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। মিসেস ওয়েস্ট কেবল আমাদের "হাইজিন"ই পড়াতেন না—আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি কি না তার প্রতিও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। কোটের তামার বোতামগুলো ঘষা হয়েছে কি না—বুট জুতোয় কালি-ব্রাস করা হয়েছে কি না—এসবও তাঁর দৃষ্টি এড়াত না।

আমাদের ড্রইং মাস্টার ছিলেন শরৎ বাবু। আমি একদিন ভুলে ড্রইং খাতা স্কুলে নিয়ে যাইনি। শরৎ বাবুর ধারণা হয়েছিল বোধহয় আমি ফাঁকি দিয়েছি। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তাঁর চাবীর গুচ্ছের মধ্যের কর্কস্ক্রুটি আমার হাতের তালুর উপর রেখে এমনি ভাব

দেখালেন যেন আমার হাতে ওটা ঢুকিয়ে দেবেন। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলাম আমার শরৎ বাবুরও দুর্ভাগ্য যে ঠিক সে সময় প্রিন্সিপ্যাল ও মিসেস ওয়েস্টের গাড়ি এসে স্কুলের সিঁড়িতে থামল। মিসেস ওয়েস্ট আমার চীৎকার শুনতে পেয়ে ক্লাশ থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন দোতলায়। আমাকে দিলেন লজেন্স। কান্না থেমে গেল। এর ফলে কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছিল—কারণ শরৎ বাবু এরপর আমার সঙ্গে অনেকদিন কথা বলেননি। পরবর্তীকালেও আমি ড্রইং খাতা নিয়েছি কি নেইনি আমার ড্রইং দেখতে চাননি। ফলে যা হবার তাই হলো—আমি অংকন বিদ্যায় অজ্ঞ থেকে গেলাম।

আমাদের স্কুলে খুব ধুমধাম করে সরস্বতী পূজা হতো। ড্রইং টিচার ও ড্রিল মাস্টার সাজানো, গোছানো, শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব নিতেন। আমাদের স্কুলে ফাতেহা দোয়াজদহমে মিলাদ হতো—তবে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এত কম ছিল যে মৌলভী সাহেবের সকল তাল্‌বে আলেম নিমন্ত্রণ করে এনেও একটা ঘর ভর্তি করা যেত না। মিলাদ পড়াবার জন্য আমরা খাজা নাজিমুদ্দীনের ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীনকেই ডাকতাম। তিনি তখন রাজনীতি করতেন না। তিনি ছিলেন মৌলভী সাহেব। দেহ ছিল তার অত্যন্ত ক্ষীণ—চিবুকের উপর অল্প দাঁড়ি ছিল। লেছ লাগানো চাপা পাজামা ও গিলা করা লম্বা কুর্তা পরিধান করতেন। তার গলার স্বর সুমিষ্ট ছিল। কেতাব ও ছাতা তাল্‌বে আলেমদের হাতে থাকত। অন্য কোন মৌলভী সাহেব আমাদের স্কুলে মিলাদ পড়ালে তাকে দেয়া হতো পাঁচ টাকা, কিন্তু খাজা সাহেব আসলে কলিন্স সাহেব তাকে দশ টাকা দিতে বলতেন। কারণ বোধহয় কলিন্স সাহেব অন্যান্য বৃটিশ রাজকর্মীচারীদের মত আহসান মঞ্জিলের লোকদের উপর অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আমরা ছোটবেলা থেকেই ইংরেজী শেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্কুলের শিক্ষক ও বাড়ির অভিভাবক দু'দিক থেকেই আদেশ ছিল স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান পড়ার জন্য। আমরা পড়ার চেষ্টা করতাম—তবে বেশির ভাগই আমাদের বোধগম্য হতো না। মুসলমান ছেলেরা তখনকার দিনে, অন্তত ঢাকা শহরে—বাংলাকে মাতৃভাষা বলে ভাবতে শিখেনি। খাজা পরিবারের লোকেরা উর্দু বলত, ঢাকার রইছ কুট্টি ও শাঁখারীরা উর্দু ও বাংলার একটা খিচুড়ী বানিয়ে সেটাকেই মাতৃভাষা বলে চালিয়ে দিয়েছিল। ঢাকার বুর্জোয়াঁ হিন্দুরা বাঙ্গালদেশীয় বাংলা বলত আর আধা-সামন্তবাদী বুর্জোয়াঁ মুসলমান সম্প্রদায় খাজা সাহেবদের সঙ্গে মেশার জন্য এবং চাকর-বাকর শাসাবার জন্য আর বিশেষ করে তারা যে বাংলার বাইরের মুসলমান তা প্রমাণ করার জন্য উর্দু ভাষার চর্চা করত। দেশের নেতারা যেখানে উর্দুভাষী—অনুগামীরা অন্য ভাষাকে স্বাভাবিক কারণেই তেমন আপন ভাষা বলে ভাবতে পারেনি। আমাদের অবস্থা ছিল মাতৃভাষাহীন একটি জাত যারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলে মিথ্যা বাদী করতে চাইত আর বাংলাকে বিমাতা মনে করে দূরে ঠেলে রেখেছিল।

আমাদের স্কুলের ছেলেদের চারটা "হাউজের" কোন একটা "হাউজের" সদস্য হতে হতো। প্রত্যেক হাউজের একজন "প্রিফেক্ট" থাকত। "প্রিফেক্ট"রা আমাদের

নিয়মানুবর্তিতার জন্য দায়ী থাকতেন। আমি ছিলাম কলিন্স হাউজে, ওয়েষ্ট হাউজে বিমল ও বিস হাউজের মাধবের সঙ্গে ছিল আমার প্রতিযোগিতা। তবে খেলার মাঠে নয়—ক্লাসের প্লেস্ নিয়ে। আমাদের স্কুলের উপর ডি. পি. আই.-এর কোন হাত ছিল না। প্রিন্সিপ্যালের উপরই আমাদের স্কুলের নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল। বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বের হতো ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। হেডমাস্টার সাহেব "মেরিট" অনুযায়ী নাম ডেকে যেতেন—আর আমরা একে একে উপরের ক্লাসে গিয়ে বসতাম। "সিট" নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হতো না।

একবার কিন্তু এক মজার কাণ্ড হল। আমাদের স্কুলের নিয়ম ছিল যে সকল বিষয়ে পাশ না করলে তার প্রমোশন হতো না। দু'বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে স্কুল ছাড়তে হতো। কিন্তু সেবার যখন পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হলো তখন দেখা গেল যে একটি ছেলে দু'বিষয়ে ফেল করেও "প্রমোশন" পেয়ে গেল। ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কলিন্স সাহেব আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে লাইনে দাঁড়াতে বললেন এবং ছোট্ট একটা বক্তৃতা করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে ঐ ছেলে যেহেতু নবাব বাড়ির সেহেতু তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর বললেন যে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ঐ ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বংশের জোরে আর আমাদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করবে আমাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর। সুতরাং ঐ ব্যাপার নিয়ে যেন আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সমালোচনা না করি। তাঁর ঐ ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল কারণ আমি ক্লাসে ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রায় চার বছর পূর্বে তিনি কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হয়েছিলেন। যদিও জীবনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কোনদিন উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় স্কুলের মাঠে খবর গেল যে করোটিয়ার জমিদার চাঁন মিঞা সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়েছে। আমরা দল বেঁধে তাকে দেখতে গেলাম—আর যে গরুর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে তিনি সকলের অভিবাদন নিচ্ছিলেন সে গাড়ির খুব নিকটে চলে গেলাম। সিপাহীরা আমাদের তাড়া করলেন। সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও শ্লোগান দিয়েছিলাম গান্ধীজি কি জয়, মৌলানা মোহাম্মদ আলী কি জয়, চাঁন মিঞা সাহেব কি জয়, ইত্যাদি। ঐ সনেই গান্ধীজি ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় ঢাকা এসেছিলেন। একটা হাতীর পিঠে চড়ে শহরের বড় বড় রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। বৃহৎ বপুবিশিষ্ট আলী ভাইদের সঙ্গে গান্ধীজিকে চোখেই পড়ছিল না আমাদের। আমি বাড়ি থেকে লুকিয়ে গিয়েছিলাম দেখতে কারণ আমার পিতা ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের প্রতি বিরূপ। যদিও আমার মা ভিন্নমত পোষণ করতেন।

নীরোদ চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

"I, on the contrary, though a mere boy remained consistently anti-Turk, and the reason was not only the anti-Muslim sentiments contracted from 'swadeshi movement' but also a rationalization of that anti-pathey through an interpretation of Pan-Islamism as the greatest danger facing Indian Nationalism. I had imbibed this dis-

trust of Pan-Islamism in the first instance from uncle Anukul, but its ultimate source was an eminent nationalist thinker, Bepin Chandra Pal, who was always warning us of this danger."

কংগ্রেস কর্তৃক মধ্যপথে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে যেসব বিপ্লবীরা আন্দোলনের ফল দেখার জন্য চুপ করে বসেছিল—তারা আবার বেরিয়ে এল। আরম্ভেই অর্থের প্রয়োজন, তাই বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষ অপর তিনজন সাথীসহ ১৯২৩ সনে কলকাতার শাঁখারীটোলার পোষ্টমাস্টারকে হত্যা করে, কিন্তু পালাতে পারে না। শাস্তি হয়—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৯২৪ সালে আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি হয় ফলে ধান ও অন্যান্য শস্য নষ্ট হয়ে যায়। কার্তিক মাস আসার আগেই খাল, বিল, পুকুর সব শুকিয়ে যেতে লাগল। আমাদের ভিতর বাড়ির পুকুর ছাড়া বাকি নিকটে কোথাও পান করার মত পানি ছিল না। আমি তখন ছুটিতে দেশের বাড়িতে। প্রজারা অনুনয় বিনয় করে বললে তাদের এক কলসী করে পানি ঐ পুকুর থেকে নেবার আদেশ দিতে। আমি কোনকিছু না ভেবে বলে দিলাম যে তাদের মেয়ে-ছেলেরা পুকুরের পুবপাড়ের আমবাগানের ভেতর দিয়ে পানি নিয়ে যেতে পারে। আমার মাথায় একবারও আসেনি যে "ছোট লোকেরা" আমাদের ভেতর বাড়ির পুকুরে আসতে পারে না। আমার এক দূর সম্পর্কের দাদু খবর পেয়ে যারা পানি নিচ্ছিল তাদের ধরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কার হুকুমে তারা ভেতর বাড়ির পুকুরে এসেছে। আমি বললাম, "আমি বলেছি"। দাদু আমার বেয়াদবী সহ্য করতে পারলেন না—আমার গালে চপেটাঘাত করলেন। রাগে অপমানে আমিও দিশেহারা হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আবার বললাম, "তোমরা পানি নিয়ে যাও পুকুর আমাদেরও।" হয়ত একটা অঘটন ঘটে যেত যদিনা মা ও দাদী আম্মা তখন গোলমাল শুনে সেখানে চলে না আসতেন। তারা আসতেই দাদু ভেতর বাড়ি চলে গেলেন—কিন্তু সবাই পানি না নেওয়া পর্যন্ত আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি আজো বুঝতে পারিনি প্রজারা পুকুরের পানি নিলে মনিবের অপমান হবার কি কারণ থাকতে পারে। ছোটবেলা দেখেছি লেখাপড়া জানা প্রজাও জুতা পায় দিয়ে আমাদের বাড়ি আসতে পারত না। তাদের বউ-ঝিরা পাল্কিতে উঠতে পারত না। বংশগত গোলাম বাঁদীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। আমরা অবশ্যই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল অত্যাচার ও অবিচারের অবসান হয়েছিল। বহুদিন পরে আমি যখন কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনার তখন ডাক্তার মেঘনাদ সাহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে তিনি কেন হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন—রাজনৈতিক কারণ আলোচনার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দেশের জমিদার বলিয়াদীর খান বাহাদুর কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের নিকট গ্রামে একটা স্কুল করার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে গেলে যেভাবে অপমান করেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দুর প্রতি মুসলমানদের একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল—যা তিনি কোন কালে ভুলতে পারেননি। আমি তাকে বললাম, "একজনের একটা বিশেষ কার্যের জন্য রাজনৈতিক পন্থা কি ঠিক করা উচিত?" আরো বললাম যে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন একবার তার স্কুলের চাঁদার জন্য বলিয়াদী গিয়েছিলেন এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে মাসিক সওগাতে "বলি গর্তে তিন দিন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জমিদারদের

ব্যবহার তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমান বলে প্রভেদ ছিল না—রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন নিজে পায়রাবন্দের জমিদারের কন্যা হয়েও সে ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন।

১৯২৪ সনে হক সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরই শ্রী কেদারাম পোদ্দার তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। দেউলিয়া ঘোষণা করার পূর্বেই তার মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে হক সাহেব হলেন মুসলমান জনগণের নেতা। হিন্দু ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা ভিক্ষায় বেরুলেন, গ্রামের সাধারণ কৃষক তাকে জানল। এ ঘটনার পরে দেশবন্ধু আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯২৫ সনে তিনি পরলোক গমন করেন। আমরা বহু পরে জানতে পারি যে তিনিই হক সাহেবকে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১৯২৬ সনে ঢাকায় একদল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী একটি সাহিত্য সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল হুসেন, এম. এ, এম. এল., বাংলার অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদ প্রভৃতি বরেণ্য সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কগণ। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ যাতে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে পারে বা কথা বলতে পারে তাই চেয়েছিলেন। এটাকে বলা হলো বুদ্ধি মুক্তির আন্দোলন (Movement for freedom of Intellect)। নবাব সাহেবের নিকট এর বিরুদ্ধে নালিশ হয়েছিল এই বলে যে আন্দোলনকারীরা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে—কারণ খোদা-রসুলের বাণীকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার মতবাদ প্রচার করছে তারা। আন্দোলনের নেতাদের আহ্সান মঞ্জিলে ডাক পড়ল এবং অপমানিত করা হল। ইহার কিছুদিন পর কাজী আবদুল ওয়াদুদ সাহেবের শিষ্য ও জামাতা শামসুল হুদা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে লাঞ্ছিত হল।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ত্রিশ দশকে আমি আবুল হুসেন সাহেবের সান্নিধ্যে আসি এবং নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে মুক্ত-বুদ্ধি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হই। ১৯৩৭ সনে এম. এন. রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পূর্বে আমি আবুল হুসেন সাহেবের আদর্শেও অনুপ্রাণিত হই।

১৯২৫ সনে কলকাতায় মহরমের মিছিলের উপর গুণ্ডা শ্রেণীর আক্রমণের ফলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ১৯২৬ সনে ঢাকায়ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে কি কারণে তা আমার মনে নেই। তবে এটা মনে আছে যে মুসলমানদের এ দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল হাফিজ—খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের আপন খালাত ভাই। পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। দাঙ্গার যে বিশেষ দিকটা আমার নজরে পড়েছিল সেটা মুসলমানদের লুট করার প্রবণতা আর হিন্দুদের মানুষ হত্যা করার প্রবণতা।

নীরোদ চৌধুরী তার আত্ম জীবনীতে বলেছেন,—

"Those who lived through historical events as I have, begin to see that history is neither written nor made without love or hate."

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কে ছড়িয়েছিল সেটা বড় কথা নয়—বড়

কথা হচ্ছে কেন ছড়িছেয়ে। কেউ বলবেন এটা বৃটিশের "ডিভাইড ও রুল"-এর ফল—কেউ বলবেন গজচক্র মন্ত্রিসভার সময়ে তাদের মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য এর প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বাদশাহ ফারুক শিয়ারের সময় কেন দোল পূজায় রং ছিটিয়ে দেয়া উপলক্ষ্য করে আহমদাবাদ ও কানপুরে অনেকদিন দাঙ্গা চলেছিল ? আমার মনে হয় একদিকে রিক্ত ও সর্বহারাদের আক্রোশ এবং অন্যদিকে ঐশ্বর্যশালীর দরিদ্রের প্রতি ঘৃণা—অর্থাৎ আর্থিক কারণই এ সংগ্রামের সৃষ্টি। খেলাফত আন্দোলন বিফল হবার পর থেকে দুটো সম্প্রদায় দু'দিকে চলতে থাকে এবং তাদের মধ্যে সংযোগ ক্রমাগতই কমতে থাকে। তাই দুই সমাজের উপরের স্তরে প্রথম এটা আরম্ভ হয়—কারণ হয়ত মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা। সমাজের নীচের স্তরে এ বিষ ছড়িয়েছে অনেক পরে।

নীরোদ চৌধুরী তার আত্ম-জীবনীতে আরও লিখেছেন,—

"I do not know of one great Bengali writer, religious reformer, or political leader after Ram Mohan Roy who had any first hand knowledge of Islam as a whole or any of its aspects. After the end of Muslim rule Hindu society had broken completely with Islam. Strange as it seems, perhaps we know about Hellenic civilization more than we did about Islamic.

As true conservatism, true to the established traditions of conservatism, both Bankim Chatterjee and Vivekananda regarded religion, the keystone of human activity and achievement, and both uncompromisingly rejected the idea of purely secular culture. They were against Brahmo-Samaj. These two schools wrestled for the soul of modern India, and there was hardly a modern Indian with any capacity for thinking who did not experience this struggle within himself. Even Tagore, a Hindu liberal if ever there was any Hindu liberal, fell drawn towards the new Hinduism revived by Bankim and Vivekananda and his novel "Gora" is an exposition of this theme. By the time nationalist agitation over the partition of Bengal had reached its climax (1907). Hindu conservatism may be said to have definitely won the battle. Politics made a powerful contribution to this victory.

When in later life I read Sir Valentire Chiral's "Indian Unrest"—we had been taught to hate him and his book equally well—and compared what he had written with my own recollections, I found that he had been wholly correct in his estimate of the 'Swadeshi Movement' of Hindu revival. It was not liberal political thought of the organizers of the Indian National congress, but the Hindu revivalism of the last quarter of the 19th century—a movement which previously had been almost wholly Confined to the field of

religion—which was the driving force behind the anti-partition agitation of 1905 and subsequent years.

Between Ram Mohan Roy and Vivekananda who said : "The Mohammadan conquest of India came as a salvation to the down-trodden, to the poor. This is why one-fifth of our people have become Mohammadans. It is not the sword that did it all, it would be the height of madness to think that it was all the work of sword or fire, stands Bankim Chandra, the creator of Hindu Nationalism. Bankim's popularity was for the same reason as it was for Gandhi.

The Swadeshi Movement of 1905 was mainly an assertion of the nationalism of the new Hindu school but it also contributed materially to revivification of the fossilized nationalism. Therefore with the Swadeshi Movement also began a fantastic glorification of the Mutiny, which finally created the legend that it was the precursor of the nationalist movement of the century and the first war of independence."

নেহেরু তার "The Discovery of India" তে বলেছেন,—

"The reaction was essentially a nationalist one, with the strength as well as the narrowness of nationalism. That mixture of religion and philosophy, history and tradition, customs and social structure, which in its wide fold included almost every part of life of India, and which might be called Brahmanism or (to use later word) Hinduism became the symbol of nationalism."

নীরোদ বাবুর সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না অনেক স্থানে তার কারণ বোধহয় আমরা মুসলমান যুব সম্প্রদায় তাদের মনের কথা জানতে পারিনি বহুদিন ধরে। যেমন এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হবার পরেও আমি যখন কলকাতা গিয়েছি এবং আমাদের দেশের অর্থাৎ বিক্রমপুরের যে-কোন হিন্দু বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি—সেসব বাড়িতে কোন ভিন্ন মনোভাব দেখিনি। একবার স্যার জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে—সেখানেও সেই আগের মতই লেডী অবলা বোসের হাতে গরম লুচি ও নিরামিষ না খেয়ে আসতে পারিনি।

১৯২৬ সনে পারিবারিক কারণে আমার বরিশাল শহরে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হয়। বরিশাল তখন ছিল ছোট্ট শহর। কিন্তু তখনকার দিনের ঢাকার তুলনায় অনেক সুন্দর। গাড়ি-ঘোড়া কম, নদীর পাড়ে বেড়াবার রাস্তা ঢাকা বাক্‌ল্যাণ্ড বান্ডের চেয়ে অনেক সুন্দর। রাস্তার দু'দিকে ছিল সবুজ ঘাস আর এক সারিতে বড় বড় ঝাউ গাছ—বাতাস যখন বইত ঝাউ গাছের শব্দে একটা ছন্দের সৃষ্টি হতো। এ জন্যেই বোধহয় কবি নজরুল ইসলাম বলতেন. "বরিশাল বাংলার ভেনিস।" ঢাকার তুলনায় অনেক বড় স্টীমার ঘাট সে যুগে চার পাঁচটা জেটি—কত জাহাজ, কত বার্জ, কত লঞ্চ। জাহাজ

ঘাটের রাস্তাগুলো পাথুরে কয়লায় ঢাকা—আর সেখানে কত যে মানুষ মেহনতী কুলি ও তাদের সরদারদের চেঁচামেচি, মাল উঠানামার কাজ, যাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি, ডকের শ্রমিকদের সিটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে বাইরে আসা আর ভেতরে প্রবেশ—সব মিলিয়ে একটা অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করত। আই. জি. এন. আর. এস. এন. কোম্পানীর বড় বড় সাহেবদের বড় বড় বাংলো বাড়ি তারই মধ্যে নানা ঋতুতে নানা ফুলের বাহার, তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের পেরামবুলেটরে নিয়ে আয়ারা হাঁটছে—গল্প করছে। তারপরে বেল পার্ক—ফুটবল খেলার মাঠ—শীতের দিনে সাহেব, মেম-সাহেবরা গল্‌ফ্ খেলায় পরিশ্রান্ত। বেল পার্কের পেছনেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, পুলিশ সুপার প্রভৃতি উচ্চ পদের সরকারী কর্মচারীদের কোয়ার্টার। তাদের বাড়িগুলোর সন্নিকটেই ইউরোপিয়ান ক্লাব। অবশ্যই এ ক্লাবে বাঙ্গালী ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকেরাও মেম্বার হতে পারতেন। যেমন ছিলেন বি. আর. সেন, নুরুন্নবী চৌধুরী প্রভৃতি। শহরের মাঝখানে মস্তবড় একটা পুকুর ছিল লোকে বলত 'বিবির পুকুর'। আমি যে বছর বরিশাল স্কুলে ভর্তি হই তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ই. এন. ব্লান্ডি (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের চীফ্ সেক্রেটারী), জেলা জজ ছিলেন ইউনী সাহেব, তিনি কানে খাটো ছিলেন—তার সময় নাকি সবচেয়ে বেশি লোকের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পুলিশ সুপার ছিলেন "টেইলর" (পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হয়েছিলেন)। আমি যখন বরিশাল ছাড়ি তখন "জে. টি. ডেনেভান" জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টি. এস. ইলিস সাহেব জেরা জজ (পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের চীফ জাস্‌টিস), পুলিশ সুপার হয়েছিলেন ফেয়ার ওয়েদার ও এ্যাসিস্ট্রেন্ট পুলিশ সুপার ছিলেন "শামসুদ্দোহা" সাহেব (পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী)।

জাহাজ কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন হলিনবেরী। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে আমাদের স্কুলের বার্ষিক খেলাধুলার ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষক আমাকে বললেন, "অবস্টাক্‌ল রেস" এর জন্য ডজন খানেক পিপার প্রয়োজন, স্টীমার ঘাটে অনেকগুলো পড়ে আছে। প্রধান শিক্ষকের বোধহয় ধারণা ছিল আমি যেহেতু ভাল ইংরেজী বলি সুতরাং আমাকেই পাঠানো উচিত। আমিও ঢাকায় স্কুলে সাহেবদের কাছে পড়ে এসেছি তাই নিজেকে অতিমাত্রায়ই "স্মার্ট" মনে করতাম। হলিনবেরীর সঙ্গে দেখা করে বললাম, "Could you spare some empty 'Pippas' for our sports function." পিপা অর্থ তিনি বুঝলেন না—অনেক কষ্টে তাকে বোঝাবার ফলে তিনি বললেন, "Oh you like to have some empty barrels." আমি খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু তা স্কুলের কারো কাছে ফাঁস করে দেইনি। নদীর পাড়ে দেখা হলেই কথা বলতেন—দু'একবার সে পীপার কথা বলে লজ্জাও দিয়েছেন। বেল পার্কের নদীর দিকে এক কোণে থাকতেন লুৎফে আলী (ব্যারিস্টার), তাহার স্ত্রী উইলফ্রেড আলী, দুই কন্যা মিমি ও বেবী এবং দুই পুত্র ফজলে আলী ও আমির আলী। বাংলোটি ছিল তাদের সুন্দর ছনের আটচালা ঘর—সেগুনের মেজ, ভেতরে চারটি কোঠা। অন্য কোণে একতলা বাড়িতে থাকতেন খানবাহাদুর আবদুল বাসিত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমি প্রথমে ছিলাম বেল

ইসলামিয়া হোস্টেলে পরে ঐ বাড়িতে। লুৎফে আলীর ছেলে-মেয়েরা ছিল আমাদের বন্ধু। বাসেত সাহেবের তিন ছেলে ও আমি আর ওরা চারজন প্রায় একই সাথে খেলাধুলা করতাম কারণ, ওখান থেকে খাস শহর অনেকটা দূরে, মিমি ছিল আমাদের সমবয়সী—ওকে বিয়ে করার জন্যে অনেক উমেদার জুটে ছিল তাদের মধ্যে দোহা সাহেবের প্রতি মিমির ও তার পিতা-মাতারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—কিন্তু আমি মিমিকে গোপনে বলে দিয়েছিলাম যে দোহা সাহেব বিবাহিত। ফলে তাদের মধ্যে সকল সম্পর্কচ্ছেদ হয়। মিমি ছিল অপূর্ব সুন্দরী—গাঢ় নীল চোখ, কালো চুল, স্বাস্থ্যবতী শ্বেতাঙ্গীনি।

বরিশাল মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা তখন খান বাহাদুর হেমায়েৎ উদ্দীন আহমদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল। আবদুল বাসেত সাহেবের ডেপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তেমন সুনাম ছিল না—তবে লোকে তাকে পীর, কারী ও মহাদ্দেছ বলেই জানত। বরিশালে তখন যারা ডেপ্‌টি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তাদের মধ্যে আমার মনে পড়ে সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হুসেন চৌধুরী (পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের মন্ত্রী), হামিদুর রহমান সাহেব, এরা তিনজনই নামাজী ও পরহেজগার ছিলেন। তখন কলোনাইজেশন অফিসার ছিলেন আবদুল মজিদ সাহেব—তিনি সাহেবদের মত সুট, টাই পরতেন—তার পুত্র আখ্‌তারুজ্জামান পরবর্তীকালে আই. সি. এস. হয়েছিলেন এবং হুমায়ুন কবির সাহেবের (পরবর্তীকালে ভারত সরকারের মন্ত্রী) বোনকে বিবাহ করেছিলেন। পাকিস্তান হবার সময় তিনি ভারতে "অপসন" দিয়েছিলেন। জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন সাহেবের পুত্র জালাল উদ্দীন হুসেন সেকেন্দার (পরে জেলা জজ হয়েছিলেন) আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়তেন। তিনি স্কুলে লুঙ্গীর উপর পায়জামা আচকান পরে আসতেন এবং জোহরের নামাজের সময় আচকান পায়জামা খুলে অজু করে নামাজ আদায় করতেন। এই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিস্তর ঠাট্টা মশকরা চলত। হেড্ মাস্টার দ্বিজেন বাবু এটা জানতে পেরে তিনি সেকেন্দার সাহেবের জন্য একটি কোঠায় নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খান বাহাদুর আবদুল বাসেত সাহেবের বাসায় প্রতি বৃহস্পতিবার খতম ও জিকির হতো। তার অনেক মুরিদান ছিল তার মধ্যে বেশির ভাগই তাকে ঠকাবার জন্য মুরিদ হয়েছিল।

আমার আজ যার কথা বেশি মনে পড়ছে তিনি হচ্ছেন শায়েস্তাবাদের নবাবজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হুসেন সাহেব। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তিনি যখনই বিকেলে সান্ধ্য ভ্রমণে (Evening walk) বেরুতেন তখন তার পরনে থাকত খাকী হাফ্-প্যান্ট, সাদা হাফ্-সার্ট, মাথায় সোলার হ্যাট, হাতে বেড়াবার লাঠি, সঙ্গে একটি বিলেতি কুকুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তার ছিল না—কিন্তু সে যুগে এমন কোন ইংরেজী সাহিত্যের বই ছিল না যা তিনি পড়েননি, অবশ্যই ওল্ড-ইংলিশ থেকে চসার-ল্যাংল্যান্ড পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের যুগটাকে বাদ দিয়ে। প্রত্যেক বইয়েরই নানা ধরনের সংস্করণ তার পাঠাগারে (Library) পাওয়া যেত—বিশেষ করে মরক্কো লেদারের "কভার" পাতলা (thin) ইংরেজী কাগজের সংস্করণ তিনি বেশি পছন্দ করতেন। বিকেল বেলা নদীর তীরে বেড়ানো ছাড়া প্রায় সমস্ত দিনই বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। ডিকেন্স ও

থেকারের অনেক সুন্দর মরক্কো বাইন্ডিং বই তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—সঙ্গে কেমব্রিজ হিস্টরী অব ইংলিস লিটারেচার। শেক্সপিয়ারের পকেট এডিশন আজো অনেকগুলি আমার কাছে আছে। রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে যাবার সময় যার নিকট ছোট লাইব্রেরীর বইগুলি দিয়ে গিয়েছিলাম তার অযত্নে সেই বইগুলি সবই উইপোকা দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। তা'ছাড়া আমাদের সমাজের একটা প্রচলন আছে যে, বই ধার নিলে কেউ ফিরিয়ে দেবার নাম করে না।

নবাবজাদা সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি ছিল—আমার জানামতে একটা ঘটনা যা তার মুখ থেকেই শোনা, তা উল্লেখ না করে পারছি না। বিলেতের নামকরা সব পাবলিশারের কাছে তার চিঠি দেয়া ছিল যে ইংরেজী সাহিত্যের যে কোন নতুন বই প্রকাশিত হওয়া মাত্র তাকে এক কপি "সারফেস মেইল"এ পাঠাতে হবে। একদিন হঠাৎ ষ্টেটসম্যানের পুস্তক সমালোচনায় একটি পুস্তকের সমালোচনা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তার নিকট সে বই এসে পৌঁছেনি। তিনি পরের দিন কলকাতা গিয়ে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে বইটির খোঁজ করেন—কিন্তু বইটা সেখানেও পৌঁছেনি। তারা তাকে বললেন যে শায়েস্তাবাদের নবাবজাদার ওখানে যেন তিনি খোঁজ নেন। নবাবজাদা খুব সহজভাবে বললেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বইটি আমার লাইব্রেরীতেও এসে পৌঁছেনি।" লাইব্রেরীর কর্মচারীরা একেবারে থ' বনে গেলেন। নবাবজাদার নাম ও খ্যাতি যদিও তারা শুনেছে কিন্তু চাক্ষুস তাকে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি—তারা তাকে ঘরে এসে বসতে বললেন—কিন্তু তার যেন সময় নেই—বললেন, "দেখি, ষ্টেটসম্যান অফিসে তাদের কাছে কপিটা আছে কিনা"—এই বলে ট্যাক্সিতে উঠে চলে এলেন ষ্টেটসম্যান অফিসে। সেখানে সম্পাদক সাহেব তার খবর পেয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং জানালেন যে "রিভিউ" তাদের কাছে লণ্ডন থেকে এসেছিল—বই তাদের কাছে নেই। বরিশাল ফিরে এলেন—তার কিছুদিন পরে পাবলিশারের কাছ থেকে বইটা পেলেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজের মধ্যে তিনিই ছিলেন সত্যিকার সাহিত্যানুরাগী। আমি যখন তাকে দেখেছিলাম—তখন তার চোখে ছিল পুরু চশমা। অথচ এই লোকই আবার নদীর তীরে বিকেলে বেড়াবার সময় মগরেবের নামাজের সময় বিনা অজুতে ঐ হাফপ্যান্টে সোলার হ্যাটটি শুধু সম্মুখে রেখে বিনা টুপিতে নামাজ আদায় করতেন। এ জন্য কোন মৌলভী মোল্লাকে তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে শুনিনি—কারণ তাকে দেখলেই যেন মনে হতো তিনি সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। নবাবজাদা সাহেবের নিজের সংসার ছিল না, তাই তার ভাই সৈয়দ নেহাল হুসেনকে বিয়ে দিয়ে সংসার সৃষ্টি করলেন—আমার যতদূর মনে পড়ে নেহাল হুসেন তখন আইন পড়ছিল—তার স্ত্রী হয়ে এলেন সুন্দরী, শিক্ষিতা সুফিয়া বেগম—যিনি প্রথম জীবনে কেবল লাজুক বধূ, পরে সুফিয়া নেহাল হুসেন হলেন কবি। নেহাল হুসেন অত্যন্ত অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন—যতদূর মনে পড়ে তাকে যক্ষ্মা রোগে ধরেছিল—আর সেই যুগে এ রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না। কবি সুফিয়া নেহাল হুসেন এর বেশ কিছুকাল পরে আবার বিবাহ করেন—এখন তিনি সুফিয়া কামাল নামে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। নেহাল হুসেনের মৃত্যুর পর আমরা ঢাকায় চলে আসি—বহুকাল সে বাড়ির খোঁজ-খবর আর নেইনি। ১৯৬২ সনে যখন

আমার সঙ্গে বেগম সুফিয়া কামালের আবার দেখা তখন তিনি সেই ছোট "নতুন বউ"টি নন—প্রথিতযশা কবি, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। পুরাতন দিনের কথা তার আর মনে নেই।

খানবাহাদুর হেমায়েৎ উদ্দীন আহমদ সাহেব ছিলেন মুসলিম সামাজিক আদর্শের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল একাধারে জমিদার—অন্যদিকে টাকার জোরে রাজনীতিজ্ঞ। বরিশালের যে সব নেতৃবৃন্দ বরিশাল শহরে যেতেন তার প্রায় সবাই তার অতিথি হতেন—সে গান্ধীজিও হতে পারেন আবার জৌনপুরের মাওলানা আবদুর বর সাহেবও হতে পারেন।

বরিশালে এসে দেখলাম ছেলেদের মধ্যে ঢাকার মত হকি বা ক্রিকেট খেলার প্রচলন নেই। বরিশাল ক্লাব ছাড়া আর কোথাও টেনিস খেলা হতো না। ফুটবল খেলা নিয়ে সবাই মেতে থাকত—খেলায় জেতার জন্য সে কি উন্মাদনা! খেলোয়াড় ভাগানো নিয়ে সিজনের প্রথমে প্রতি বছরই তারিখ দিয়ে মারামারি হতো। কেউ কেউ হত না হলেও আহত হতো।

ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মেলামেশা ছিল খুবই কম। হিন্দু ছেলেরা মুসলমান পাড়ায় যেত না—আর মুসলমান ছেলেরাও হিন্দু পাড়ায় বড় একটা ঘেষত না। মুসলমান ছেলো হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে বা হিন্দু ছেলেরা মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করত না—অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কো এডুকেশন' চালু হবার পর অবস্থার কতকটা পরিবর্তন ঢাকায়ও হয়েছিল। ঢাকায় ভদ্র ঘরের মুসলমানেরা ছিল পর্দানশিন এমনকি গরীবরাও বোরকা পরে বের হতো। ঢাকার হিন্দু মেয়েরা পর্দা মানত না—তবে তারা খুব কমই তাদের পাড়ার বাইরে যেত—একমাত্র বুড়িগঙ্গায় সকালে স্নান করা ছাড়া। বরিশাল এসে দেখলাম অন্যরকম—ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারের—এবং সরকারি চাকুরেদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলামেশার কোন বাধা ছিল না। অভিভাবকরা ঢাকার মত এসব ব্যাপারে মোটেই রক্ষণশীল ছিলেন না। বরিশালের এক ব্রাহ্ম-পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সে পরিবারের কর্তা বাবু রাজকুমার ঘোষ দেখতে ছিলেন অবিকল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত। এমনি তার চুল, দাড়ি দেহের রং ঠিক ছিল কবির মত কেবল তফাৎ ছিল পোশাকে, অনেক সময় আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারতাম না। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতি বোস ছিল বিধবা, তার ছেলে এবং তার ছোট বোন রিতিকা ঘোষ ছিল আমারই বয়সী। তার তখনো বিয়ে হয়নি। বাড়িটা কিছু দিনের মধ্যেই যেন আমার বাড়ি হয়ে গেল। যখন তখন মালতি দিদিকে লুচি ভেজে দিতে বলতাম আর তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের খাবার পরিবেশন করতেন। আমি কোন দিন কোন কারণে তাদের বাড়িতে না গেলে পরদিনই লোক আসত আমার খোঁজে। ব্রাহ্ম-সমাজে যখনই যে উৎসব হতো তাতেই আমাকে সঙ্গে যেতে হতো।

বরিশালে চারু রায় নামে এক উকিল ছিলেন, তার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে পানাউল্লাহ সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আফতাবুদ্দীন সাহেব, জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর তাদের ভাড়াটিয়া বাসায় বাস করতেন। পানাউল্লাহ সাহেবের এক শ্যালক মহীউদ্দীনের সঙ্গে চারু বাবুর মেয়ে শোভনা রায়ের বন্ধুত্ব ও পরে প্রেম হয়। শোভানার লেখা অনেক

চিঠি মহীউদ্দীন আমাকে পড়ে শোনাতেন—শোভনার বিশেষ অনুরোধেই মহীউদ্দীন একদিন শোভনাকে নিয়ে বরিশাল থেকে পালিয়ে যায়। চারু বাবু এ ব্যাপারটা চেপে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু খবরটা কলকাতা পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু খবরের কাগজে এক তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। প্রায় তিন মাস পরে ওরা দুজনেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বরিশাল কোর্টে তাদের বিচার আরম্ভ হয়। মহীউদ্দীনের পক্ষ সমর্থন করেন বরিশালের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ফৌজদারী উকিল জনাব হাশেম আলী খান (পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের মন্ত্রী)। কলকাতা আক্রাম খানের প্রেস হতে শোভনার যে সকল চিঠি কোর্টে প্রমাণ করা হয়েছিল "একজিবিট" হিসেবে তা "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। কারণ এ ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। মহীউদ্দীনের অবশ্যই সাজা হয়ে যায়, কারণ ডাক্তারের সাক্ষীতে বলা হয়েছিল যে শোভনা তখনো সাবালিকা হয়নি—তবে অপরাধের জন্য যতটা. নয় তার চেয়ে বেশি বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার জন্য। যাহা ১৯২৬ সন থেকেই ধীরে ধীরে মফস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে ঐ মামলা চলাকালীনও আমার নিজের কোন হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয়নি।

মসজিদের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে জোর করে বাদ্য বাজিয়ে মিছিল করার জন্য হিন্দুদের জেদ ও মুসলমানদের হিন্দুরা দেখতে পায় এমনি স্থানে গরু জবাই—এ নিয়ে বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধতে লাগল। সবচেয়ে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে ১৯২৭ সনে কুলকাঠিতে—সেখানে পোনাবালিয়ার মসজিদের সম্মুখে। বরিশালের বিখ্যাত হিন্দু নেতা সতীন সেনের (পরবর্তীকালে বরিশাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট) নেতৃত্বে এমনি একটি মিছিল নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে পৌঁছালে মুসলমানেরা বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ পরিস্থিতির কথা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিল। উপরে খবর দেবার ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই. এন. ব্লাণ্ডি, পুলিশ সুপার টেইলর, ভূতনাথ দারোগা (তখন সে ইন্সপেক্টর হিসাবে প্রমোশন পেয়েছে) সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানরা বাদ্য বাজিয়ে মিছিল যেতে দিতে অস্বীকার করলে—১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং তাদের পথ থেকে সরে যেতে বলে—কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না—তখন গুলি চালানোর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেয়, যার ফলে সতের জন মুসলমান ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। তাছাড়া মসজিদের মধ্যে যারা ছিল তারাও অনেকে আহত হন, এর ফলে বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর কিছুকাল আগে পটুয়াখালীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালিম চৌধুরীকে মসজিদ থেকে সকালে নামাজ পড়ে বেরুবার সময় সতীন সেন নিজে লোহার রড্ দ্বারা আঘাত করেন—আঘাত মাথায় না লেগে তার ডান কাঁনে লাগে এবং তিনি ভূমিতে পরে যান, পরবর্তীকালে হালিম চৌধুরী সাহেবের সন্তানরা—কবির চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী ও নাদেরা বেগম সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় আস্থা রেখেছেন। মুনীর চৌধুরী ১৯৭১ সনে বদর বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

বরিশালের মুসলমান সম্প্রদায় খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন সাহেবকে রিসেপসন কমিটির চেয়ারম্যান করে এক নিখিল বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্সের আয়োজন করেন। স্যার আবদুর রহিম সভাপতিত্ব করেন।—কিন্তু যার বক্তৃতা আমার কাছে সবচেয়ে ওজস্বিনী বলে মনে হয়েছিল তিনি হলেন বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেব। এই আন্দোলনের ফলে এক "ইনকোয়েরী কমিশন" গঠন করা হয়। এ. কে. ফজলুল হক ব্লান্ডী সাহেব, টেইলর সাহেব এ দু'জনকে জেরা করেন। ফজলুল হকের মামলা চালনার এর জেরা করার ক্ষমতা সেই আমি প্রথম দেখি। সেই ইনকোয়েরীর রিপোর্ট কোন দিনই সরকার প্রকাশ করেন নি। তবে কিছু দিনের মধ্যে ব্লান্ডি কমিশনার ও টেইলর সাহেব ডি. আই. জি. পদে প্রমোশন পান। জেরার সময় আমার মনে হয়েছিল—এ দুজনের চাকুরীই বুঝি থাকবে না। তৎকালে বাংলার মুসলমানের কোন দৈনিক খবরের কাগজ ছিল না। কিছু কাল পরে অবশ্যই খাজা নাজিমুদ্দীন ও অন্যান্য কলিকাতাস্থ অবাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" নামে যে দৈনিকের আবির্ভাব হয়েছিল তা কলকাতার বাইরে কোথাও যেত না, প্রচার কলকাতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। মফস্বলে ঐ কাগজের রিপোর্টারও ছিল না। তাই ঐ "ইনকোয়েরী কমিশনের" বিশদ বিবরণ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সবিশেষ অবগত হতে পারেনি—হিন্দু কাগজের একতরফা খবরই তারা দেখেছে।

ঐ সময় বরিশালে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যুযুৎসু, ছুরি খেলা, লাঠি খেলা শিখতে গিয়ে আমি যে নিজে কখন ওদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম জানি না—কিন্তু আমার ছুরি খেলার পার্টনার রমেশ যেদিন কোতোয়ালীর বড় দারোগা যতিন বাবুকে রাতের অন্ধকারে থানার নিকটে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে সেদিন থেকেই আমি সাবধান হয়েছিলাম, ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই আমার আর এক বন্ধু বাণীপিঠ স্কুলের ছাত্র, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডেনেভান সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে কিন্তু ব্যর্থ হয় এবং ধরা পড়ে যায়। রমেশও ধরা পড়ে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, অবশ্যই এর পরেও অনেক প্রদর্শনী খেলায় আমাকে ছুরী খেলা বা যুযুৎসু খেলা দেখাতে হয়েছে।

একদিকে যেমন অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তেমনি চলছিল চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা থেকে সন্ত্রাসবাদীদের অসমসাহসিকতার কথা বরিশাল এসে পৌঁছেছিল। মেয়েরাও এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিল। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়—অঙ্কের বিখ্যাত প্রফেসর দেবপ্রসাদ ঘোষ, যিনি কোন পরীক্ষায় কোন দিন দ্বিতীয় স্থান দখল করেন নি, তারই ছোট বোন শান্তি সুধা ঘোষ ছিলেন আমাদের সমসাময়িক। একদিন সকাল বেলা আমরা কয়েকজন তার ঘরে বসে গল্পগুজব করছিলাম এমন সময় একদল পুলিশ এসে তাদের বাসা ঘেরাও করল এবং বাসা সার্চ করতে চাইল। শান্তি সুধা ওয়ারেন্ট দেখার পরও গম্ভীরভাবে দারোগা সাহেবের দেহ তল্লাশী করলেন। শান্তি সুধা তখন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে বি. এ. পড়ছিল। পুলিশ খানাতল্লাশী আরম্ভ করল, দারোগা বাবু শান্তি সুধার পড়ার ঘরে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে একটি দেয়ালের ইট খুলে ফেললেন, দেখা গেল

সেখানে রয়েছে দুটো পিস্তল ও একটা খালি বোমার শেল। শান্তি সুধাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল হাতকড়া লাগিয়ে—সঙ্গে নিয়ে গেল খানাতল্লাশী করে পাওয়া মাল—তারজন্য অবশ্যই একটা সার্চ লিষ্ট করা হলো—আমাদের মধ্যে কারো কারো সই নিয়ে গেল। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম যে শান্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমূদ গল্পচ্ছলে অথবা বাহাদুরী দেখাবার জন্য কোন বন্ধুকে খবরটা বলেছিল—ফলে পুলিশ খবর পেয়ে যায়।

আমরা বিকেলের দিকে নদীর পাড়েই বেড়াতাম। বাসেত সাহেবের একটি ঘোড়া ছিল—খুব শিক্ষিত—বিকেলে কেউবা ঘোড়া চড়ে বেড়াত—কেউবা কুকুর নিয়ে খেলা করত। তার তিনটি কুকুর ছিল। টাইগার, প্রিন্স ও ভলকা। সরাইল হাউন্ডের শিকল ছিল আমার হাতে—এমন সময় জেলা জজ ইলিস সাহেব তার "ফক্স টেরিয়ার" কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল—আমার অন্যমনস্কতার জন্যে আমার হাত থেকে শিকল ছুটে যায় এবং আমাদের ডালকুত্তা ইলিসের টেরিয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই কামড়িয়ে ধরে, ইলিস সাহেব তার হাতের বেত দিয়ে বেশ করে মেরে তার কুকুরকে ছাড়িয়ে নেয়—যদিও তার কুকুরের গলা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। ঠিক সে সময় কোথা থেকে মিমি দৌড়ে এসে আমাদের কুকুরটাকে ধরল এবং অবলীলাক্রমে মিছে করে ইলিসকে বললে যে কুকুরটা তার হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল যার জন্য সে খুব দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। ইলিস ছিল চিরকুমার সুতরাং মেয়েদের প্রতি তাঁর বেশি মাত্রায় 'সিভালরাস' হওয়া ছিল স্বাভাবিক। আমি হাঁফ ছেড়ে রক্ষা পেলাম। মিমির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রয়ে গেলাম।

এ সময় ন্যাশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেগুলো মৃতপ্রায় হয়ে আসছিল—তাদের উপর শেষ আঘাত হানল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী—তিনি হঠাৎ পাশের হার শতকরা আশি ভাগে বাড়িয়ে দিলেন—ফলে "জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"-এর বহু ছাত্র আবার ইংরেজী স্কুলে ফিরে এল।

এ সময় আমাদের ছেলেদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর খবর এসে পৌঁছে—আমরা তখনো 'এরোপ্লেন' দেখিনি। কাগজে বেরুল আমেরিকার একজন বিমান চালক লিন্ডবার্গ ৬০০ মাইল আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্যারিসে এসে পৌঁছেছে। আমাদের কাছে এ যেন ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতই মনে হচ্ছিল।

ঐ বছরই (১৯২৭) কাগজে বেরুল যে রুশদেশে ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছে—তুরস্কে কামাল পাশা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিয়ে তাদের ইউরোপীয় করে তুলছে।

বাসায় পড়াশুনার নানা কারণে ব্যাঘাত হচ্ছে বলে আবার যেতে হলো সেই পুরানো হোষ্টেলে। আমাদের হোষ্টেলের সুপারিন্টেন্ডেট ছিলেন বৃদ্ধ জমাতে উলা পাশ মৌলভি সাহেব। সিনেমায় যাওয়া ছিল একেবারে নিষেধ। আমরাও স্থির করলাম ছবি দেখতে যেতেই হবে। রাত সাড়ে নটার 'শো' ছাড়া অন্য সময়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সাড়ে আটটায় এশার নামাজ পড়েই বিছানায় শুয়ে পড়তাম। এশার নামাজ ছিল বাধ্যতামূলক

কিন্তু অনেক ছেলে জামাত আরম্ভ হলেই পেছন থেকে কেটে পড়ত। এত সকালে ঘুমাতে গেলে পড়ালেখার ক্ষতি হবে বলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মত প্রকাশ করলেন, আমরা উত্তর দিলাম যে আমাদের ইংরেজী শিক্ষক আমাদের শিখিয়েছেন,—

*"Early to bed and early to rise*
*Makes a man healthy, wealthy and wise."*

সুপার নিজে কবিতা লিখতে ভালবাসতেন, তাই কবিদের প্রতি তার ছিল খুব শ্রদ্ধা। তাই এ ব্যাপারে আর কোন উপদেশ আমাদের দিতেন না। আমরা ন'টার মধ্যে মশারী খাটিয়ে কোলবালিশ চাদর দিয়ে ঢেকে রেলিং টপকিয়ে বের হয়ে যেতাম। একদিন তো প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। দুপুর রাতে আমরা ক'জন সবেমাত্র রেলিং পটকিয়ে ভেতরে নেমেছি অমনি সুপারের গলা কে ? কারা ওখানে ? অতরাতে তিনি কখনো বেরুতেন না কি জানি কেন সেদিন তিনি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা কি করছি জিজ্ঞেস করলেন—বুঝলাম আমাদের রেলিং টপকাতে দেখেননি—অবলীলাক্রমে মিছে কথা বললাম যে আমাদের এক বন্ধু বাহ্যি করতে গেছে রাতে ভয় পায় বলে আমাদের তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে—চোরের ভয়ে নয় বূতের ভয়ে। তিনি আস্তাগ ফেরুল্লা পড়তে পড়তে ঘরে ফিরে গেলেন। তাকে খুশী রাখার জন্য তার কবিতার প্রশংসা করতাম। তার কবিতাও কয়েকটি মুখস্থ করে রেখেছিলাম। এখনো দু'একটি মনে আছে,—

*"পদ্মাপারে মুসলিম যত*
*হিলসা ধরে শত শত*
*বাজারেতে বেচে অবিরত*
*মোহম্মদিয়া রাসুলিল্লাহ"*

অথবা,

*"শোন মোর মেয়েগন*
*দিয়ে মনোপ্রাণ*
*স্বামীরে করিবে যতন*
*মোহম্মদিয়া রাসুলিল্লাহ"।*

এসব কবিতার বই তিনি আবার পয়সা খরচ করে ছাপাতেন আর চার পয়সা দামে বিক্রি করতেন। বাইরের কেউ এ বই কিনত কিনা আমরা জানতাম না। কিন্তু আমরা বোর্ডারগণ সবাই কিনতাম।

১৯২৭ সনের শেষের দিকে আমার একমাত্র মামা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেই মাকে দেখার জন্য চিঠি লিখেন। কিন্তু আমার পিতা সে খবরটি চেপে যান। মামার মৃত্যুর সংবাদ যখন এল তখনই বাবা মাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন—অবশ্যই মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখেছিলেন। মা পিত্রালয়ে পৌঁছেই জানলেন যে মামা বেশ কিছুদিন পূর্বেই তাকে চিরদিনের মত ছেড়ে গেছেন। মামার মৃত্যুর দু'সপ্তাহের মধ্যেই তার দুটো সন্তান একই রোগে মারা যায়। মার ছিল অদৃষ্ট

খারাপ তাই তার একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুশয্যার পাশে থাকতে পারেননি। হয়ত বাবার ধারণা ছিল না যে যক্ষ্মা রুগী এত তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারে। কিন্তু এরপর মা যতদিন জীবিত ছিলেন এ দুঃখ ভুলতে পারেন নি। ভাইকে তিনি অত্যন্ত বেশি ভালবাসতেন। ১৯২৮ সনের প্রথম দিকে আমাকে বাড়ি আসতে হয়। কিন্তু বাড়ি পৌঁছেই খবর পেলাম যে কবি কাজি নজরুল ইসলাম এসেছেন ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে। সুতরাং গাঁয়ে আর থাকা হলো না। ছুটে গেলাম ঢাকায়—দশ বার দিন কি আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছিলাম সে আর ভোলা যায় না। আজো কবির গান, আবৃত্তি, হাসি আমার কানে শুনতে পাই।

১৯২৮ সনেই আমার টাইফয়েড জ্বর হয়। সে সময় ঐ জ্বরের কোন চিকিৎসাই ছিল না—ক্লোরোমাইসিটিন জাতীয় ঔষধ তখনো আবিষ্কার হয়নি। ডাক্তারগণ যাতে পেট ভাল থাকে কেবল সে সব উপদেশই দিতেন। জ্বর আমার চলতে লাগল ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণই নেই—মাসখানেক বিছানায় শুয়ে থেকে আমার "বেডসোর" হয়ে গেল, যত দিন যেতে লাগল আমার ঘা-গুলো ততই বেড়ে উঠতে লাগল—দু'মাস চলল, বাঁচার আশা সবাই ছেড়ে দিল, কখন প্রাণটা বেরিয়ে যাবে সবাই কেবল তারই প্রতীক্ষায় থাকত—কিন্তু আমার মা কিছুতেই আশা ছাড়েননি। প্রায় আড়াই মাস কাল আমাকে আগলে রেখেছেন—রাতে ঘুমাননি। নার্সিং ব্যাপারে তিনি অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারতেন না—আর আমিও যদি মাকে কিছুক্ষণ না দেখতাম তবে ভয় পেয়ে যেতাম। মা একদিন বাড়িতে অতিথি আগমন উপলক্ষে পোলাও কোরমা পাক করে রেখেছিলেন, আমার শোয়ার পাশের ঘরেই অতিথিদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যখন মা অতিথিদের দেখাশুনা করছিলেন তখন খুব কষ্ট করে কোন রকমে পাশের ঘরে গিয়ে প্লেট থেকে পোলাওতো খেলামই—একটা সিন্ধ ডিমের কোরমা খেয়ে ফেললাম ঠিক এমনি সময় মা সে ঘরে চীৎকার দিয়ে আমাকে ধরাধরি করে বিছানায় তুললেন—তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল—এই তার প্রথম ধারণা হয় যে আমার বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আশ্চর্য আমি সে দিন থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। মাথার চুল সব ঝরে গিয়েছিল—পা দু'টো অত্যন্ত সরু হয়ে গিয়েছিল—কোনদিন আর আমি হাঁটতে পারব তা ভাবতে পারিনি—কারণ জ্বর ছেড়ে যাবার পরেও মাসখানেক কিছু বা কারো উপর ভর না করে দাঁড়াতে পারতাম না। বাৎসরিক পরীক্ষার আর মোটে কিছুদিন বাকি—কিন্তু স্কুলে যেহেতু বরাবরই ভাল করেছি তাই হেডমাস্টার আমাকে দেখতে এসে বলে গেলেন যে আমার পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন হবে না। প্রমোশন আমি এমনিতেই পাব। আমার অসুখের খবর পেয়ে আমাদের আত্মীয় বাড়িতে উঠেছিলেন—সেখানেই আমার চিকিৎসা চলছিল। আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম বটে কিন্তু মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন—ধীরে ধীরে বিছানা নিলেন। আমার স্বাস্থ্য একটু ভাল হলে আমাকে আবার হোস্টেলে পাঠান হলো—মার অসুখ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে লাগল—তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। ১৯২৯ সনে তিনি সবার মায়া ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যান। তখন মার বয়স চল্লিশ বছর। মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন এ সংসারের সঙ্গে আমার সমস্ত বাঁধন কেটে গেল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে

আমাকে একদিন ডেকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে, "আমার সারাটাজীবন অসুখী ছিল। কেন তা তোর জানার প্রয়োজনই নেই, শুধু আমাকে কথা দে, বেঁচে থাকলে কোন রকমের জুয়া খেলবি না, মাদকদ্রব্য স্পর্শ করবি না—নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবি না'—তারপরে বললেন, "ভাই-বোনদের দেখিস।" পিতার সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিছু বলেননি—আমি আজ পর্যন্ত তার সে উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করেছি।

মা ও বাবার মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদক্ষেত্রেও কোন মিল ছিল না। বাবা ছিলেন গান্ধী বিরোধী, আলী ভাইদের উপর তার খানিকটা জাতক্রোধ ছিল কারণ তার ধারণা ছিল মুসলমানরা সবেমাত্র যখন শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের স্কুল কলেজ থেকে বের করে এনে তাদের সর্বনাশ করেছে। একদিন রাতে আমি বিছানায় যাব এমন সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে আমাদের এই বিক্রমপুরের গর্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সেরোজিনী নাইডু, স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, তারা কেবল ভারতে নয়, বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত কিন্তু এমন একজন মুসলমানও নেই বিক্রমপুরে যার কথা এমনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা যায়। মনে হলো তিনি যেন অন্তর দিয়ে চাইতেন আমিও লেখাপড়া করে ঐ মহাজনদের পথে অগ্রসর হই। তার আরো ধারণা ছিল যে "স্কুল-কলেজ ছাড়" ধ্বনি শুধু কংগ্রেসের কারসাজি আর আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কংগ্রেসকে এ কাজে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে ঠিক তখনই যখন মুসলমান ছেলেরা পড়াশুনায় এগিয়ে যাচ্ছিল। কোথাকার কোন্ খলিফার জন্য আমাদের দেশের মুসলমান ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মধ্যে কোন যুক্তিই তিনি খুঁজে পেতেন না।

মা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। বাবা গোলাম, চাকর, বাঁদীদের কড়া শাসনে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন—আর মা ছিলেন তার উল্টো, যে কেউ "মা" বলে ডাকলেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। আমাদের দেশে সেদিনেও ক্রীতদাস রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু আমি মাকে কোন দিন তাদের উপর কোন রকম দৈহিক নির্যাতন করতে দেখিনি—যদিও অন্যান্য হিস্যায় বান্দীদের হাতে, গালে গরম লৌহ শলাকার পোড়া দাগের অভাব ছিল না।

মা চরকায় সূতা কাটতেন আর সেই সূতা তাঁতীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে আনতেন। খদ্দর পরতেন—নিজেরই ভাল লাগত বলে না দেশবন্ধুর কোন উপদেশ ছিল তা আমি জানতে পারিনি। মার এক ভাই দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন—তার সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সেই অপরাধে তার সাত বছর সাজা হয়, সাজার মেয়াদ শেষ হবার আগেই জেলে তার মৃত্যু ঘটে। খুব সম্ভব আমার সেই মামার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে সময় আমি নিজেও পিতলের টাকুতে সূতা কাটতে আনন্দ পেতাম এটা অনেকটা খেলা বলে মনে করতাম। বাবার এসব বাড়াবাড়ি বলে মনে হতো। দাদী আম্মা একদিন বললেন, "বড় বউ, অত ভারী কাপড় পরে গোসল করতে তোমার কষ্ট হয় না।" মা নিম্নস্বরে জবাবে বললেন, "না তো আম্মা, আমার মোটা কাপড় পরতে খুব ভাল লাগে," বাবার শহর থেকে আনা বিলেতি কাপড় বা ঢাকাই ও শান্তিপুরী শাড়ী তোলাই থাকত।

মায়ের কাছে যে টাকা জমা থাকতে পারে তা আমাদের সবারই ধারণার অতীত ছিল—এমনি সহজভাবে চলতেন যেন মনে হতো টাকা-পয়সার প্রতি তার বিশেষ কোন টান নেই। একদিন অবশ্যই তিনি ধরা পড়ে গেলেন। হঠাৎ কাগজে দেখতে পেলাম সরকার হাজার টাকার নোট ও একশত টাকার নোট "ডিমনিটাইজেসন" করলেন। আমরা কাগজে ঐ শব্দটা দেখেছি কিন্তু অর্থ বোঝার চেষ্টা করিনি। খবরটা থাকত বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে বক্সের মধ্যে—মনে হতো যেন ওটা কাগজে কোন "এড্ভারটিজমেন্ট।" বাবা একদিন বললেন যে তিনি দু'একদিনের মধ্যে ঢাকা যাবেন—তার কয়েকখানা একশত টাকার নোট জমা দিতে হবে কারণ সে মাসের শেষে আর ওগুলো চলবে না। মার তো চক্ষুস্থির, বললেন যে, তারো কিছু নোট রয়েছে—দেখা গেল সেসব বিলেতি এবং দেশী দামী শাড়ীগুলোর ভাঁজে ভাঁজে বিছিয়ে রেখেছেন নোটগুলো। বাবা সেগুলো নিলেন জমা দেবার জন্যে—তবে মা জানতেন ঐ টাকার অংশ তিনি কোন দিন ফেরত পাবেন না। বাবা অবশ্যই টাকা আর ফেরত দেননি—তবে কয়েকটি গিনি কিনে এনেছিলেন মার জন্য, যদিও মার অলংকারের কোন অভাব ছিল না। তা'ছাড়া মা অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না।

প্রতি বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় আমরা বরিশাল নদীর পাড়ে বসে আলোচনা করতাম যে রাস্তায় যারা চলছে তাদের মধ্যে কারা পরীক্ষার্থী আবার তাদের মধ্যে কে কে গাঁয়ের স্কুল থেকে এসেছে এবং কে কে মহকুমা শহর থেকে এসেছে। নতুন শার্ট, কাপড়, মাথার মধ্য দিয়ে সিঁথি আর সর্বোপরি নতুন জুতা পায়ে দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা আমাদের কৌতুকেরই কেবল সঞ্চার করত না—আমরা নিজেরাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে তাদের কাছে গিয়ে বলতাম ভাই আপনি কোন্ স্কুল থেকে এসেছেন। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি হতো। আমরাও যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হতে গেলাম সেদিনই অনেক ছেলেদের নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো। এখানো মনে পড়ে বিশেষ একটি ছেলে আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যদিও আমরা তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি কারণ তার চেহারার মধ্যে একটা দীপ্তি ছিল—গায়ের রং ছিল ফর্সা কিন্তু জুতা ছিল আবার নতুন। একটু গম্ভীর প্রকৃতির—যেন ছাত্রজীবন শেষ করেছে কিছুদিন আগেই। এক কোণে বসে "ফরম" লেখা সমাধা করে কেরানীর হাতে জমা দিয়ে হোষ্টেলের দিকে চলে গেল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকেই আমি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হই। সত্যি বলতে তখন থেকে ষ্টেটস্ম্যান কাগজে আন্তর্জাতিক খবরই বেশি স্থান পেত। জার্মানীতে ফিল্ড মার্শাল ফণ হিন্ডেনবার্গ নামটা আমার কাছে কেবল ভালোই লাগত না—জার্মানী সম্বন্ধে আরো জানার আকাঙ্খা মনে পোষণ করতাম। যাদের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম তারা জেনারেল লুডেনডরফ্ ও হিটলার। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয় বরণ করার পর জার্মানী বিজয়ী দেশগুলোকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা আর সরকারি সৈন্যবাহিনী গঠন করবে না—কিন্তু প্রাক্তন সৈনিকরা সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেয়নি। জার্মানীতে তখন ক্ষমতার লড়াই চলছিল—দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে।

দ্বিতীয় দশকের আরম্ভ থেকেই ইটালীতে বেনিটো মুসোলিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯২৪ সনে ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ মুসোলিনিকে G. C. B উপাধিতে ভূষিত করেন, গ্রীক দ্বীপ "করফু" দখল করে দেশের একচ্ছত্র নেতা হয়ে গেলেন।

রুশ-দেশের বিপ্লবী নেতা লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রুশদেশে চলছে দুর্ভিক্ষ—ষ্টেটসম্যানের হিসেবে ২ কোটি লোক সে দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

চায়নায় চলছিল অরাজকতা। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের যুদ্ধবাজ নেতার নীতি। এ সময় নেতৃত্ব দান করতে এলেন ডাক্তার সানইয়াৎ-সেন। সমস্ত এশিয়ার দৃষ্টি তখন সানইয়াৎ-সেনের দিকে।

ইংরেজী ছবি এলে আমি যেতাম দেখতে কেবল ছবির জন্য নয়। মনে হতো যেন ইংরেজী কথা বলার সাহায্য হবে—ছবির কথা-বার্তা শুনে। আমার প্রিয় নায়ক তখন চার্লী-চ্যাপলিন—বাস্টার কীটন।

জিন্নাহ্ সাহেব মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তার চৌদ্দ দফা উপস্থিত করেন ভারতের শাসনতন্ত্র সমস্যার সমাধানের জন্য। এটা ছিল অনেকটা নেহেরু রিপোর্টের পাল্টা জবাব, যা প্রস্তুত হয়েছিল লর্ড বারকেনহেডের বিবৃতির উত্তরে, মুসলমান ছেলেরা যে চৌদ্দ দফা নিয়ে খুব আলোচনা করেছিল তা মনে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খবর জানি না তবে মফস্বল কলেজের ছাত্ররা তখনো পরিষ্কার হিন্দু মসুলমান হিসেবে ভাগ হয়ে যায়নি।

বরঞ্চ ১৯২৯ সনে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা আদালতে যে বিবৃতি দেন তার প্রতি আমাদের আলোচনা চলে অনেক দিন ধরে। ঐ আসামীরা কম্‌রেড মুজাফফর আহমদ ও ডাঙ্গের নেতৃত্বে যে অস্ত্রের সাহায্যে বৃটিশরাজ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন এ খবরটা এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এখানে ছিল মুসলমান ও হিন্দুদের একযোগে নেতৃত্ব দেয়া।

বিশ্বের সকল দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ১৯২৯ সন থেকেই দেখা দেয়। বেকার সমস্যা বাড়তে থাকে। ১৯১৪ সনের পরে পাটের মূল্য বৃদ্ধি এবং দেশে শিল্প গড়ে উঠায় যে অর্থনৈতিক অগ্রসর শুরু হয়েছিল তা ১৯২৯ সনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো।

১৯২৯ সনে আমরা আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর আমানুল্লার কথা শুনতাম—স্ত্রীকে নিয়ে টেবিল টেনিস খেলার কথা। হঠাৎ রাতারাতি তিনি কামালপাশা হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন বোধহয়। বাচ্চা সাক্কা নামে একটি সাধারণ অথচ অসাধারণ সাহসের লোক তাকে সিংহাসনচ্যূত করে কয়েক দিনের জন্য কাবুলের বাদশাহ হয়ে বসেছিলেন।

১৯৩০ সনে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। গান্ধীজি ৬ই এপ্রিল পায়ে হেঁটে ডান্ডি যাত্রা করেন লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য। ১২ই এপ্রিল গান্ধীজি কিছু সংখ্যক অনুচরসহ গ্রেফতার হন। ১৯৩০ সনের জুলাইয়ের মধ্যে এ আন্দোলনে যোগদানকারীদের লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, মদের দোকানে ও স্কুল-কলেজের সম্মুখে পিকেটিং, বিলেতি কাপড় পোড়ানো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। আমাদের কলেজের প্রবেশপথের রাস্তায় মেয়েরা শুয়ে পড়ে আমাদের পথরোধ

করে। আমাদের বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এমন সময় একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্জেন্ট মটর সাইকেলের হ্যান্ডেলে বৃটিশরাজের নিশান "ইউনিয়ন জ্যাক" লাগিয়ে কলেজ গেটে উপস্থিত। সিপাইদের হুকুম দিলেন গেট থেকে মেয়েদের বের করে দিতে। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা সমস্বরে শ্লোগান দিল "Up up National flag—Down down Union Jack" ঠিক এমনি সময় কোন্ ফাঁকে একটি দুঃসাহসী মেয়ে সার্জেন্টের মটর সাইকেল থেকে "ইউনিয়ন জ্যাক"টি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের একটি ত্রিবর্ণ নিশান লাগিয়ে দিল। সবাই এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল, সার্জেন্ট পেছন দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। মেয়েটিকে চপেটাঘাত করলেন এবং সাথে সাথে কংগ্রেসে নিশানটি দূরে ফেলে দিলেন। আর যায় কোথায় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, "ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল আর পুলিশ আরম্ভ করল ব্যাটন চার্জ। আমরা সবাই কলেজের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যারা ক্লাশ করছিল তারাও গোলমাল শুনে বাইরে চলে এল—কিন্তু একটি ছাত্র বসেই থাকল। ছাত্রটিকে আমরা চিনলাম—এ সেই ছাত্রটি যে আমাদের ভর্তির দিন অমন গাম্ভীর্য দেখিয়েছিল। কৌতূহল হলো পরিচয় করি। জানতে পারলাম তার বাড়ি পিরোজপুর—নাম তার তোফাজ্জল হোসেন। পরবর্তীকালে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক-সম্পাদক ও কলাম লেখক। সাংবাদিক জীবনে লোকে যাকে মানিক মিঞা বলেই জানত।

১৯৩০ সনেই সূর্যসেনের বিপ্লবীদল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন ১৬ই এপ্রিল। এটাই ছিল ছেলেদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

এই বছরই স্যার মোহম্মদ ইকবাল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।

সাইমন কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বৃটিশ সরকার গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কংগ্রেস বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে। যোগদানকারীদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায়, মাননীয় আগা খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, স্যার মোহাম্মদ সফি, স্যার জাফরুল্লাহ খান, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, বেগম শাইনেওয়াজ প্রভৃতি। দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন স্যার আকবর হায়দারী ও মীর্জা মোহাম্মদ ইসমাইল। আমাদের উপর যার বক্তৃতা সবচেয়ে বেশি ছায়া ফেলেছিল সে হলো মাওলানা মোহাম্মদ আলী। তিনি বলেছিলেন,—

"বৃটিশের অনিচ্ছুক হাত থেকে স্বাধীনতা আদায়ের জন্যই আমি এই বৈঠকে যোগদান করেছি। হয় স্বাধীনতার সারাংশ নিয়ে দেশে যাব নইলে আর ফিরে যাব না", তার কথা সত্য হয়েছিল তিনি আর ভারতে ফিরে আসেননি। জেরুজালেমে তাকে কবর দেয়া হয়। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না—ফলে গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট এবং দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধীজি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে রাজী হন। ১৯৩১ সনে নভেম্বর মাসে গান্ধীজি লণ্ডনে পৌঁছেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন সরোজিনী নাইডু। আগা খানের রিটজ হোটেলের কামরায়

সকল প্রতিনিধিদের প্রথম বৈঠক হয়। গান্ধীজি আলোচনা মন্ডপে খুবই কম উপস্থিত থাকতেন। তিনি বেশির ভাগ সময়ই ব্যক্তিগত আলোচনা করতেন। জিন্নাহ্‌র যথেষ্ট পরিশ্রম সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের কোন মীমাংসা হলো না। এর পরেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং লণ্ডনেই ব্যবসা আরম্ভ করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের সময় কেম্ব্রিজে অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমত আলী ও অন্যান্য কয়েকজন একটি প্যামফ্‌লেট প্রকাশ করেন। নাম ছিল "Now or Never". তারাই পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন।

১৯৩১ সনে "ষ্টেটিউট অব্ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার" গৃহীত হওয়ার ফলে কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রি ষ্টেট সর্ববিষয়েই তাদের নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা পেলেন—তাদের দেয়া হলো ডমিনিয়ন ষ্টেটাস; একমাত্র বৃটিশ সম্রাটকে 'কমনওয়েলথের' সংযোগকারী হিসেবে গ্রহণ করা হলো। এর পর থেকে বৃটিশ পার্লামেন্টের কোন আইন ডমিনিয়নগুলোর উপর প্রযোজ্য হতে পারবে না বলে স্থির হলো।

১৯৩১ সনে সকলেই বুঝলেন যে কেবল অর্থনৈতিক সংকটই বৃটেনকে অস্থির করে তোলেনি উপরন্তু রাজনৈতিক সঙ্কটও দেখা দিচ্ছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ, লয়েড জর্জ ও বল্ডুউনকে এক সঙ্গে কাজ করতে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে অনুরোধ করেন। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব দেখা দিল—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন রুজভেল্ট আর জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করলেন হের হিটলার।

দেশে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই চট্টগ্রামের হিন্দুদের উপর পুলিশের চরম অত্যাচার চলছিল। ১৯৩১ সনে অক্টোবর মাসে শ্রী হরিপদ ভট্টাচার্য খানবাহাদুর আহ্‌সানউল্লাহ (পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী) কে গুলি করে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গেই হরিপদ ধরা পড়ে। কিন্তু তাকে এমন মারধোর করা হয় যে থানায় যাবার আগেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। এর ফলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

আমি বরিশাল থাকার সময় যাদের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তন্মধ্যে গান্ধীজি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও "দি মোসলমান" পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান। গান্ধীজির হিন্দি বক্তৃতা আমার ভাল লাগেনি। সেনগুপ্তের অশ্বিনি কুমার হলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা "উঠ, জাগ, উত্থান কর, জাগ্রত হও, দেশের যুব সমাজ—ভারত মাতার ডাক এসেছে," বেশ ভাল লেগেছিল। মুজিবর রহমান সাহেবও অশ্বিনি কুমার হলে "যুক্ত-নির্বাচনের" উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার দেশব্রতী ও সমাজসেবক। তিনি যা অসত্য বলে মনে করতেন তার প্রতিবাদ করতে কোনদিন ভয় পেতেন না। সে যুগেও সরকারি তরফ হতে তাকে বহুবার বহু প্রলোভন দেখানো হয়েছিল কিন্তু তাকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা সবাই ছিলেন হিন্দু একমাত্র মৌলভী সাহেব ছাড়া। তবে অধ্যাপকরা অধ্যাপনাই করতেন। আর কিছু হবার জন্য

প্রতিযোগিতা অথবা দল পাকানো, ষড়যন্ত্র বা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন না যা আজকাল রেওয়াজ হয়েছে। ফলে তারা ছিলেন ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাদানই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—শিক্ষকদের ভাল কাপড় জামার প্রতি আকর্ষণ ছিল না। ধুতি চাদরের উপর ইংরেজী অধ্যাপক সুরেনবাবু ভুল করে মাঝে মাঝে মশারী গায়ে দিয়ে কলেজে চলে আসতেন।

বরিশাল কলেজে থাকতে ইজাডোরা ডানকানের "আমার জীবনী" ও এরিক রেমার্কের "All Quiet on the Western Front" পড়ার কথা আমার এখনো মনে আছে। ওয়াসী মুলারের টারজান ছবি "এডিপলো" যেমন ভাল লাগত তেমন ভাল লাগত নরমা শিয়ারের মে ওয়েস্ট, ক্লারা বো, প্রভৃতির অভিনয়। এই সময় বাংলায় সবাক ছবি আসে বরিশালে—শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" এর সাথে পূর্ব বাংলার "মুখ ও মুখোশের" তুলনা করা যায়। তবে নির্বাক চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, সীতা দেবী ও আরো অনেকের ছবি দেখে আমরা আনন্দ পেতাম।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করে ফল বেরুবার পর আবার ঢাকায় ফিরে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য।

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও তদানীন্তন সমাজ

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে ঢাকায় এলাম, পড়াশুনা করার ইচ্ছে ছিল খুবই কিন্তু আমার সেই যে টাইফয়েড হয়েছিল তার পর থেকে আমি আর এক সঙ্গে বেশিক্ষণ পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারতাম না। ছাত্র হিসেবে আমার যেটুকু সুনাম ছিল স্কুল জীবনে তা পরবর্তী জীবনে আমি আর অক্ষুণ্ন রাখতে পারিনি। পরীক্ষায় কোন দিনই খুব বেশি খারাপ না করলেও খুব একটা ভালও কিছু করিনি। এরপর হতে ছাত্র হিসেবে 'মিডিওকার' বলেই আমার পরিচয় ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টির ফলেই হউক বা ঢাকার জলবায়ুর জন্যেই হউক আবার আমি খেলাধুলা করতে সক্ষম হই। তবে টেনিসের দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন খুব নাম ডাক। নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদরা এখানে অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন। ডক্টর মাহ্‌মুদ হাসান, এস. এন. রায়, স্যার এ. এফ. রহমান, ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর কাননগু, প্রফেসর হরিদাস ভট্টাচার্য, ডক্টর সিনহা, ডক্টর হিরেন দে, ডক্টর জে. সি. ঘোষ, প্রফেসর সত্যেন বসু, ডক্টর সুশীল দে, মোহিতলাল মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এখানে না বলে পারছি না যে আমাদের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এখনকার মত এত ডক্টর ছিল না আর গাড়িরও এত সমারোহ ছিল না। তারা বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে আসতেন।

অবশ্যই অন্য একটা কারণ ছিল যে তখনো হিন্দুদের মধ্যে একটা সংস্কার ছিল যে বিলেত গেলে ধর্ম থাকে না। তাই আশু মুখার্জীর মত লোকের মা-ও তাকে বিলেত যেতে দিতে রাজী হননি।

মুসলমান অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল নগণ্য—বোধহয় শতকরা দশজন তাও আরবী, পার্সী, ইসলামিক স্টাডিজ এদের নিয়ে। আরবীর হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন ডক্টর ফুইক—জাতিতে জার্মান। এতদসত্ত্বেও কলকাতার কাগজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা ইউনিভার্সিটি" বলা হতো। আমাদের শিক্ষকরা আমার জানামতে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতেন না। তবে ফাঁক একটা ছিল। হিন্দুদের নিকট মুসলমানরা ছিল অনেকটা অস্পৃশ্য, অচ্ছুত, তাই হিন্দুদের মত মুসলমান ছেলেরা প্রফেসরদের

বাড়িতে বড় একটা যেত না যেমন যেত হিন্দু ছেলেরা। অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষকরাও মুসলমান ছেলেরা খুব কাছাকাছি দাঁড়ালে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে কাপড় ছেড়ে স্নান করে ঘরের ভিতর ঢুকতেন। এর ফলে হিন্দু শিক্ষক ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা দূরত্ব অনুভূত হতো। নীরোদ চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

> "Curiously enough, with us, the boys of the Kishoreganj, it found visible expressions in the division of our class into two sections, one composed purely of Hindus and the other Muslims. We never came to know all the circumstances of this division, whether or not the Muslim boys had also expressed unwillingness to sit with us, for "sometime past we, the Hindu boys, had been clamouring that we did not want to sit with the Moulim boys because they smelt of onions."

আলোচনার আর একটি বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট। খবর আসছিল যে বৃটিশ সরকার দেউলিয়া হওয়ার পথে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ধার নিয়ে তার দেশরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে হচ্ছে। রাজা পঞ্চম জর্জ, লয়েড জর্জ ও বণ্ডউইনকে ডেকে কোয়ালিশন সরকার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের ও জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা গ্রহণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দু'জনেই রুশ সমাজবাদ আর ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে একটা সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থনীতি গ্রহণ করার পক্ষপাতি।

দেশেরও আর্থিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে। বাংলাদেশের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে "ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ্" তার রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, "The peasantry of Bengal are taking to a dietry on which even rats could not live for more than five weeks." আমি ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি যে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে দিনে একবেলাও ভাত খেতে পায় না। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস কাঁঠালের উপর, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে তালের তৈরী পিঠা প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করত। তার উপর মহাজনের কাছে ঘটি-বাটি বন্ধক, জমি বন্ধক, হালের গরু বিক্রি—অনেক সময় ক্ষেত্রের কাঁচা ফসলের বাবদ দাদন গ্রহণ—ঋণের বোঝা তাদের কোনদিন শোধ হতো না—ঋণের মধ্যেই জন্ম,—ঋণের মধ্যেই জীবন আর সে ঋণে অনাহারে, অর্ধাহারে মৃত্যু। তবু মাছ ধরে মাছ বিক্রি করবে না—কারণ গেরস্ত ঘরের মানুষ জেলের কাজ কি করে করে? লম্বা বর্ষায় কেউ নৌকায় যাত্রী নিয়ে অন্য গাঁয়ে বা জাহাজ স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে কিছু পয়সা পেত। কিন্তু নাপিত ধোপার কাজ করে পয়সা উপার্জন করত না। ছনের ঘরে ছনের চাল লাগাত বা বাঁশের বেড়া বানাত কিন্তু তাই বলে কাঠের মিস্ত্রির কাজ করত না—এক কথায় হিন্দু "ছোট জাত" যা করত তা তারা জীবনের প্রয়োজনেও করত না।

গান্ধীজি বিলেতে গিয়ে তার অহিংস নীতির ও অসহযোগের কারণ প্রচার করতে লাগলেন। ফলে লর্ড আরউইনকে দেশে ডেকে পাঠানো হলো এবং লর্ড ওয়েলিংডনকে ভারতের ভাইসরয় করে পাঠানো হল। আরউইনের স্থলে লর্ড ওয়েলিংডনের আগমন

এবং গান্ধীজির দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩২ সনের ৪ঠা জানুয়ারী গ্রেফতার তার ফলে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রজা আন্দোলনের ছোট খাট খবর কোন কোন কাগজে বেরুত কিন্তু সেটা কখনো কমনরুমের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেনি। গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ্‌র নামও আমরা কাগজে দেখেছি কিন্তু আমাদের কাছে বেশি প্রিয় নাম ছিল এ. কে. ফজলুল হক আর আগা খানের। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন সমঝোতার লক্ষণ দেখা গেল না। যদিও জিন্নাহ্ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। কারো নেতৃত্বে কাজ করা জিন্নাহ্‌র ধাতে ছিল না, এমনকি আগা খানকেও তিনি নেতা বলে মানতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। মুসলমান নেতারা বেশির ভাগই এ ঘোষণাকে অভিনন্দন জানালেন—যদিও বাংলাদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দূরের কথা—শতকরা পঞ্চাশটি সদস্যপদও দেয়া হয়নি—অথচ ছাব্বিশ জন ইউরোপীয়ান সদস্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাহলে জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে তাদের তিন চারটার বেশি সদস্য পদ পাওয়ার কথা নয়, অর্থাৎ মুসলমানরাও যদি মন্ত্রিসভা গঠন করেন তবে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন ইউরোপীয়ান সদস্যরা স্থির করবেন—কারণ কংগ্রেস বিরোধী দল গঠন করলে এ ইউরোপীয়ান সদস্যদের উপরই মন্ত্রিসভার আয়ু নির্ভরশীল হতে বাধ্য।

যা হউক রোয়েদাদের অংশ বিশেষ সংশোধন করতে হলো কারণ গান্ধীজি বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন যে, অচ্ছুত-হিন্দুদের হিন্দু-সম্প্রদায় থেকে পৃথক করা যাবে না অর্থাৎ তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে না—তার অনশন ধর্মঘটের ফলে পুনা প্যাক্ট হয়, যার ফলে রোয়েদাদ সংশোধন করতে হয়।

একদিন খবরের কাগজে সবার চোখ পড়ল একটি খবরের উপর—কর্নেল লিন্ডবার্গের ছেলেকে অপহরণ করে গুণ্ডাদের দ্বারা টাকা দাবী এবং টাকা দেয়া সত্ত্বেও তার সন্তানকে জীবিত না পাওয়া। সে যে কি মর্মান্তিক ঘটনা, যে লিন্ডবার্গ কিছুদিন আগেই আমেরিকার মুখ উজ্জ্বল করেছিল তার প্রতি এমনি আঘাত আমাদেরও যেন শোকাকুল করে ফেলেছিল।

কাগজে যে কত রকম খবরই থাকত কিন্তু বয়স্ক লোকের কাছে যে খবর পড়ার মত আমাদের ছাত্রদের কাছে সে খবর শুধুই হতো গদ্যময়—আমরা ভালবাসতাম এমনি খবর যে ডগলাস ফেয়ার ব্যাংক তার স্ত্রী মেরী পিকফোর্ডকে কলকাতায় নিয়ে আসেননি তাই এই মানসিক যন্ত্রণা উপশমের পথ পেলেন—বিবাহভঙ্গ করে। চার্লস লটন বা ক্যাথারিন হেপবার্ন এর চলচ্চিত্র আর বাংলার প্রমথেশ বড় য়া ও যমুনার চলচ্চিত্রের মধ্যে কোথায় প্রভেদ ইত্যাদি। প্রায় ত্রিশ বছর পরে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে মেরী পিক ফোর্ডের দিকে তাকিয়ে কেবল সে কথাই মনে হচ্ছিল।

১৯৩৩ সনেই সার্জেন্ট বাতিস্তা কিউবায় ক্ষমতা দখল করে—আমার সঙ্গে তার দেখা ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে যখন আমি আমাদের শ্রমিক নেতা হিসেবে হাভানায়

গিয়েছিলাম আই.এল.ও.'-র প্লানটেশন কমিটির মিটিং এ। তখন তিনি জেনারেল বাতিস্তা—দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী—আর ক্যাস্ট্রোর দল পাহাড়ে পাহাড়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাতিস্তার বিরুদ্ধে।

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক গলসওয়ার্দী সাহিত্যের জন্য যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ১৯৩৩ সনে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এর কিছুদিন পরে কার্জন হলে ডক্টর হাসান গলসওয়ার্দীর "ফরছাইট সাগার" উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন কিন্তু তার লিখিত বক্তৃতা থেকে অনেক বেশি উপভোগ্য হয়েছিল সভাপতি স্যার এ. এফ. রহমানের ছোট বক্তৃতা যেমন সারগর্ভ তেমনি সাবলীল। ছাত্ররা খুবই অনন্দ পেয়েছিল সেদিন।

প্রফেসর রজেনবার্গ হিটলারের ইহুদী দলনের শিকারস্বরূপ তার দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। কে জানত সেদিন যে সেখানেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তাকে এবং তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল ১৯৩১ সনেই কিন্তু ১৯৩৩ সনেই জাপান পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হয়। এদিকে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী লীগ অব নেশনস'-র সদস্যপদ ত্যাগ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যাকডোনাল্ড সরকার বৈদেশিক নীতি স্থির করেছিলেন "লীগ অব নেশনস'কে ভিত্তি করে।

এ সময় জিন্নাহ্ দেশে ফিরে আসেন আবার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য। সরোজিনী নাইডুর "Ambassador of Hindu Muslim unity"-র জীবনে বড় পরিবর্তন এসেছিল। তিনি ১৯৩৫ সনে মুসলিম সম্প্রদায়কে মুসলিম লীগের পতাকা তলে আনার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। আমার আজও মনে আছে ষ্টেটসম্যান কাগজে পলিটিকেল অবজারভার বলেছিলেন যে জিন্নাহ্ সাহেব কেন যে মুসলিম লীগের ভাঙ্গা নৌকা (Leaky boat) বেছে নিলেন রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে তা বোঝা গেল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন এসব খবর নিয়ে মাতামাতি করছিল তখন ঢাকা শহরে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে যারা আইন পড়ার কথা চিন্তা করছিলাম, সাব জজ পান্না লাল বোসের কোর্টে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। ক্লাস যেদিন থাকত না সেদিনই কোর্টে গিয়ে বসতাম বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও উকিল বাবুদের সওয়াল-জবাব শোনার জন্যে। মামলা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সন্ন্যাসী মেজকুমারের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি যিনি পরবর্তীকালে ফিফটি ফিফটি চ্যাটার্জি নামে অমৃতবাজার পত্রিকায় কুখ্যাতি লাভ করেছিলেন কারণ তিনি মুসলমানদের জন্যে পরিষদে ও চাকুরীক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশটি আসন রক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন, কতকটা দেশবন্ধুর ১৯২৩ সনের বেঙ্গল প্যাক্ট-এর আদর্শে। অন্যদিকে রাণী বিভাবতীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিস্টার এ. এন. চৌধুরী যার ছেলে পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। উপরোক্ত ব্যারিষ্টারদ্বয় ছাড়া আরো অনেক নামজাদা উকিল ঐ বিখ্যাত মামলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রজারা বেশির ভাগ মেজকুমারের পক্ষে আর কর্মচারীরা বেশির ভাগ রাণীর পক্ষে ছিলেন। রাণীর পক্ষে ঢাকার অনেক অভিজাত লোকেরা সাক্ষী দিয়েছিলেন অন্যপক্ষে কয়েকজন ঢাকার অভিজাত মুসলমান কুমারের পক্ষে স্বাক্ষী দিয়েছিলেন। আমার এক খালু যিনি কিছুদিন পূর্বেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে অবসর করেছিলেন তিনি স্বাক্ষী দিলেন যে একবার তারা বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন সে সময় মেজকুমারের উপর একটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং গুলিতে সে বাঘ ধরাশায়ী হওয়ার পূর্বে তার বাহুর উপর থাবা মেরেছিল। বাঘের থাবার দাগ জুরীদের দেখান হল। কেন যেন আমার মনে হয়েছিল যে এখানেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব। মামলা চলাকালেই পান্নালাল বাবু বদলী না হয়েও এডিশনাল জজ হলেন এবং মামলা তার কোর্টেই চলতে থাকল। এ ধরনের মামলা বোধহয় এই প্রথম তাই কোর্ট প্রাঙ্গনে মানুষের ভীড় লেগেই থাকত। মামলা চলছিল প্রায় সাত বছর।

কুমারের আরজি ছিল অনেকটা উপন্যাসের মত। ঘটনার প্রকাশ একদিন মেজকুমার তার রাণী বিভাবতী, বাড়ির চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই রাণী ও ডাক্তার ষড়যন্ত্র করে কুমারকে পানীয় জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয় ফলে কুমার দৃশ্যতঃ মারা যায়—রাতের অন্ধকারেই তাকে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং লোকজন তাকে শ্মশানে নিয়ে যায় কিন্তু সেদিন ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুষারপাত চলছিল বলে লোকজন তার মরদেহ শ্মশানে ফেলে দিয়ে চলে এসে মিথ্যে করে রাণীকে জানায় যে তার সৎকার শেষ হয়েছে শেষ রাতে—তুষারপাতের জন্যে সৎকারে বিলম্ব ঘটায় তাঁরা রাতে ফিরতে পারেনি। রাণী তাদের মোটা বকশিস দিয়ে বিদায় করেন।

সকালের দিকে একদল সন্ন্যাসী শ্মশানঘাটে মৃতদেহটি তুষারে আবৃত দেখতে পায় এবং তাদের নেতা ধর্মদাস নাগ পরীক্ষা করে দেখেন যে মানুষটি মরে যায়নি—বিষের ক্রিয়ায় হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সন্ন্যাসীদের চিকিৎসা ও সেবায় মানুষটি সজীব হয়ে উঠে কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি তখন বিলুপ্ত। সুতরাং সন্ন্যাসীরা তাকে তাদেরই দলভুক্ত করে নেয়। তারপর থেকে দীর্ঘ বার বছর সে নাগাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন তারা বুড়ীগঙ্গার তীরে "বাকল্যাণ্ড বাণ্ড"-এর প্রায় শেষ মাথায় "রূপলাল হাউজ"-এর সম্মুখে এসে আস্তানা পাতে। স্থানটা তার কাছে যেন খুব ভাল লাগে—ধর্মদাস নাগের আদেশ নিয়ে সে কিছুকাল ঐ অস্তানায় একাই থেকে যায়—প্রতিদিন অনেক মানুষ আসে সে তাদের আশীর্বাদ করে আর এক দৃষ্টিতে বুড়ীগঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। নদীটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়—শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে—কোন কোন রাস্তা যেন তার চেনা, মনে তার সন্দেহ জাগে যে পূর্বজন্মে এ দেশেরই কোথাও বুঝিবা সে জন্মগ্রহণ করেছিল—যত ঘোরাঘুরি করে ততই যেন তার অতীতের কথা আবছায়ার মত মনের উপর দাগ কাটে। তারপর একদিন ঢাকা ছেড়ে জয়দেবপুরের পথে পা বাড়ায়। জয়দেবপুরের কাছাকাছি এলে লোকজন বাড়ি-ঘর আরো বেশি চেনা মনে হয়। কুমারকে দেখে গাঁয়ের অনেক বৃদ্ধেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। অশিক্ষিত হিন্দু মেয়েরা অনেকে কুমারের সঙ্গে

লোকটির সাদৃশ্য দেখে ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে কারণ তারা ভাবছিল সে বুঝিরা কুমারের প্রেতাত্মা। কয়েকজন মুসলমান প্রজা তাকে জিজ্ঞেস করে তার নাম ধাম—কিন্তু সে উল্টো প্রশ্ন করে ঐ দেশটার নাম। এসব কথা গ্রামে প্রচার হয়ে গেলে রাজবাড়িতে খবর যায় এবং তার এক নিকট আত্মীয়া তাকে দেখে চিনে ফেলেন। কুমারও তাকে চিনে ফেলেন—তার সঙ্গে সে রাজবাড়িতে যায় এবং নির্ভুল পথ ধরে তার নিজের ঘরে পৌঁছে। রাণী বিভাবতী তখন কলকাতায়। রাণীর কাছে খবর গেলে সে সন্ন্যাসী কুমারকে জোচ্চোর বলে অভিহিত করে এবং বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। ভাওয়ালকুমার তখন কোর্টে এসে মামলা দায়ের করে এ মর্মে যে সে-ই মেজকুমার। সন্ন্যাসীর বাংলা উচ্চারণ ভঙ্গী অবাঙ্গালীর মত এবং আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না সে মেজকুমার। অথচ যৌবনকালে শিকারের সময় বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হলে তার বাহুতে বাঘের থাবার দাগ দেখা গেল এবং বিভাবতীর পায়ের হাঁটুর উপর কোথায় কি চিহ্ন আছে তাও সঠিক বলে গেলেন। তার নাম সই করলেন ইংরেজীতে যদিও তিনি ইংরেজী জানতেন না। নাম লিখলেন Ramendra N. Roy. জজ জিজ্ঞেস করলেন এর মধ্যে কোন্‌টা "রমেন্দ্র" কোন্‌টা "নারায়ণ" আর কোন্‌টা "রায়"—কুমার উত্তরে বললেন যে তা তিনি বলতে পারেন না। তার শিক্ষক তাকে বলেছিলেন ঐ সবটা মিলে তার নাম এবং কাগজে ঐভাবে সই করলে তার নাম সই করা হলো।

শত শত সাক্ষী দেশ-বিদেশ থেকে এসেছিল। ধর্মদাস নাগ ঘটনার প্রধান সাক্ষী হিসেবে গণ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জিত হলো কুমারের আর রাণী হাইকোর্টে আপীল দায়ের করলেন। এ মামলার সময় কত পুঁথি লেখা হলো, গানের কলি রচনা করল কবিয়ালরা, কোর্টের প্রাঙ্গনে একতারা বাজিয়ে ভাওয়ালের বাউলরা গান বাঁধল ওরা সবাই ছিল সন্ন্যাসীর পক্ষে আর রাণীর বিপক্ষে তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে নানা প্রকার গল্প প্রচার করে রাণীকে চরিত্রহীনা রমণী বানিয়ে ছেড়েছিল। প্রজারা চাঁদা তুলে কুমারের মামলা চালিয়েছে—আর ষ্টেট থেকে দিয়েছে রাণীর মামলার খরচ।

ঐ মামলা দেখার পর আমার উকিল হবার বাসনা আরো বদ্ধমূল হল। ঢাকার মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে তখনো রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। যদিও কিছু কিছু মুসলমান ছেলে সন্ত্রাসবাদী দলে অথবা কমুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। বাকি রাজনীতি আহসান মঞ্জিলের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ওখান থেকেই পরিষদ সদস্য, জেলা বোর্ড সদস্য, মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন প্রার্থী ঠিক করা হতো। এক কথায় সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য নবাব উপাধিতে ভূষিত নবাব আবদুর গণি সাহেব এবং তার পুত্র নবাব খাজা আহসানউল্লাহ বৃটিশকে সাহায্য করে যাচ্ছিল। লর্ড কার্জন যখন খাজা আহসানউল্লাহর পুত্র নবাব সলিমুল্লাহকে বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করতে বললেন তখন তিনি রাজী হলেন এই শর্তে যে তার চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঋণ বৃটিশ সরকার পরিশোধ করবে। সেই থেকে বৃটিশ রাজের অনুগ্রহে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আহসান মঞ্জিলের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল বহুকাল। ১৯১১ সনে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রথম প্রস্তাব রহিত করে যখন বাংলাকে ভাষাভিত্তিক করা হলো—যার ফলে ঢাকা আর রাজধানী থাকল না। তখন আহসান মঞ্জিলের নেতৃত্বে প্রথম ফাটল ধরল।

স্যার সলিমুল্লাহ অভিমান করে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে ১৯১৫ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৃটিশ সরকারের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তখন আর রাজনীতিতে ফিরলেন না—তখন বৃটিশরাজের পক্ষে নবাবদের বাদ দিয়ে কন্যাপক্ষের সন্তানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন। যার ফলে শহর বানুর ছেলে নাজিমুদ্দীন ও শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বের দুয়ার খুলে গেল। স্যার সলিমুল্লাহর বৈবাহিক নবাব ইউসুফজানের মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হলেন। স্যার সলিমুল্লাহর ছেলে খাজা হাবিবুল্লাহ তখন জীবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করতে ব্যস্ত। ঐ সুযোগে খাজা শাহাবুদ্দীন তার সেক্রেটারী হয়ে নবাবের কাজগুলো যেমন ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের সরদারদের পাগড়ী পরানো, পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আপীল শোনা এবং জেলাবোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের রাজনীতি দেখাশোনা প্রভৃতি তিনিই করতে লাগলেন। কি করে যে মুন্সি খাজা শাহাবুদ্দীন রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন তাও এক উপন্যাস। নবাব আবদুল গণি ও খাজা আহসানুল্লাহ যে হীরা-জহরৎ, মনি-মুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন এবং যে বাক্সটি নবাব খাজা আহসানুল্লাহ কখনো কাছ ছাড়া করেননি। কারণ তিনি বলতেন যে নবাবের জমিদারীর চেয়ে বেশি মূল্যবান তার ঐ বাক্সটি সেই বাক্সটি স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যুর পর নতুন নবাব খাজা আতিকুল্লাহর হাতে আসে। নবাব সলিমুল্লাহ তখন ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে যখন তিনি ঢাকা এসে জেষ্ঠ্য ভ্রাতা হিসেবে নবাবের গদী দখল করলেন তখন তিনি পেলেন নবাবের জমিদারী আর খাজা আতিকুল্লাহর হস্তগত হয়ে রইল সেই অমূল্য বাক্সটি। এরপর থেকে খাজা আতিকুল্লাহ কোকেনভক্ত হয়ে উঠলেন একদিন সুযোগ বুঝে খাজা আতিকুল্লাহর কন্যা ফরহাদ বানু ঐ বাক্স সরিয়ে ফেলে স্বামী খাজা শাহাবুদ্দীনকে নিয়ে বিলেত চলে গেল। শাহাবুদ্দীনের এক ভাই খাজা সালাহউদ্দীনের কাছে। তারপর কয়েক বছর পরে যখন শাহাবুদ্দীন দেশে ফিরে এলেন তখন মৌলভী শাহাবুদ্দীন পুরোপুরি সুট্-প্যান্ট পরা দাড়ি কামানো পুরোদস্তুর সাহেব। ফিরে এসেই নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ'র সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তার কাজ হলো নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ্কে পাপের প্রলোভনে তুষ্ট করে ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলার নেতৃত্বে সমাসীন হওয়া—নিজেকে যতটা সম্ভব অন্তরালে রেখে। আমিনা বেগমের ছেলেদের বিশেষ করে সৈয়দ আবদুল হাফেজ ও আবদুস সলিমকে টেনে আনলেন রাজনীতিতে কারণ তাদের পিতা সৈয়দ আজিজুল্লাহ ছিলেন মানিকগঞ্জের শরীফ ঘরের ছেলে যদিও সে এত বোকা ছিল যে তাকে নবাব বাড়ির লোকেরা ঘরে ঢুকতে দিত না। তার মুখ থেকে সদাই লালা পড়ত। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন যখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি ছেড়ে শিক্ষামন্ত্রী হয়ে কলকাতা চলে গেলেন এবং বৃটিশ ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলের প্রচেষ্টায় একজিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেন তখন শাহাবুদ্দীন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ঢাকার উকিল ও মোক্তারদের মধ্যে কাউকে কাউকে বেছে নিলেন আহসান মঞ্জিলস্থ মুসলিম লীগের মধ্যে। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল সৈয়দ আবদুল হাফিজের সাহায্য।

খাজা শাহাবুদ্দীনের রাজনীতি ছিল তার ক্ষুরধার বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিত্বের উপর নয় বা কেবলমাত্র বৃটিশের সাহায্যের উপর নয় যদিও খেতাব পেয়েছিলেন বৃটিশ রাজের নিকট থেকে, অথবা নবাবীর উপরেও নয়। তাই মধ্যবিত্তের উপর তাকে ভরসা করতে হলো। মধ্যবিত্তের মধ্যে যারা আহসান মঞ্জিলের রাজনীতিতে স্থান পেলেন তাদের বিরুদ্ধে একটা মধ্যবিত্ত দল গড়ে উঠল। খাজা আহসানউল্লাহ্‌র ও নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র ধারণা ছিল যে মেয়েদের অশিক্ষিত ও বোকা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলে তারা জমিদারীর ভাগ চাইবে না এবং ঘরজামাই হয়ে দু'টো খেয়ে-পরে খুশী থাকবে। কিন্তু কালের চক্রে খাজা হাবিবুল্লাহ্‌কে পিছে ঠেলে ফেলে সেই বোকাদের ছেলেরাই অর্থাৎ শহরবানু ও আমিনা বিবির পুত্ররা রাজনৈতিক আঙ্গিনায় নেতা হয়ে বসলেন। অর্থাৎ নাজিমুদ্দীনকে বাংলার নেতৃত্বে সমাসীন রেখে খাজা শাহাবুদ্দীন ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলাকে করতলে রাখার ব্যবস্থা করলেন। নাজিমুদ্দীন, শাহাবুদ্দীনের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করার জন্য তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এবং তিনি হজ্জে গেলে গভর্নরকে বলে খাজা শাহাবুদ্দীনকে তার স্থলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলর করে গেলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদেও তিনি কিছুদিন কাজ করলেন অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ না করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিরোধী দলের লোকের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে মধ্যবিত্তদের মনে ভয় সৃষ্টি করেছিলেন খুবই তার উপর এখন যোগ হলো ব্যক্তিত্ব। তার বিচক্ষণতা ক্রমাগত প্রকাশ পেতে লাগল।

এ সময় ঢাকার নতুন বুর্জোয়াঁ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাবুদ্দীনের দলে ভিড়েন এদের মধ্যে নাম করা যায় জিন্দাবাহারের ডাক্তার মইজুদ্দীন, সুলতানউদ্দীন আহমদ (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত), রেজাই করিম (প্রথম জীবনে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে "কাউন্সিল অব ষ্টেটের' সদস্য), খানবাহাদুর আবদুর রশীদ (প্রথম জীবনে স্কুলের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে জমিদার, আপার কাউন্সিলের সদস্য ও প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরীর মালিক), ফজলুর রহমান উকিল (পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), অন্যদিকে ছিলেন বেচারাম দেউরীর জমিদার আবুল খয়রাত মোহাম্মদের ছেলে আবুল হাসনাত আহমদ (ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন), মোহাম্মদ ইব্রাহিম (পরবর্তীকালে হাইকোর্ট জজ ও আয়ুব খানের মন্ত্রী), জনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরী (পরবর্তীকালে জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী), আরো দু'জন ছিলেন যারা দু'দিকেই সমানভাবে থাকতেন তারা হলেন—মীর্জা আবদুল কাদের সরদার ও শেফাউল মূলক্ হেকিম হাবিবুর রহমান। রেজাই করিম সাহেবও পরবর্তীকালে ঐ পথ গ্রহণ করেছিলেন। এরা আবার খাজা শাহাবুদ্দীনের দলে পুরোপুরি যেতেন না বলে শাহাবুদ্দীন এদের ক্ষতি করতে পারে তাই এরা নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর সমর্থক বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন—যদিও নবাব ১৯৩৬ সনের পূর্বে রাজনীতির আসরে সরাসরি আসেননি।

বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির পুরানো ঢাকা শহরে ঘোড়ার গাড়ি, মলের গাড়ি, রাস্তায় পানি দেবার গুরুর গাড়ি, সব মিলে জমজমাট। খাজা শাহাবুদ্দীন বক্তৃতা করতেন,

"আমার খানদান ঢাকা শহরে পানির কল দিয়েছে, বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করেছে, এতিমখানা করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের থাকার জন্যে বাড়ি করে দিয়েছে, হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড করে দিয়েছে" ইত্যাদি। আর ঢাকার রইছ কুট্টি সম্প্রদায় তাই শুনে হাতে তালি বাজাত। এর মধ্যে যে ধাপ্পা ছিল তা তারা বুঝত না। পানির ট্যাপ কয়েক ঘর বড় লোকের বাড়িতেই ছিল বাকি ট্যাপগুলো রাস্তার বস্তি ও মহল্লার সম্মুখে যেখানে পানি আসত খুব ভোরে আর সন্ধ্যায়—আর সে কলতলায় ভিস্তিওয়ালা ও মেয়ে-পুরুষের অশ্রাব্য গালা-গালি ও শেষ পর্যন্ত চুলাচুলি। বৈদ্যুতিক আলোরও সেই একই অবস্থা আর এ দুটোরই ব্যবস্থা করেছিল ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি—তাছাড়া চেয়ারম্যান নবাব ইউসুফজান নবাব বাড়ির লোক নয়। তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন খাজা হাবিবুল্লাহর নিকট, একটি পুত্র সন্তান হবার পর সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা করেছিলেন বলিয়াদীর সিদ্দিকী পরিবারের খান সাহেব ফরিদউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ১৯২৩ সনে—নবাব সলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যুর আট বছর পরে। এর মধ্যে খানদানের কোন আর্থিক দান ছিল না। ফরিদউদ্দীন সাহেব কমিশনার অফিসে চাকুরী নিয়েছিলেন—পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেন—স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম অরফানেজ তার একক প্রচেষ্টার ফল। তবে নবাবদের নাম ব্যবহার করতেন চাঁদা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে তোলার সুবিধার জন্যে। খানবাহাদুর কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব ফরিদউদ্দীন সাহেবকে "ফরিদ মাস্কান" বলে একটা বাড়ি ঢাকায় মৌলভিবাজার এলাকায় এবং বোরহানউদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবকে মাহুতটুলীতে এক নম্বর কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী লেনের বাড়িটি জমিদারী অংশবাবদ দিয়েছিলেন। বোরহানউদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। এমনি ঘটনা আমাদের সমাজে বিরল ছিল না। মন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব ও তার ভ্রাতা মুজিবুর রহমান সাহেবদ্বয় তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হতে একই ব্যবহার পেয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উদঘাটন হয়েছিল ১৯২১ সনে আর স্যার সলিমুল্লাহ হল তৈরী হয়েছিল ১৯৩১ সনে—স্যার সলিমুল্লাহর মৃত্যুর ষোল বছর পরে। মিটফোর্ড হাসপাতালের আহসানুল্লাহ্ ওয়ার্ড তৈরীতে "খানদানের" কোন দান ছিল না।

সে যুগে ঈদের দিন বিকেল বেলা অভিজাত মুসলমান নাগরিকরা "আহসান মঞ্জিলে" মিলিত হতো। বাইশ পঞ্চায়েতের সরদারদের দাওয়াত করা হতো সে সুধি মজলিশে। সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ যাদের কুট্টি বলা হতো তাদের সেখানে কোন স্থান ছিল না। এ ব্যবস্থা বহুকাল প্রচলিত ছিল। খাজা শাহাবুদ্দীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি এমনকি খাজা নাজিমুদ্দীন যখন হজ্বে গিয়েছিলেন গভর্নর তখন শাহাবুদ্দীনকেই তার স্থলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত করেন। মিলাদ মাহ্‌ফিলের মুন্সি শাহাবুদ্দীন নিজের বুদ্ধিবলে নেতৃত্বে সমাসীন হলেন। নেতৃত্ব সম্বন্ধে যখন তিনি নিঃসন্দেহ হলেন তখন তার মনের অহংকার দেখা দিল যদিও বাইরের ভদ্রতা তিনি তার শত্রুর সঙ্গেও বজায় রেখেছেন চিরকাল। ১৯৩৪ সনে ঈদের মিলন উপলক্ষে যখন সকল অভিজাত মুসলমান

নাগরিকরা আহসান মঞ্জিলে সমবেত হয়েছেন তখন দেখা গেল যে খাজা সাহেব ও তাদের আত্মীয়দের জন্য খাবারের পর গোল্ড ফ্লেক সিগারেট আর অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে পাসিংশো ও ট্যটলার সিগারেট—অর্থাৎ তারা খাবে বেশি দামী সিগারেট আর অন্যেরা কম দামের সিগারেট। নিমন্ত্রিত আধা সামন্তবাদী বুর্জোয়াঁ মুসলমান ভদ্রলোকেরা এটাকে চরম অপমান বলে মনে করে সেখান থেকে চলে এলেন এবং ঐদিনই আহসান মঞ্জিলে ঐ ধরনের ঈদের মিলন শেষ হলো। এর পরের বছর থেকে স্থির হলো যে প্রথম দিনে পূবের মুসলমানরা পশ্চিমের মুসলমানদের বাড়ি যাবে। এর কারণ খাজা সাহেবরা নিজেদের স্বার্থে কোন টাউন হল হতে দেয় নি। এখান থেকেই শুরু হলো শাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মতদ্বৈধতা। মধ্যবিত্তরা হিন্দু নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন অনেক সময়ে শাহাবুদ্দীনকে জেলা বোর্ড থেকে বের করতে কিন্তু পারেননি। এদের মধ্যে একমাত্র ফজলুর রহমান সাহেবই (পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) নতুন পথে রাজনীতির গোড়াপত্তন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের সংগঠনে মনোযোগ দেন। এর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা তাদের রাজনীতি হল-ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। তাদের দলাদলি জেলা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে জেলার ছাত্র বেশি তারাই সাধারণতঃ ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হতেন—কুমিল্লা জেলা এ ব্যাপারে প্রায়ই নেতৃত্ব দিত। ফজলুর রহমান সাহেব হল ইউনিয়ন নির্বাচনে কোন দিন যোগ দেননি যতদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আর ছাত্র হিসেবে তেমন ভাল ছিলেন না বলে কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তখনকার দিনে মুসলমান ছাত্র সমাজে পড়াশুনায় পারদর্শী না হলে নেতৃত্ব পেতেন না। ইব্রাহিম সাহেব (পরবর্তীকালে মন্ত্রী) ছাত্রজীবনে রাজনীতি করেছেন তবে সেটা সংগঠনমূলক নয়—খেলাফতের ডাকে কলেজ ছেড়েছেন। রেজাই করিম সাহেবেরও রাজনীতি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রাইভেট সেক্রেটারীগিরি এমনকি আইন পড়ার সময় তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল সদস্য হবার জন্য প্রার্থীও হয়েছিলেন। একমাত্র ফজলুল রহমান সাহেবই নতুন পথের সন্ধান বের করেন—কারণ বোধহয় তার কোন "কনষ্টিটিউয়েন্সি" ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাঁয়ের রাজনীতির কর্ণধার ছিলেন এবং তার দৃষ্টি ছিল যেন সৎ-ভাইদ্বয়—জনাব মুজিবুর রহমান ও ফজলুর রহমান সে পথ থেকে দূরে থাকে চিরকাল।

কফিলুদ্দীন চৌধুরীও ছাত্রজীবনে রাজনীতি করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। মুসলমান উকিলেরা সে যুগে বেশির ভাগই ফৌজদারী উকিল হিসেবে নাম করেছিলেন—আদালতে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা কেউ ঐ ব্যবসায় নেতৃত্ব দিতে পারেননি। একমাত্র কফিলুদ্দীন সাহেবই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি আদালতে ভাল উকিল ছিলেন এবং পসারও ছিল সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ভাবে রাজনীতিকে পরবর্তীকালেও গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব ওকালতি আরম্ভ করতে গিয়েই ভয়ানক হোঁচট খান। সরকারি উকিলের নথী থেকে কাগজ সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান—সিনিয়িন উকিল তার পক্ষ হয়ে ক্ষমা চাওয়ায় এবং

একেবারে আনকোরা নতুন উকিল বলে জজ সাহেব তাকে ক্ষমা করেন আর সেই সাথেই তার ওকালতি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পর থেকে তিনি রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অচিন্তনীয় অবিশ্বাস্য সফলতা অর্জন করেছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে। তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে পারতেন না, আলাপ আলোচনার মধ্যে কোন শালীনতা দেখা যেত না, তার বড় কারণ, তিনি কোন ভাষাই ভাল করে রপ্ত করেননি। কি ইংরেজী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই আকর্ষণীয় আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন না। অথচ তার সংগঠনের অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা অন্য সব নেতাকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম যখন রাজনীতি আরম্ভ করেন তখন তার না-ছিল পয়সা, না-ছিল কোন রাজনৈতিক নেতার প্রভাব। অনেক সময় বন্ধুদের বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারে তার বাবুবাজার মেসের একটি ঘরে খাবার আস্‌ত। পায়ে ছিলেন একটু খোঁড়া—সে খোঁড়া পায়েই হেঁটে হেঁটে সংগঠনের কাজ করতেন। তখন দু'আনা বাবু বাজার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছিল—সে পয়সাও তাকে আমি খরচ করতে দেখিনি। তার বন্ধুরা তাকে খুব ভালবাসতেন। প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তিনি মাওলা মিঞার বাসায়ই থাকতেন এবং আমাদের সাথে সাধারণত সে বাসায়ই রাজনৈতিক আলোচনা হতো। তার সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুক্ষিগত হবার পর থেকে জীবন সংগ্রাম তার কঠিন হয়েছিল—কিন্তু এতে শাপে যেন বর হয়ে দেখা দিল। তিনি এ অবিচারে মোটেই না-দমে বরঞ্চ আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন জীবনে সফলকাম হতে। তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা ছিল এবং সে আকাঙ্খা পূরণের জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। তার ছিল ইংরেজী যাকে বলে Bulldog's tennacity of purpose. কোন কাজের জন্যেই পরের উপর নির্ভর করতেন না সাহস করে এগিয়ে যেতেন সম্মুখে—বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জীবনে সফলতা লাভ করতে হবে এটা তার জানা ছিল। বন্ধুরা তারজন্য যেমন সব কিছু করতে পারতেন তিনিও তেমনি বন্ধুদের জন্য সব কিছু করতে পারতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকেই তিনি পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন।

এ সময়ে কয়েকজন তার ভক্ত হয়ে পড়ি, এদের মধ্যে ছিলেন শহীদ নজীর আহমদ, শামসুল হক, আজীজ আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও আরো অনেকে। সত্যি কথা বলতে ঢাকায় যে দলটি ১৯৪৩—৪৪ সনের পর থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ঢাকার রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সবাই প্রায় এ দলভুক্ত ছিলেন।

অন্যদিকে ছিলেন জনাব রেজাই করিম। ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু তিন ভাষায় সমানভাবে কথা বলে যেতে পারতেন অনর্গল। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর ফজলুল করিম এবং দ্বিতীয় ছেলে সুন্দর চেহারা চোখে মুখে একটা দীপ্তি—সুবক্তা এবং অল্পদিনের মধ্যেই নামজাদা উকিল হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। সে-ই একমাত্র মুসলিম উকিল যিনি প্রথম দিনেই কোর্টে এসেছিলেন একটি জামিনের দরখাস্ত করতে—ভাল দরজীর প্রস্তুত কাপড় এবং গাউন নিয়ে আর একখানা সিঙ্গার গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কে যারা বেশ নাম করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

কিন্তু তার মত অন্য কেউ ওকালতি ব্যবসায় যোগ দিয়ে সবাইকে প্রথম দিনেই চমক লাগিয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি অত্যন্ত বেশি সুচতুর ছিলেন বলে জীবনে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেননি ; আমি তার জুনিয়র হিসেবে কাজ করেছি কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আমাকে বাধ্য করেছেন তার বিরোধিতা করার জন্য। এতে তিনি এবং আমি দু'জনেই মনোকষ্ট পেয়েছি। জীবনে তিনি কোন দিনই মনস্থির করে রাজনীতি করতে পারেননি। তাই বোধহয় তার জীবনটা সবদিক দিয়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেব ছিলেন পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত সুখী—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে একটি সুখী পরিবার সৃষ্টি করেছিলেন ' তাই রাজনীতিকে তেমন করে আঁকড়িয়ে ধরতে পারেননি, জনাব ইব্রাহিম ছিলেন এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি যেমন ভাল ছাত্র ছিলেন তেমনি ভাল উকিল ছিলেন—কিন্তু সংসার জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসুখী। তার বিবাহ তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল যে দুঃখ ভোলার জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন—যা তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে করতে পারতেন না। পরবর্তীকালে তিনি হাইকোর্টের জজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন, রেজাই করিম সাহেবও একই ভুল করেছিলেন কিন্তু তিনি সে ভুলকে স্বীকার করেননি কোন দিন।

আবুল হাসনাত সাহেব (শাহজাদা মিঞা) বেশি শিক্ষিত ছিলেন না। সত্যি বলতে তিনি অল্পদিনই আলীগড় স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন শহরের রাজনীতিতে বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল পলিটিক্সে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষেব দিকে উপরোক্ত নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের জন্যে সবেমাত্র সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল তৈরী হচ্ছিল এর পূর্বে মুসলমান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তলায় থাকতেন। অবশ্যই সেই বিশ্ববিদ্যালয় অট্টালিকাটি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের মত সুন্দর অট্টালিকা তখন ঢাকায় আর একটিও ছিল না। কার্জন হল ও ঢাকা হাইকোর্ট যাহা এখন দেশরক্ষা অফিস তাও জ্যোৎস্না রাতে এত সুন্দর দেখাত না আর এর ভেতরের লনগুলোও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো থাকত। সম্মুখের লনে ছিল তিনটি টেনিস লন। লনটেনিস তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব "পপুলার" ছিল, বাৎসরিক খেলাধুলা ক্রিকেট, হকি, ফুটবল প্রভৃতি সব খেলাই তখনকার দিনে ছাত্রদের মধ্যে প্রিয় ছিল। আমি নিজে ক্রিকেট খেলায় বল করার সময় ডান হাতের "জয়েন্টে" ব্যথা পাওয়ার পর থেকে টেনিসের প্রতি মনোযোগ দেই। সলিমুল্লাহ্ হলে মিকসড্ ডবল্সে আমি ও আমার পার্টনার আবদুর রাজ্জাক, আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ (বাচ্চু মিঞা) ও আবদুল আজিজ সাহেবদ্বয়কে পরাজিত করে ১৯৩৫ সনে ডবল্সে চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করি। টেনিস খেলা পরবর্তী জীবনে ১৯৬১ সন পর্যন্ত আমার প্রিয় খেলা ছিল। সে বছরই ডাক্তারের নিষেধে আমি ঐ খেলা ছেড়ে দিয়ে গলফ্ খেলা আরম্ভ করি তখন আমি বার্মাদেশে রাষ্ট্রদূত। এখন হেঁটে বেড়ানো ছাড়া আর কোন শারীরিক ব্যায়াম আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

স্যার আর. এন. মুখার্জীর ব্যক্তিগত পরিচালনায় মার্টিন এণ্ড কোম্পানী সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আর্কিটেক্ট, এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ সমাধা করেছিল।

খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন সাহেব ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার, লোকে বলত যে তার দেওয়ান বাজারের বাড়িও সে সময় মার্টিন কোম্পানী তৈরী করে দেয়। খান বাহাদূর সাহেব ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সে-চাকুরীতে থাকাকালীন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একটি পা ভেঙ্গে খোঁড়া হয়ে যান তাই বোধ হয় তিনি পূর্বের চাকুরী ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদ গ্রহণ করেন। তার প্রথম পুত্র কামালুদ্দীন এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত—প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করতেন আর অপর ছেলে নূরুদ্দীন পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগ দেন।

আমরা যখন ছাত্র তখন ল্যাংলী সাহেব আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলর —আমরা যখন এম. এ. পড়ছিলাম তখন স্যার এ. এফ. রহমান তার স্থলে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। স্যার এ. এফ. রহমান ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র—ইংরেজী বলতেন অক্সফোর্ড একসেন্টে। ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমে ঢুকতেন এবং স্নান করে সাহেবি সুট পরে ব্রেকফাষ্ট করতেন, তার মত মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভাল মানুষ আমার জীবনে খুব কমই চোখে পড়েছে। ছাত্রদের ভালবাসতেন পুত্রের মত তাছাড়া ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যও করতেন নানাভাবে। আমরা অন্যায় করলে অনেক সময় জরিমানা করতেন আমাদের প্রভোষ্ট—বেশির ভাগ জরিমানা তিনিই দিয়ে দিতেন। কোন ছাত্র বিপদে পড়ে তার কাছে গেলে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। জাকির হুসেন (পরবর্তীকালে আই. জি. পুলিশ, পূর্ব-বাংলার গভর্ণর, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পরে আয়ুব খানের মন্ত্রীসভার সদস্য) সাব-রেজিস্টার চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন এবং স্যার এ. এফ. রহমানের নিকট থেকে "রিকমেণ্ডেশন সার্টিফিকেট" সেই দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে দেন। কিন্তু তবু তার চাকুরী না হওয়ায় ভাইস-চ্যান্সেলর ক্ষেপে যান এবং এ প্রসঙ্গ দার্জিলিং-এ গভর্ণর গ্রীষ্মকালে এলে তার নিকট উত্থাপন করেন। গভর্ণর ইন্সপেক্টর অব রেজিষ্ট্রেশনের নিকট কারণ জানতে চান। আই. জি. আর. গভর্ণরকে জানান যে জাকির হুসেনের দরখাস্তে তার নাম ও ঠিকানা ছিল না তাই তাকে ডাকা সম্ভব হয়নি। গভর্ণর এই উত্তর সন্তোষজনক মনে করেননি এবং কেন এ. এফ. রহমানকে সেটা জানানো হয়নি তার কারণ জানতে চান। চাকুরী যাবার উপক্রম দেখে আই. জি. আর. স্যার এ. এফ. রহমানকে ধরেন ফলে তিনিই আবার গভর্ণরকে বলে তার চাকুরী রক্ষা করেন এবং জাকির হুসেনকে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত করে দেন। স্যার এ. এফ. রহমান যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগ দেন তখন অনেক হিন্দু, মুসলমান ছাত্ররাই তার জন্য চোখের জল ফেলেছিল।

ঢাকা শহরে এ সময়ে কয়েকটি ছবিঘরে বিদেশী ও স্বদেশী ছবি দেখান হচ্ছিল—উদয় শঙ্করের দল পিকচার প্যালেসে নাচ দেখাতে এসেছিলেন কেউ নাচের মুদ্রা বুঝেছিলেন বলে মনে হয়নি—আমার কাছেও অনেকগুলো নাচ দুর্বোধ্য ঠেকছিল। ঢাকায় শীতের দিনে সার্কাসের সমাগম হতো নানা দেশ থেকে। সবচেয়ে বেশি নাম করেছিল

রাশিয়ান সার্কাস পার্টি। মুকুন্দ দাসের যাত্রা পূজার সময় ঢাকায় আসত, মুকুন্দ দাসের আসল নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর—পিতা ছিলেন বরিশালে কোর্টের আর্দালী। যাত্রাদল গঠন করার পর নাম নিয়েছিলেন মুকুন্দ দাস, যাত্রার ভিতর দিয়ে বৃটিশ রাজের চোখে ধূলি দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যতদিন না কলকাতায় ১৯৩৪ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুকুন্দ দাসের পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বানরী গ্রামে। সেখানেই তার জন্ম।

সুভাষ বোসের "বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস" দল ঢাকায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের লোকদের একত্র করার চেষ্টা করে অনেকটা সফলতা লাভ করেছিলেন। সুভাষ বোস ঢাকায় এলে থাকতেন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ি বান্ধব কুটিরে। বান্ধব কুটির ছিল আরমানিটোলা ময়দানের কাছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ "বান্ধব" কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, আমার যতদূর জানা বান্ধবের (৫ম খণ্ড) বৈশাখ ভাদ্র সংখ্যা ১৯০৬ সনে শেষ বারের মত বের হয়েছিল।

ঢাকার বাড়িগুলোতে তখনো সিমেন্টের বা লোহার রডের ব্যবহার আরম্ভ হয়নি। সবাই কাদা-শুরকী দিয়ে বাড়ি তুলতেন—বলা হতো গঙ্গা-যমুনা গাঁথনী। ঢাকা জেলায় পাকের নাম ছিল। শহরে মেয়ে বাবুর্চিদের বলা হতো "মামা"—তারাই বেশির ভাগ মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে পাকের কাজ করতো। বেটাছেলে বাবুর্চী রাখার রেওয়াজ তখনো হয়নি। চকবাজারে লচ্ছি, কাশ্মিরী চা, সবই পাওয়া যেত, নানা প্রকার সরবৎ তৈরী হতো গরমের দিনে। চকবাজারে মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের ও লালবাগে মাওলানা ওবায়েদুল ওবায়েদি আল সোহরাওয়ার্দী সাহেবের করব রয়েছে। দু'জনই আরবী ও ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

হিন্দু পাড়ায় আনন্দের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি যেমন, থিয়েটার, ঝুলন, যাত্রা গান, কীর্তন, ভজন এমনি সব। হিন্দুদের বাড়িগুলোও বেশ পরিষ্কার ছিল—লোকে বলত হিন্দুর বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি ও সাহেবদের গাড়ি। অর্থাৎ হিন্দুর নজর থাকত বাড়ির দিকে, সাহেবের গাড়ির দিকে আর মুসলমানের খাবারের দিকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো প্রফেসর যারা প্রথম দিকে যোগ দিয়েছিলেন তারা অনেকেই অনেক দিন শিক্ষকতা করে গেছেন—ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২১ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত, কাজী মোতাহার হোসেন ১৯২১ সন থেকে এ লেখার সময় পর্যন্ত শিক্ষকতা কাজে রয়েছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু ১৯২১ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত ছিলেন—তার ঢাকায় থাকার আরও ইচ্ছা ছিল কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব তাকে পুনরায় চাকুরীতে রাখার বিরোধিতা করেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার অব্যবহিত পরেই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পান তারা ছিলেন স্যার আবদুর রহিম, স্যার যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎ চ্যাটার্জী। শরৎ বাবু ছিলেন দাবা খেলায় কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের বন্ধু। তিনি জগন্নাথ হলে বক্তৃতা করেছিলেন। যে বছর ডাক্তার সানইয়াৎ-সেনের পত্নী ম্যাডাম সুং চিং লিং ডক্টরেট লাভ করেন। সুং চিং লিং-এর ইংরেজী উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গি ছিল

অত্যন্ত মার্জিত, আমি আর কোন নয়াচীনের নেতাকে এত ভাল ইংরেজীতে বক্তৃতা কবতে শুনিনি।

অঙ্কের প্রফেসর এস. এম. বোস তার ছাত্রী ফজিলতন নেছার প্রতি একটু অতিমাত্রায় আকর্ষণ দেখাবার ফলে পার্শীর প্রফেসর ফিদা আলী খান তাকে অপমানের চূড়ান্ত করেছিলেন। ভাগ্য ভাল এর কিছুদিন পরেই ডক্টরেটের জন্য ফজিলতন নেছা বিলেত চলে যান। বিষয়টাও ধামাচাপা পড়ে। এরপর যে মেয়েটি আদর্শ স্থাপন করেন তিনি আমাদের সমসাময়িক করুণাকণা গুপ্তা—ইতিহাসের ছাত্রী, ডক্টর ইউ. সি. গুপ্তের কন্যা। সাধারণ পোশাকে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা পরে, এক গাদা বই বুকে চেপে করিডর দিয়ে হেঁটে যেতেন। দেখতেও বেশ ভাল কিন্তু তার এমনি এক ব্যক্তিত্ব ছিল যে কেউ তার কথা নিয়ে কুৎসা বা অন্যায় আলোচনা করেনি। এর পরের বছর একদল মেয়ে এল—একই সঙ্গে—তাদের মধ্যে সরোজ, রেনু, প্রতুল, মীনা ও শান্তি অনেকটা নতুন যুগের ছাপ নিয়ে এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা থিয়েটার করত, দল করে ছেলেদের উত্যক্ত করত। শেষ দিকে শান্তি ইংরেজীর অধ্যাপক মন্মথ বাবুকে বিয়ে করলেন আর অপূর্ব কাণ্ড করে বসলেন বাংলার হেড্ অব দি ডিপার্টমেন্ট সুশীল দে—মীনা দে চৌধুরাণীর প্রতি বৃদ্ধ বয়সে অনেকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, ফলে মীনাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হলো।

আমি বেলা দুটোর পর ক্লাসে প্রায়ই ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতাম টেনিস খেলতে। ইন্ডিয়ান ইকনমিকস্ পড়াতেন আয়ার বলে এক মাদ্রাজী প্রফেসর—তিনি বক্তৃতা করতেন কমপ্লেক্স ও কম্বাইন্ড বাক্য ব্যবহার করে—সোজা ইংরেজী যেন তিনি জানতেন না—তার সাথে আমার অবশ্যই দেখা হতো টেনিস লনে বিকেলে—তার পার্টনার ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব। একমাত্র বি. সি. গুপ্তের বাড়ি ছাড়া কোথাও তখন মিকস্ড্ ডাবলস্ খেলা হতো না। বি. সি. গুপ্তের দু'কন্যা ইউনিস গুপ্তা কমলা গুপ্তা দু'জনেই ভাল টেনিস খেলত। বি. সি. গুপ্ত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আর একটি বাড়িতে মিকস্ড্ ডাবলস খেলা হতো সেটা ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মি: দাস গুপ্ত তার কন্যা বাণী দাস গুপ্তার বাড়ি। অবশ্য শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য প্রায়ই খেলতে পারত না।

আমাদের সময় হাজী রমিজুদ্দীন পর পর দু'বছর স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আর বাচ্চু মিঞা ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস সব খেলায় প্রতিভার ছাপ রেখেও ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। এদিক থেকে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না, প্রয়োজন হলে মারামারি করাতেও পিছপা হতেন না—তবে "ইসলামিক স্টাডিজ"-এর ছেলেদের বিদ্রুপ করা ছিল তার একটা অভ্যেস—ফলে ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য প্রার্থী হয়েও কৃতকার্য হতে পারেন নি এবং পরাজয় বরণ করেছিলেন ইসলামিক ষ্টাডিজ-এর ছাত্র আহমদ হুসাইনের নিকট। মুসলিম হলের ছাত্রদের সে যুগে যারা সবচেয়ে বেশি আনন্দ যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথম নামকরণ করতে হয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যিনি ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে ঢাকার বাসিন্দাদের গান দিয়ে, গল্পে, হাস্যরসে সবাইকে মুগ্ধ করে

রাখতেন যতদিন থাকতেন। এখানে মুসলমান ছেলেরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন তাকে পেয়ে।

এর পরে যাদের নাম করা যায় তাদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, সারারাত গান গাইতে পারতেন কেবল পান খেয়ে।

দেশবরেণ্য নেতা যারা সে যুগে এসেছিলেন তাদের নাম করা যায়—স্যার আকবর হায়দারী, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, মিঞা স্যার ফজলি হুসেন, মীর্জা মোহাম্মদ ইসমাইল। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পর এম. এ. জিন্নাহ্। এর মধ্যে জিন্নাহ্ ছাড়া সবাই এসেছিলেন সমাবর্তন উপলক্ষে, এ ছাড়া এসেছিলেন সি. ডি. রেমন (নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন), এসেছিলেন শরৎ চ্যাটার্জী। তিনি কেন মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু লেখেননি তার কারণ বলতে গিয়ে দুটো জিনিসের উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মুসলিম সমাজের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান সম্প্রদায় বড় স্পর্শকতার, উপন্যাসে কোন মুসলমানকে অমানুষভাবে চিত্রিত করলে তারা সেটা সমস্ত সমাজের উপর আক্রমণ বলে মনে করেন এবং তার ফলে দেশে অশান্তি দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

১৯৩৬ সনে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নবজন্ম লাভ করে—জিন্নাহ্ সাহেব ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদের পর ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় কলকাতায় মুসলিম ছাত্ররা শ্রী-পদ্ম মনোগ্রামের বিরুদ্ধে এবং বন্দে-মাতারম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আবদুল ওয়াসেকের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে এবং ঢাকার ছাত্রদেরও ভিড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঢাকার ছেলেরা শ্রী-পদ্ম আন্দোলনে তেমন সাড়া দেয়নি। কারণ বোধহয় কলকাতায় মুসলমান ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু তাই আমাদের চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। সারা বাংলায় এক ঢাকা শহরেই মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় চল্লিশজন ছিল—ছাত্ররা সংখ্যালঘু হলেও অতটা সংখ্যালঘু ছিল না—তাই তারা যেমন ধূতিও পরত না—তেমনি হিন্দুরা ইচ্ছে করলেই কোন আদর্শ তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে এটা বিশ্বাস করত না। খেলাধুলায়ও তারা পেছনে পড়ে ছিল না—একমাত্র চাকুরী ক্ষেত্রে কিছুটা পেছনে ছিল আর সব ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের সমকক্ষ মনে করত।

এসময়ে আমরা বরঞ্চ বিলেতে কি হচ্ছে তাই নিয়ে বেশি আলোচনা করতাম। পঞ্চম জর্জের মৃত্যু এবং এড্‌ওয়ার্ডের সিংহাসনে আরোহণ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মাঝে এক অপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

১৯৩৫ সন আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ অধ্যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বছরও ঘটনাবহুল। মুসোলিনির ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) আক্রমণ। ১৯৩৫ সনের ভারত আইন (Government of India Act, 1935) বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত, জানুয়ারি মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু আর অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ।

এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ছবির নায়িকাদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসতেন। তবে প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন তিনি থেলমা লেডী ফারনেসের সঙ্গে।

থেলমার বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। চার বছর পর সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। তারপর তার বিয়ে হয় ভাই-কাউন্ট ফারনেসের সঙ্গে—এ বিয়েও টিকল না বেশি দিন। একদিন দেখা হলো তার এডওয়ার্ডের সঙ্গে এক কৃষি প্রদর্শনীতে। এডওয়ার্ড সেখানেই থেলমাকে নিমন্ত্রণ করেন এক নৈশ ভোজে। মিসেস সিম্পসন ছিলেন থেলমার বন্ধু। মিসেস সিম্পসনের বড় গুণ ছিল সে সদালাপী, মিষ্টভাষীনি এবং তার মধ্যে ছিল একটা প্রাণ-চাঞ্চল্য যা পার্টিতে তার দিকে আকৃষ্ট করত। থেলমা একদিন মিসেস ওয়ালিস সিম্পসনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এডওয়ার্ডের সঙ্গে। এটা বোধহয় ১৯৩০ সনের শেষের দিকে। এদিকে প্রেমজগতের আর এক দিক্‌পাল প্রিন্স আলী খান তখন মার্গারেটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটে। এমবেসী ক্লাবেও মার্গারেট প্রায়ই যেত—তারা যেখানে বসত ঠিক তার ডাইনের এক টেবিলে প্রায়ই রিজার্ভ থাকত এডওয়ার্ডের জন্যে যিনি আসতেন থেলমাকে নিয়ে ঐ ক্লাবে। সবাই জানত এডওয়ার্ড ও থেলমার প্রণয়ের কথা।

থেলমা ১৯৩৪ সনে তার বোন গ্লোরিয়াকে দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যায়। যাবার আগের দিন নৈশ ভোজে থেলমা ওয়ালিসকেও নিমন্ত্রণ করে। খাবার মাঝখানে ওয়ালিস থেলমাকে বললে,—

> "Oh Thelma, the littleman is going to be so lonely" "Well dear" was the answer, "You look after him for me while I am away. See that he does not get into ,mischief"

থেলমা দেশে ফেরার আগের রাতে একটা ছোট নৈশ ভোজে আলী খানের সঙ্গে একই টেবিলে খেতে বসে। পরদিন থেলমা জাহাজে চাপে লণ্ডন জাবার জন্যে। থেলমা তার কেবিনে ঢুকে দেখে তার ঘর লাল গোলাপে ভর্তি—সঙ্গে ছোট একটা চিঠি "See you in London'—Aly, you left too soon—Aly."

পরদিন সকালে যখন থেলমা প্রাতঃরাশে ব্যস্ত তার কেবিনে তখন টেলিফোন বেজে উঠল ঃ "Hellow Darling" থেলমার কাছে কণ্ঠস্বর অদ্ভূত চেনা মনে হলো। তার পরেই—"আমি আলী কথা বলছি—আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে হবে।" থেলমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল "কোথায় ? নিউইয়র্কে না পামবীচে ?" উত্তর এল "এ জাহাজেই—আমি কাজ শেষ করে ফ্লোরিডা থেকে উড়ে এসে সময় মত এসে উঠেছি এ জাহাজে—ফুলগুলো পছন্দ হয়েছে ?"

ইতিমধ্যে এডওয়ার্ড ওয়ালিসের অনেক নিকটে এসে গেছে। ওয়ালিস এখন এডয়ার্ডকে "ডেভিড" বলে ডাকতে শুরু করেছে। থেলমা আলীর সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যখন লণ্ডনে এল তখন এডওয়ার্ড সেদিনই থেলমার বাড়ি এল এক সঙ্গে নৈশ ভোজের জন্যে। তার চার পাঁচ দিন পরেই ফোর্ট বেলভেডিয়ারে থেলমা এল নৈশ ভোজে—এসে দেখল ভোজে ওয়ালিসও নিমন্ত্রিত—সে অবাক হয়ে গেল যখন এডওয়ার্ড খাবারের মাঝে 'ছালাদ পাতা' নিচ্ছিল ওয়ালিস তার হাত থেকে সেটা ফেলে দিল। সেই রাতেই থেলমার এডওয়ার্ডের সঙ্গে শেষ নৈশ ভোজ। ১৯৩৫ সনে মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে

১৯৩৬ সনের ২০শে জানুয়ারি পঞ্চশ জর্জ দেহত্যাগ করেন। এডওয়ার্ডের একদিকে সিংহাসন অন্যদিকে ওয়ালিস—তার ধারণা হলো যে যেমন করেই হউক এ সমস্যার সমাধান হবেই কিন্তু ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ ও প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন ওয়ালিসকে কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে ওয়ালিস তালাক চেয়ে কোর্টে দরখাস্ত করেছেন। এডওয়ার্ড মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন তা তার দাদু সপ্তম এডওয়ার্ডেরও ছিল। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া অনেক দিন বেঁচে থাকাতে কেলেঙ্কারী কিছু একটা হবার সময় পায়নি। ওডওয়ার্ড যদি ওয়ালিসকে রাণী কবার কথা না বলত তবে বিলেতের লোকের তেমন কিছু আপত্তি থাকত না। এটলীও বললেন যে দুবার বিবাহিতা মহিলাকে রাণী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। লণ্ডনের সাধারণ লোকে এ ঘটনায় বিচলিত হয়নি। তবু ১৯৩৬ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর পার্লামেন্টে বল্ডুইন তার মতামত প্রকাশ করলেন। এডওয়ার্ডের পক্ষে তখন সিংহাসন ত্যাগ করা ছাড়া আব কোন পথ রইল না। বিশ্বের চারদিকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা ছড়িয়ে পড়ছে তখন—লণ্ডনে প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে দেশের রাজা, অদ্ভুত এ কাহিনী—আরব্য উপন্যাসের গল্পকে হারিয়ে দিয়ে—ক্লিউপেট্রার প্রেমকে ম্লান করে রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিলেন—এমন এক সাম্রাজ্যের সিংহাসন যে রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তিনি লিখলেন,—

> "I, Edward the Eighth of Great Britain, Ireland, and the British Dominions beyond the seas, king emperor of India, do hereby declare my irrevocable determination to renounce the throne for myself and my descendants and my desire that effect should be given to this Instrument of Abdication immediately.
>
> In token whereof I have here unto set my hand the tenth Day of December, nineteen hundred thirty six, in the presence of the witnesse whose signatures are subscribed."

যাদের সই থাকল তারা তার তিন ভাই আলবার্ট, হেনরী, জর্জ। বি. বি. সি. থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,—

> "You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the Empire, which as Prince of Wales and Lately as King. I have tried for twenty five years to serve.
>
> But You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and discharge my duties as King as I would wish to do without the help and support of the woman I love."

তার বক্তৃতা আমাদের যুবকদের মনে এক অদ্ভূত রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল। কূটনৈতিক জীবনে ১৯৫৬ সনে আলী খানের নিকট শুনেছিলাম থেলমার গল্প, ওয়ালিসের স্বপ্ন—

দেখা হয়েছিল ডিউক অব উইনজার ও ডাচেস অব উইনজারের (এডওয়ার্ড ও ওয়ালিস) সঙ্গে তখন তারা বৃদ্ধ—যৌবনের কোন ছাপ নেই। আলী নিজে তখন বেগীনার প্রেমে মুগ্ধ—রীটা হেওয়ার্থের সঙ্গে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়েছিল ১৯৫৩ সনে কিন্তু কন্যা ইয়াসমিনকে দেখতে যেতেন। আলীর জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে যখন তৃতীয় আগা খানের মৃত্যুর পর দেখা গেল করিমকে উইলে চতুর্থ আগা খান বানিয়ে গেছে। আলী তখন ঋণে জর্জরিত তাই প্যারিসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকেন্দার মীর্জাকে ধরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হলেন জতিসঙ্ঘে। চাকুরীটা তার প্রয়োজন ছিল পাওনাদারদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ও জীবনের মান ঠিক বাখার জন্য।

ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে ১৯৩০ সনের পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ষোলঘর হাসারা ও কেয়টখালীতে হিন্দু মধ্যবিত্ত যুবকেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। বৃটিশ সরকার ডরসেটশিয়ার রেজিমেন্টকে ঢাকায় ক্যাম্প করার জন্যে পাঠায়। সমিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের সম্মুখে তারা ছাউনি ফেলে—বাঁশের ঘর উঠতে থাকে —নাম দেয়া হলো "প্লাসী ব্যারাক"। এ রেজিমেন্ট ষোলঘর হাসারায় বিভিন্ন জায়গায় মার্চ করে বেড়ায় আর স্কুলের মাঠে ক্যাম্প করে থাকে। দেশের মধ্যে সাধারণের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করা। কেয়টখালীর দ্বীজেন গাঙ্গুলীর দল তখন ধরা পড়ে মুন্সিগঞ্জে বিচারের সম্মুখীন। অনেক বড় বড় উকিল এসেছিল তাদের পক্ষে। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীশ দাস তাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার করত—তারা কখনো ছেলেদের হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দিত, কখনো বা সাইকেল ছেলেদের পায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে দিত। এসব অত্যাচার বেশি চলত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ও জগন্নাথ হলের ছাত্রদের উপর। একদিন কয়েকজন ছেলে যুক্তি করে জগন্নাথ হলের নিকট রাস্তার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকল—যখন শেতাঙ্গ সৈনিকদের একটা সাইকেলে চড়ে হৈ হৈ করে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আচ্ছা করে মেরে সাইকেলটি আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে পালিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। প্লাসী ব্যারাকে এ খবর পৌঁছা মাত্র অনেকগুলো সৈন্য সাদা পোশাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এল তাদের খোঁজ করতে। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলর ল্যাংলী সাহেব ঐ অনুসন্ধান কাজ চালাতে দিতে অস্বীকার করেন। বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরে তারা চলে গেল। সে দিন থেকে ছেলেদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও কমে এল।

ঢাকার বস্তি এলাকাগুলো ছিল খুব নোংরা, বস্তির ছেলেমেয়েরা রাস্তার ড্রেনের পাশে বসেই বাহ্যি প্রস্রাব সেরে নিত। বস্তির কলতলায় গরীব মুসলমান মেয়েদের মধ্যে গালাগাল, চুল ছেড়াড়েছি ছিল নিত্যকার ব্যাপার। অন্যদিকে হিন্দু মহল্লাগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঢাকা শহরে ছিল তখন প্রায় সাড়ে তিন শত মসজিদ আর বেশির ভাগই বড় রাস্তার পাড়ে অবস্থিত—এ কথাটা কারোই মাথায় যায়নি যে শহর বড় হলে রাস্তাও বড় করতে হবে—অথচ মসজিদ ভেঙ্গে রাস্তা বড় করা যাবে না। মসজিদে

তখন মুসল্লির অভাব হতো না। সাধারণ মুসলমানরা সারা দিন খেটে সন্ধ্যার সময়ে চা খানায় বসে মাঝরাত পর্যন্ত আজগুবি গল্প করতে ভালবাসত। চা কম হলে আপত্তি ছিল না—কিন্তু মালাই চাই—পাতলা দুধ দিয়ে তারা চা খেত না। চকবাজার ছিল তখনকার মুসলিম ঢাকায় যাকে বলে "সেন্ট্রাল এভিনিউ"। পরবর্তীকালে নিউ মার্কেট, বিপণি কেন্দ্রে যেমন লোকে মিছে মিছি ঘুরে বেড়াত সে যুগে সেটা দেখা যেত চকবাজারে। তবে চকবাজারের জৌলুস বাড়ত রোজার দিনে। সে যে কত রকমের জিনিস বানানো হতো "এফতার" করার জন্য। অবশ্য ১৯৭০—৭১ সনে সে চকবাজারের চেহারা একেবারেই বদলে গেল। সে ঘোড়ার গাড়িও নেই আর জমজমাট বাজারও নেই।

ঢাকা আসার পর আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে বাড়ি যেতাম কারণ যদিও মা মারা গিয়েছিলেন ১৯২৯ সনে আমার একমাত্র ছোট বোনটি থাকত আমার দাদী আম্মার কাছে। ও সৎ-মায়ের কাছে থাকত না। আমাদের গ্রামে গিলা আম ও অন্যান্য অনেক ভাল জাতের আমের গাছের কদর ছিল—প্রায় বর্দ্ধিষ্ণু বাড়িতে। ঝড়ের দিনে আম কুড়াবার ধূম পড়ে যেত। হিন্দু মুসলমান ছেলেরা দল বেঁধে আম কুড়াতো যেমনি হিন্দুদের নষ্টচন্দ্রায় মুসলমান ছেলেরাও চুরি করায় যোগ দিত। কিন্তু ধীরে ধীরে এ গ্রামে সে আনন্দে ভাটা পড়তে লাগল—প্রথম কারণ বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট যা ১৯২৯ সন থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবোধ কমে আসতে থাকে। আগে মুসলমান মৌলভিদের মধ্যে হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা নিয়ে বাহাস হতো—জেতা হারার প্রশ্ন বড় কথা ছিল না—সে গাঁয়ের মৌলভিই জিতত যে গ্রামের লোক সংখ্যায় বেশি বা পরাক্রমশালী। এর পর ওয়াহাবী মৌলানা সাহেবরা গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করে হিন্দুদের পূজা-পার্বনে যোগ দিতে বারণ করতে লাগলেন। থিয়েটার, যাত্রা এমনকি গ্রামোফোনের গান শোনাও হারাম বলে "ফতুয়া" দিতে লাগলেন। জমিদারদের অত্যাচার, মহাজনদের শোষণ, মাড়োয়ারীর চক্রান্ত যা করতে পারেনি তা এতদিনে সফল হলো।

আমাদের দেশের গ্রামগুলো ছিল ছোট ছোট দ্বীপের মত। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে আশরাফ আতরাফ ভাগ ছিল; নবাব বা নবাবীর পতন আমাদের পল্লী সমাজের যথার্থ বিপর্যয় ঘটাত না—তার নিজস্ব গতিধারার সময় কতকটা ব্যাহত বা পুষ্ট হতো মাত্র। পল্লীসমাজ ও পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন, জাতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা—এ তিনটি জিনিস তাদের জীবনধারাকে নির্দিষ্ট খাতে বেঁধে রাখত। মোটামুটিভাবে জমিদার, স্বাধীন তালুকদার যারা লাঠের খাজনা, সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা দিত তারা আশরাফ বলে গণ্য হতো—তারপর আসত সিকিমি তালুকদার, হাওলাদার ইত্যাদি, এগুলো বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতো মুসলিম সমাজে—আর হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ ছাড়াও চাকুরে, উকিল, ডাক্তার বিশেষ করে যারা শহুরে, ছুটিতে গাঁয়ে আসতো, তাদের সম্মান ছিল গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের চাইতে বেশি।

আমরা যখন স্কুলে তখন গ্রামের মধ্যে বিশেষ কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। কয়েক ঘর শহুরে হিন্দু ছাড়া বাকি গাঁয়ের হিন্দুরা ছিল কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কর্মকার, কাঠমিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, গয়লা, জেলে। মুসলমানদের মধ্যে তেমনিভাবে দু'চার ঘর

আশরাফ শ্রেণীর লোক বাদ দিয়ে বাকি লোকে জীবিকা উপার্জন করত চাষাবাদ করে বা কাপড় বুনে।

১৯২৫—২৬ সনে কলকাতা ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে হিন্দু মুসলমান প্রতিটি গ্রামই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যেতে থাকে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে হিন্দুদের মধ্যে যে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল মুসলিম সমাজে তা ছিল না। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে ফুটবল খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রতি গ্রামেই "টুর্নামেন্টের" ব্যবস্থা করা হতো এবং বিজয়ীদের কাপ অথবা শীল্ড দেয়া হতো।

বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা ও প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা আরো বেশি করে নিজেদের ভিন্ন জাতি বলে ভাবতে শুরু করল—আর তা আরো তিক্ত হয়ে উঠল হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের স্বার্থের দ্বন্দ্বে। হিন্দুরা আগে থেকে অফিস আদালত দখল করেছিল সেখানে মুসলমানদের স্থান করে নেয়া ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার—অথচ মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর সাধারণভাবেই তাদের স্থান করে নিতে বদ্ধপরিকর। এ সংঘাত এড়াবার কোন উপায় ছিল না—১৯২৩ সনে দেশবন্ধু ও পরবর্তীকালে বি. সি. চ্যাটার্জী এ সমস্যার একটা সমাধান দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু কংগ্রেস নেতৃত্বে সমাসীন হবার পর সে সমাধান গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না—কারণ বোধহয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতিন্দ্র মোহন সেন পূর্ব-বাংলার লোক ছিলেন বলে এ সমস্যাটাকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন—সুভাষ বাবু পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দা হয়ে সেটাকে অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি সর্ব-ভারতীয় হিন্দু নেতাদের মতই সত্য বলে গ্রহণ করলেন যে বৃটিশ সরকারই এ সাম্প্রদায়িকতার জন্যে দায়ী। সুতরাং বৃটিশ দেশ ছাড়লেই ঐ সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যাবে। Sir J. R. Seely-র কথায়,—

> "Politics without history has no root and history without politics has no fruit."

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে যত আন্তর্জাতিক ঘটনা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছিল তার মধ্যে ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় অন্যতম। এর পূর্বেই শুনেছিলাম মুসোলিনির উত্থান—ফ্যাসিজম। কিন্তু হিটলার আমাদের কাছে ছিল বেশি প্রিয় কারণ হিটলার যেখানে আমাদের শত্রু শিবির অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গকে শেষ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেখানে মুসোলিনি বেছে নিল একটি আফ্রিকান দেশ—আবিসিনিয়া। তাছাড়া লেনিন-ষ্ট্র্যালিনের কথাও ভেসে এসেছে কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের লেখা বই আসতে দিতেন না—যারা গোপন রাজনীতি করত—তারাই তাদের কথা বলেছে। সুতরাং তারা রয়েছে কিংবদন্তির মধ্যে নিহিত। হিটলারের ইহুদী বিতাড়ণের মধ্যে আমাদের দেশের মহাজনের উৎখাতের আন্দোলনের যেন একটা মিল খুঁজে পেলাম। শাইলকরা আর খাতকের দেহের মাংসটুকু কেটে নিতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা ষ্টেটসম্যান ছাড়াও মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও কেউ কেউ সওগাত ও মোহাম্মদীর পাঠক ছিলাম। ঐ 'মডার্ণ রিভিউতেই একদিন জহরলালের বিরোধী একটা লেখা বেরুল। দেশের সবাই যখন তাকে সম্মানের

চোখে দেখছে তখন এমনি করে নেহেরুর নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেখা আর সে লেখা 'মডার্ণ রিভউ'তে প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই একটু অবাক হলো—লেখকের নাম ছিল না—লিখেছিল—"চানক্য" নামে, তাকে বলা হলো আত্ম-অহংকারী, শাহী মেজাজী ইত্যাদি। পরে অবশ্য জানা গেল—লেখা নেহেরুর নিজেরই—আত্ম সমালোচনা। পরে দৈনিকে বেরুল "Jaharlal As He saw Himeslf", আশ্চর্য বিশ্লেষণ একজন শক্তিমান রাজনৈতিক নেতার।

সহ-শিক্ষা সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছে। সহ-শিক্ষার দোষগুণ দুটোই চোখে পড়েছে। অল্প সংখ্যক বকাটে ছেলেরা মেয়েদের উত্যক্ত করত—আবার ছেলে-মেয়েদের সহজ ও নির্দোষ বন্ধুত্বও গড়ে উঠত। আমার তৎকালীন যে সকল বান্ধবীদের কথা আজো মনে আছে তাদের মধ্যে ছিল নারায়ণগঞ্জের উকিল শশি দত্তের মেয়ে কিরণ বালা দত্ত—দাস গুপ্তের মেয়ে বাণী দাস গুপ্তা। ভারত বিভাগ হবার পর কিরণের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি—তবে কলকাতা ব্রবোর্ণ কলেজে দর্শনের অধ্যাপিকার পদ গ্রহণ করার পর আমাকে খবরটা জানিয়েছিল। বাণীর ভাই তাদের বাড়ি কালিঘাট থেকে জানিয়েছিল যে বাণী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

আমাদের সময় প্রথম যুগে ছায়াছবি ছিল নির্বাক। আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের দেশে শরৎ চ্যাটার্জীর 'ষোড়শী'ই প্রথম সবাক বাংলা ছবি। ঐ ছবিটার সাথে তুলনা করা যায় পাকিস্তান হবার পর ঢাকায় "মুখ ও মুখোশ" ছবির সঙ্গে—যাকে বলা যায় চিত্র জগতে হাতেখড়ি। তখনকার দিনে রঙ্গ মঞ্চে যাদের কথা আমার মনে পড়ে তারা হলেন অভিনয়ে শিশির ভাদুরী, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, গানে কৃষ্ণলাল দে, কানন দেবী—ইংরেজী ছবিতে গ্রেটা গার্বো, এ্যান হারডিং, নর্মাশিয়ার, মার্লিণ ডিট্রিক, ক্লদেত কোলবার্ট, হামফ্রে বোগার্ট, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক, চার্লী চ্যাপলিন, লরেল ও হার্ডী, বাকসটার কিটন, জন ওয়াসিমুলার প্রভৃতি।

সেই যুগে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। তিনি বলতেন যে বাংলার মুসলানরা কেন যে নিজেদের বাঙ্গালী মনে না করে আরব বা পারস্যের লোক মনে করে তা তিনি বুঝতে পারেন না। দেশে যখন ঝড়-ঝঞ্ঝা হয় বা বন্যায় দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা প্রায়ই হয় এ দেশে, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্যে—তাতে ধনী মুসলমানরা চাঁদা দেবে না—তাদের নেতারাও তাই, অথচ যেই শুনল তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছে বা তুরস্কের খলিফা বিপদাপন্ন তখন এরা যার ঘরে যা আছে সবই দিয়ে দিতে পারে—এমনকি লড়াই কাকে বলে তা না জেনেই শুধু প্রাণ দেবার জন্যেই সেখানে চলে যায়—অথচ দেশের বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের তিন-চতুর্থাংশ চাপ পড়ে মুসলমান সমাজের উপর। এ জন্যেই লালা লাজপত রায় ও ডাক্তার মুঞ্জে প্রভৃতি মুসলমানদের ভারতীয় বলে স্বীকার করতে চান না। তারা মনে করেন যে মুসলমানরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নয়। তারা ভারতের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ভাল চায়—অন্য কথায় তারা দেশের শত্রু।

ঢাকায় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে তখনো রাজনৈতিক চেতনা আসেনি। আবদুল ওয়াসেক কয়েকবার ঢাকা এসেছে কিন্তু কোন ছাত্র সংগঠন করতে পারেনি। তবে ১৯৩৬ সন থেকে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়—১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্য করে।

তখনই দৈনিক আজাদ বের হয়, নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন, গায়ক আব্বাস উদ্দীন এদের সাফল্যে মুসলমানরা গৌরবান্বিত বোধ করতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পূর্বেই আমার মনের মধ্যে রাজনীতি করার বাসনা জাগ্রত হয়। এর কারণ একটা ব্যক্তিগত অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ১৯৩৬ সনে আমি গ্রীষ্মের বন্ধে আমাদের গাঁয়ের বাড়ি যাই। একদিন অন্দর বাড়িতে বসে গল্প করছি এমন সময় কে আমাকে খবর দিলে যে আমার একজন বৃদ্ধ আত্মীয় সৈয়দ আহমদ সাহেবকে চৌকিদার ও দফাদাররা থানায় নিয়ে চলছে সঙ্গে এক ভদ্রলোক আর একজন কনষ্টেবল। আমি বৈঠকখানার চত্বরে এসে দেখলাম যে সত্যিই তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার ছোট ভাইকে পাঠালাম তাদের ফিরিয়ে আনতে। কারণ আমার সে আত্মীয়টি বহুদিন যক্ষ্মারোগে ভুগছিল এবং মরণের দিন গুণছিল—এককালে তাদের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু ইদানিং তারা দরিদ্রতার মধ্যে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে। প্রথম তারা আসতে রাজী হয়নি পরে বোধ হয় চারি দিকে অবস্থা বুঝে ফিরে আসল, ভদ্রলোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে আপনি ?" উত্তর দিল আমি মুন্সীগঞ্জ কোর্টের নাজীর। আরো প্রশ্ন করে জানলাম যে বিগত কয়েক বছর যাবত সৈয়দ আহমদ সাহেব লাঠের খাজনা দিযে যাচ্ছে কিন্তু কোন সেছ-ই দেয়নি—ফলে "বডি ওয়ারেন্ট" দিয়ে তাকে ধবে নিয়ে যেতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েছে। আমি নাজির সাহেবকে অনেক করে বুঝালাম যে বকেয়া টাকা পরিশোধ আমি করে দিচ্ছি তাকে ছেড়ে দেয়া হউক কারণ তার অবস্থা এমন যে থানা পর্যন্ত নেবার পূর্বেই সে রক্ত বমি করে মরে যাবে। প্রথমে নাজীর রাজী হয়নি পরে অনেক অনুরোধে রাজী হলো। আমি তার বকেয়া টাকা পরিশোধ করে একখানা রসিদ রেখে লোকটিকে মুক্ত করলাম। আমার তখন জানা ছিল না যে এ সব ব্যাপারে কেবল সরকারী পাওনা টাকা দিয়ে দিলেই ঋণ শোধ হয় না—যারা পরিশ্রম করে ধরতে আসে তাদেরও খুশী করতে হয়। এটা অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতার অভাব। যা হউক সপ্তাহখানেক পরেই আমাদের থানা থেকে খবর পেলাম যে আমার নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে তবে থানার দারোগা যেহেতু আমাদের চিনত তাই আমাকে খবর পাঠিয়েছে যত শীঘ্র সম্ভব মুন্সিগঞ্জ মহকুমা হাকিমের কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিনের দরখাস্ত করতে। আমিতো হতবাক। দারোগা সাহেবের কথা অনুসারে আমি সেদিনই মুন্সিগঞ্জে গিয়ে পরের দিন মহকুমা হাকিমের কোর্টে উপস্থিত হই। মহকুমা হাকিম ছিলেন এ. বি. গাঙ্গুলী, আই. সি. এস। তিনি ছিলেন মফস্বলে—টুরে। সেকেন্ড অফিসার ওয়াজির আলী সাহেবের কোর্টে নিয়ে গেলেন আমাকে অর্ধ ডজন মোক্তার সাহেবগণ, তাদের মধ্যে ছিলেন এমদাদ মিঞা, আবদুল হাদী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় মোক্তার সাহেবরা। ওয়াজির আলী সাহেবতো ঘটনার কথা শুনে নাজিরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন—নাজিরকে ডেকে আনা হলো। ওয়াজির আলী সাহেব ছিলেন এ. কে. ফজলুল হকের জামাতা। তিনি কোর্টের মধ্যেই নাজিরকে গালাগালি করে তখনই মামলার নালিশী দরখাস্ত তুলে নিতে বললেন এবং আমার নিকট ক্ষমা চাইতে বললেন। তিনি আমাদের পরিবারের সবাইকে জানতেন। আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন। বিকেলে বাড়ি ফেরার আগে শুনলাম যে মিষ্টার এ. বি. গাঙ্গুলী ফিরেছেন সবাই বললে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে। এমদাদ মিঞা আমাকে

তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি সন্তান তাও একটু বাড়িয়ে বললেন কিন্তু মহকুমা হাকিম বাবু রুক্ষ মেজাজে আমাকে বললেন, "Youngman the incident was regrettable. Anyway you have been already discharged so I should refrain from offering any comment on the case". দেখলাম ছোকড়া আই. সি. এস.-এর বুদ্ধির দৌড়—আরো বুঝলাম ভাগ্য আমার ভাল ছিল। গাঙ্গুলী বাবু থাকলে খালাস পাওয়া দূরের কথা জামিনও পেতাম কিনা সন্দেহ। খুব শিক্ষা হলো। বোধহয় সেই থেকে আমলাদের শাসন কার্যের উপর আমার আর কোনদিন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারিনি। ভাবলাম এদের সঠিক পথে আনার প্রয়োজনেই আমার ওকালতি ও রাজনীতি করতে হবে। সবেমাত্র আইন ক্লাশে ভর্তি হয়েছি তখন।

কিন্তু মানুষ যা আশা করে তাতো সব সময় হয়ে উঠে না। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে পিতার "ষ্ট্রোক" হয়ে বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। ষ্ট্রোকের মোটে চৌদ্দ দিন পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র আটান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মার মৃত্যু হয়েছিল সাত বছর আগে তখনো আমি তার পাশে থাকতে পারিনি। বাবার মৃত্যুর সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি যেদিন বাড়ি পৌঁছলাম সেদিন সকালেই তার দাফন কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। দাদী আম্মা ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন—তবু আমাকে ডেকে বললেন, "তোমাদের সম্পত্তির অংশ তোমরা লিখে নিয়ে যাও। সাব-রেজিস্টারকে ডেকে আন, সম্পত্তির খবর আমি কিছু জানতাম না—তবু দলিল করা হবে বলে আমি ঢাকায় চলে এলাম। মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমরা চার ভাই এক বোন—দায়িত্ব আমার। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে পরের সপ্তাহে দেশে গিয়ে শুনলাম দাদী আম্মার হাতে একটা ইরিসিপ্লাস হয়েছিল, অসাবধানতায় সেটার মুখ ভেঙ্গে যায়। আর ডাক্তার কোন ব্যবস্থা করার পূর্বেই পিতার মৃত্যুর সাতদিন পরে তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন। বুঝলাম ভাইবোনদের নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে—চাচারা যে লিখে দেবেন না তা জানতাম—তবু চেষ্টা করেছিলাম—ফল হয়নি।

আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা চাকুরীর খোঁজ করার প্রয়োজন দেখা দিল কিন্তু ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা হবার পূর্বে মুসলমান ছেলেদের পক্ষে চাকুরী পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনের সাফল্যের উপর আমাদের মত মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মুক্তি এ ধারণা থেকে মুসলিম লীগে যোগ দিই এবং নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি সুতরাং ছাত্রদের সঙ্গে বরিশাল রওয়ানা হলাম। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব সব মুসলমান নেতাদের সঙ্গে মিশে জিন্নাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে এক পার্টি হিসেবে প্রার্থী মনোনয়ন করবেন এটা আমরা আশা করেছিলাম কিন্তু ফজলুল হক সাহেব আলোচনার মাঝখানে মাদারীপুরে এক মামলা উপলক্ষ্যে চলে যান এবং সেখান থেকেই বিবৃতি দেন যে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেবেন না—প্রজা পার্টীর মনোনয়ন দেবেন। মুসলিম লীগের নেতারা দুই কারণে বিপদে পড়লেন। প্রথমে ফজলুল হক সাহেব ঘোষণা করলেন যে মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন যেখানে প্রার্থী হবেন

তিনিও সেখানে দাঁড়াবেন। সুতরাং নাজিমুদ্দীনের জন্যে এমন একটি আসন চাই যেখানে নবাবদের প্রভাব বিস্তর—অর্থাৎ তাদের জমিদারীর মধ্যে। ঠিক হলো তাকে পটুয়াখালী আসন থেকে প্রার্থী মনোনয়ন করা হবে। আর একটি হলো ফজলুল হক সাহেব ১৯২৪ সনে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন—হিন্দু কংগ্রেসের চাপে সেই থেকে তিনি বাংলার মুসলমানদের কাছে "আমাদের হক সাহেব" হয়ে রইলেন। উপরন্তু নাজিমুদ্দীন বাংলা জানতেন না—তার উর্দু বক্তৃতা বাংলার জনসাধারণের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রদল বরিশালের দশমুনিয়ার আবদুল হাদী তালুকদারের নেতৃত্বে পটুয়াখালী পাঠান হলো। পিরোজপুরে আমাদের প্রার্থী ছিলেন একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লেহাজুদ্দীন সাহেব—তার পক্ষে ফজলুল হককে হারান সম্ভব ছিল না—তবু ফজলুল হককে বিব্রত রাখতে পারলে নাজিমুদ্দীনের উপর চাপ কমে যাবে এ ধারণা নিয়ে সেখানেও ছাত্রদের পাঠান হলো। এদিকে নবাব বাড়ির খানদানে অনেকগুলো মনোনয়ন দেয়ায় ফজলুল হকের সুবিধা হলো—তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন এবারকার নির্বাচনে স্থির হবে বাংলার পরিষদে বাঙ্গালী থাকবে না অবাঙ্গালীর রাজত্ব তৈরি হবে। নবাব বাড়ি থেকে যারা মনোনয়ন পেলেন তারা হলেন ঃ—

১. নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ্
২. নওয়াবজাদা খাজা নছরুল্লাহ্
৩. খাজা নাজিমুদ্দীন
৪. খাজা শাহাবুদ্দীন
৫. ফরহাত শাহাবুদ্দীন
৬. সৈয়দ আবদুল হাফিজ
৭. সৈয়দ আবদুস সলিম
৮. সৈয়দ সাহেবে আলম
৯. খাজা নুরুদ্দীন
১০. খাজা ইসমাইল।

বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানরা দেখতে পেল যে যতদিন খাজা সাহেবদের হাতে নেতৃত্বে থাকবে ততদিন শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনীতিতে স্থান হবে না। ফলে একদিকে মুসলিম সংহতি অন্যদিকে একদল অশিক্ষিত খাজার নেতৃত্বে—বাংলার মুসলমানের অন্ধকার ভবিষ্যৎ—এ দুয়ের মানসিক সংঘাতে মুসলমান ভোটাররা কোন কিছু মনস্থির করতে না পেরে আবোল তাবোল ভোটিং হয়ে গেল—ফলে কোন পার্টিই জিতলো না। নাজিমুদ্দীন সাহেব পরাজিত হলেন। প্রবাসী লিখল যে, "বাঙ্গালী ফজলুল হকের নিকট অবাঙ্গালী নাজিমুদ্দীনের পরাজয় স্বাভাবিকই হয়েছে।" দেশের সব দুঃখের জন্যে তাকে দায়ী করা হলো—এমন কি কাউখালী ষ্টীমার স্টেশনে লোকদের আলোচনা থেকে বুঝলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের সব ট্যাক্সের জন্যে—বিশেষ করে তামাকের ট্যাক্সের জন্যে নাজিমুদ্দীনকেই দায়ী করা হলো। এর আরো কারণ ছিল মুসলমানদের নিকট নাজিমুদ্দীনকে ভোট দেবার জন্যে গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের আপিল। এতে প্রমাণ হলো গভর্ণর তার বুদ্ধিতেই চলে।

এ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ায় জনাব ফজলুল হক সাহেবকে নেতা করে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করা ছাড়া উপায় ছিল না। রাজনীতির নেশা একবার ধরলে তাকে আর ছাড়তে চায় না—আমাকেও ছাড়েনি বহু বছর। অথচ দেশ থেকে টাকা আনা তো সম্ভবই ছিল না—উল্টোদিকে আমার উপর চাপ আসতে লাগল—পয়সা উপার্জন করা প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সাময়িকভাবে চাকুরী করি আবার ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করি। কিন্তু এভাবে চলছিল না। তাই ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসে যখন আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক—আরমানিটোলা স্কুলের হেডমাস্টার আমাকে বললেন যে স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক হেক্টর ডেনিয়েল দু'বছরের ছুটিতে বিলেত গেছেন ডিপ্লোমা লাভের জন্যে এবং আমি ইচ্ছে করলে তার স্থলে কাজ করতে পারি। আমি রাজী হয়ে গেলাম কারণ প্রথমতঃ আয়ের একটা পথ হলো সম্মানিত চাকুরীও হলো আর ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকালে হয়ত আইনও পড়া যাবে। একমাত্র অসুবিধা সেখানে যে সরকারি চাকুরে হবার পর সরকারের অনুমোদন ছাড়া আইন ক্লাশে ভর্তি হতে পারব না। নিজেদের বাসায় থাকব তা ছাড়া বেচারামের দেউরীর বাসা থেকে তিন মিনিটের পথ আমার স্কুল অর্থাৎ স্কুলটি আমার মহল্লায়। এ সুবিধা কলকাতা গিয়ে বা অন্যস্থানে বড় চাকুরীতে যোগ দিলেও পাওয়া যাবে না—কারণ বাড়ি ভাড়া ও চাকর-বাকর রেখে যে খরচ হবে তাতে মাইনের টাকাটা প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৯ সনে চাকুরীতে যোগ দিই। আমার জীবনের পাঁচ বছরের শিক্ষকতা আমার পরবর্তীকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে। তার চেয়েও বড় কথা যে কেমন করে অল্প বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মেশা যায় সে সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ হলো। আমার সে পাঁচ বছরের ছাত্রদের মধ্যে এখন অনেকে সমাজের উঁচু স্তর অলঙ্কৃত করে আছে—আমি তাদের নিয়ে গৌরব করি—তারাও আমাকে চির জীবন শ্রদ্ধা করে এসেছে। কারো কাছ থেকে এতটুকু অশ্রদ্ধা পাইনি। সে পাঁচ বছর আমার জীবনের স্বর্ণযুগ, কারণ এরপর কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি কূটনৈতিক জীবনে, কি ওকালতি ব্যবসায়ে, শত্রুমিত্র দুইই হয়েছে—অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তাদের সবার শ্রদ্ধা পাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে আর হয়নি।

আমি আগেই বলেছি—রাজনীতি একটা নেশা—এ নেশায় যে মাদকতা আছে তা বুঝি অন্য কোন পানাহারেও নেই। তাই যদিও খোলাখুলি রাজনীতি আমার বন্ধ হলো কিন্তু রাজনৈতিক জীবন থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সবাই বলত "Man behind the secen" কিন্তু আসলে আমি দেশকে ভালবেসেছিলাম, ভালবেসেছিলাম আমার সমাজকে—অন্তর দিয়ে দেশ বা দশের জন্যে কিছু করতে পারিনি সারা জীবনে কিন্তু আজো কিছু করার জন্যে অন্তর আমার গুমরে গুমরে কাঁদে। স্টটের ভাষায়,—

*"Breathes there a man with soul so dead*
*Who never to himself hath said*
*This is my own, my native land" ?*

# রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব

আমরা শিক্ষকতা জীবন অত্যন্ত অল্পদিন। বাষট্টি বছরের জীবনে মোটে পাঁচ বছর। আর সে পাঁচ বছরও নির্ভেজাল শিক্ষকতা নয়। তার কারণ ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের ও মন্ত্রীসভা গঠনের পর বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা নতুন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ দেখা দেয়। যে সমাজ এতদিন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল সে সমাজ সমস্যা-সচেতন হয়ে আত্মা-প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো। পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন,—

> "Even the poorest peasant added to his feeling of self-respect and self-reliance. For the first time he felt that he counted and could not be ignored. Government was no longer an unknow and intangible monster, separated from him by innumerable layers of officials, whom he could not easily approach and much less influence, and who were bent on extracting as much out of him as possible. The seats of the mighty were now occupied by men he had often seen and heard and talked to."

পরিষদের সদস্যরা তাদেরই গাঁয়ের লোক তাদের ভোটেই পরিষদের সদস্য কেউ কেউ মন্ত্রী বা অন্যকিছু আর তাদের হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী যাকে সব জেলার লোকে দেখেছে—জেলা জজের কোর্টে ফৌজদারী মামলা করতে—গল্প করতে—লোক হাসাতে। ১৯৩৭ সনে সাধারণ লোক যারা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ যারা ছিল শোষিত, অবহেলিত, পদদলিত, নির্যাতীত, যারা জমিদারের খাজনার দায়ে জমিদারের কাছারীতে আটক রয়েছে, দৈহিক শাস্তি পেয়েছে, যারা মহাজনের চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ কোন দিন শোধ করতে পারেনি বলে সর্বস্ব হারিয়েছে—যারা সারা বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ধান, পাট ঘরে তোলার পূর্বে ক্ষুধার তাড়নায় অর্ধেক দামে বিক্রি করেছে ব্যবসায়ীর কাছে—কারণ ক্ষুধার জ্বালায় সে দাদন নিতে বাধ্য হয়েছে। গাঁয়ের দরিদ্র অনার্য্য হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান যেন স্বর্গ হাতে পেল ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা শপথ নেয়ার পর। ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে সুরেণ ব্যানার্জী ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বর্ণ হিন্দু সমাজ যে সংগ্রাম করেছিল—যারা ১৯১১ সনের বৃটিশ সরকারের ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগতম জানিয়েছিল—তারাই যখন দেখল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে গেল তখন তারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা ভুলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারে ব্যস্ত হলেন। পণ্ডিত নেহেরু লিখেছেন,—

"Thus the intelligentsia of Bengal, which had played such a notable part in Indian politics and struggled for freedom, suddenly realized that it had very weak position in the Provincial Legislature fixed and limited by statute."

এ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে কংগ্রেসও কম দায়ী নয়। গভর্ণর প্রথমে শরৎ বোসকেই ডেকেছিলেন মন্ত্রীসভা গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে, কারণ তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কিন্তু তিনি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে অস্বীকার করেন।

ফজলুল হকের প্রজা পার্টিকে তিনি ও তার দল সমর্থন করতে রাজী হলেন—শর্ত দিলেন যে ফজলুল হককে তাদের পার্টির কর্মসূচী মেনে চলতে হবে। হক সাহেব রাজী হলেন—তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির সদস্যদের এ সুসংবাদ দিলেন এবং আরো জানালেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন না—কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন একটা কর্মসূচীর ভিত্তিতে। সে কর্মসূচীর বিরুদ্ধে তার দলের কেউ আপত্তি করলেন না—তবে তাদের মত হলো যে প্রথম শর্তটি বিলম্বে কার্যকরী করা হবে। প্রথম শর্তটি ছিল "সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি।" তাদের যুক্তি হলো যে এ শর্তটি কার্যকর করতে গভর্ণর রাজী হবেন না ফলে হক সাহেবকে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে হবে নয় সাহসের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে। কৃষকের জন্য কোন কাজ না করে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলে তাতে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে—ফজলুল হক সাহেব এ যুক্তি মেনে নিলেন এবং কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে কোন ফল না পেয়ে রাত দশটার সময় শরৎ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তার বাড়ি যান—কিন্তু শরৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলো না যেহেতু তিনি তখন শুইয়ে পড়েছেন, ফজলুল হক তার দলের লোকদের কাছে ছোট হয়ে গেলেন এবং বাড়ির পথে পা বাড়ালেন ঠিক তখনই মুসলিম লীগের কাছ থেকে তার নিকট প্রস্তাব পাঠানো হলো যে মুসলিম লীগ তাকে নেতা বলে স্বীকার করতে রাজী আছে এবং তিনিই কোয়ালিশন সরকারের মুখ্য মন্ত্রী হবেন। প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন, এবং পরের দিন গভর্ণরের নিকট তার সমর্থনকারী সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করলেন। দেখা গেল তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে—সুতরাং সরকার তাকেই মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য আহ্বান করলেন।

শরৎ বাবু এবং তার দল ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কংগ্রেসের যা করা সম্ভব তা বাংলাদেশে করা সম্ভব ছিল না। রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া উচিত কিন্তু যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দলের আপত্তি রয়েছে সেখানে এটা নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি না করলে হয়ত বাংলার ইতিহাস ভিন্ন মোড় নিতে পারত।

অন্যদিকে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের হিন্দু সংখ্যাগিরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করার যে কারণ উপস্থিত করল তাতে তাদের অন্তরে কংগ্রেসের প্রতি সংশয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিল। ১৯৩৫ সনের ভারত আইনের মধ্যে গভর্ণরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সে সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তার। কংগ্রেস গোঁ ধরে

বসল যে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে মন্ত্রীসভার কোন কাজে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করবেন না। যে কথা সে কাজ, তারা মন্ত্রীসভা গঠন করলেন ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে পরোক্ষভাবে বড়লাট তাদের দাবী মেনে নেবার পর। মন্ত্রীসভা গঠনের পর তারা স্কুলকে বিদ্যামন্দির বলে অভিহিত করলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতারম' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করে হিন্দু-মুসলমান সকল ছাত্রদের গাইতে বাধ্য করলেন। রামরাজ্য গঠন করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করলেন। সকল রকম উৎসবাদিতে 'আরতি' আর হনুমানজীর প্রতিমূর্তিকে উপাসনায় হিন্দু-মুসলমান সকল ছেলেমেয়েদের যোগ দিতে বলা হলো। ভারতের মধ্য প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে নাম করা হলো 'মহাকোশল'। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে মুসলান সম্প্রদায় যখন এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল তখন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ একজন হাইকোর্ট জজকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দিলেন। সংখ্যালঘুর উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। মুসলিম লীগ থেকে পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে রিপোর্ট দিতে বলা হলো। তাদের রিপোর্ট ১৯৩৯ সনে যখন বেরোল—তখন মুসলমানের এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে হিন্দু ও মুসলমান কি অর্থনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক, কি সামাজিক জীবনে একত্রে বাস করতে পারবে না। এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রথা বাংলায়, পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে হিন্দুরা মানতে চাইল না।

ফজলুল হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হবার পর প্রজা আন্দোলনে ভাটা পড়তে থাকে। আমার মনে আছে ঢাকায় রেজাই করিম নামজাদা উকিল ও জিন্দাবাহারের জমিদার বংশের গোলাম কাদের চৌধুরী ও লায়ন সিনেমার মালিক কাদের সরদার সাহেবের প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে এক প্রজাকনফারেন্স হয়। কলকাতা থেকে যে সব নেতারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও ডা: আর. আহমদ (বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক)। ঢাকার উপরোক্ত নেতারা খাজা সাহেবদের জন্যে ঢাকা জেলায় কোন নির্বাচন এলাকায় মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনীত হবার আশা ছিল না। কাদের সরদার সাহেবকে ঢাকা শহরের বাইরে কেউ জানত না অথচ এখানে দাঁড়াবেন নবাব সাহেব নিজে, সদরে মুসলিম লীগের প্রার্থী হবেন গজনভি সাহেবের জামাতা রেজাউর রহমান সাহেব আর সেটাই ডাঃ আর আহমদের নির্বাচনী এলাকা—উত্তর ঢাকায় নাজিমুদ্দীন সাহেবের ভাই খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল হাফেজ সুতরাং রেজাই করিম সাহেবের কোন নির্বাচনী এলাকা থাকল না। রেজাই করিম সাহেব উত্তরখান, বাড্ডা এলাকার বহু মামলা বিনে পয়সায় করে দিয়েছেন—কৃষক-প্রজার মিটিং-এ বক্তৃতা করেছেন—মিলাদে যোগ দিয়েছেন, তাই নির্বাচনের সময় সৈয়দ আবদুল হাফিজ সাহেবের প্রজা দরদী হয়ে উঠলেন। আদতে মুসলিম লীগ আর 'কৃষক প্রজা পার্টি-দ্বয়ের মধ্যে বিরোধ আদর্শগত ছিল না—ছিল নেতৃত্বের কোন্দল তাই ফজলুল হক মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকে আদর্শবান হয়ত ছিলেন কিন্তু তারা ছিলেন নগণ্য, তা নইলে কৃষক-প্রজার নেতা ফজলুল হক সাহেব তখনকার দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে চায়ের ব্যবসায়ে

যারা অজস্র টাকার মালিক হয়েছিলেন তাদেরই দলের প্রধান নওয়াব মোশারফ হোসেনকে মন্ত্রী করেছিলেন, কৃষক-প্রজা পার্টির সাধারণ সম্পাদক কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদকে বাদ দিয়ে এ ঘটনাটা প্রজাপার্টি মেনে নিয়েছিল এবং জেনেশুনেও যে ফজলুল হকের মিথ্যা অভিনয় করে শাসমুদ্দীন সাহেবকে বাদ দিয়েছিলেন এ অজুহাতে যে তাকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ করতে গভর্ণরের ঘোর আপত্তি আছে। এর বিরুদ্ধে কোন জোর প্রতিবাদ করেনি যেখানে কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য ভাইসরয় স্বয়ং মাথা নত করেছিলেন সেখানে শামসুদ্দীন সাহেবকে মন্ত্রী হতে আপত্তি করবে গভর্ণর, এটা যে অসম্ভব তা তারা জানত কিন্তু এমনি হাস্যাস্পদ কারণ দর্শাতে জনাব ফজলুল হক সাহেবের যেমন এতটুকু বাধেনি তেমনি বাধেনি প্রজাপার্টির তাই মেনে নিতে। আবার সেই ফজলুল হক সাহেবই কৃষক প্রজা আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা নওশের আলী সাহেবের জনপ্রিয়তার অপরাধে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন তাই নিয়েও প্রজাপার্টি দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলেনি। নওশের আলী সাহেব খুব বেশিদিন মন্ত্রিত্ব করেননি—তবে তার এ অহঙ্কার ছিল যে যতদিন তিনি মন্ত্রিত্বে সমাসীন ছিলেন ততদিন তিনি মুসলিম সমাজকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তার সময়ই যেসব মুসলমান ডাক্তারদের সরকারি খরচে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রায় সবাই ফিরে এসে এটা প্রমাণ করতে পেরেছিল যে সুযোগ দেয়া হলে মুসলমান ডাক্তাররাও অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ডাক্তারের মতই তাদের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করতে পারে। ফজলুল হক সাহেব যখন তার নেতৃত্ব নিষ্কন্টক করার ব্যবস্থা করছিলেন, অন্য কথায় যে মই দিয়ে তিনি উপরে উঠেছিলেন সে মই দূরে ঠেলে ফেলে দিলেন—যাতে তাকে নিজের কাছে বা সমাজের কাছে নিজেকে ঋণী মনে না করতে হয়, তখনও প্রজা নেতৃবৃন্দ দুঃখিত হয়নি। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন তিনি তার একমাত্র "স্রষ্টা"। তার সাধে বাধ সাধলেন ফরিদপুরের মৌলভী তমিজুদ্দীন খান সাহেব যিনি এতদিন মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির দ্বন্দ্বের তিক্ত লড়াই থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এবারে, অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের শেষের দিকে সময় বুঝে তিনি তার "ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৃষক-প্রজা পার্টি" গঠন করলেন। অন্যদিকে শ্রমিক নেতা আফতাব আলী ও খুলনার আবদুল হাকিম, শ্রমিক নেতা জামান সাহেবদের নেতৃত্বে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়। হক সাহেব ঘর সামলাবার জন্য মৌলভী তমিজুদ্দীন সাহেব ও শামসুদ্দীন সাহেবকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করলেন। কলকাতায় তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দোর্দণ্ড প্রতাপ "বিশেষভাবে অশিক্ষিত মহল্লাবাসী, বস্তি এলাকার নানা প্রকৃতির মানুষের উপর—তিনি তাদের কি, বোঝালেন জানি না, পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব যারা এনেছিলেন তারা আর পরিষদ কক্ষ থেকে বেরুতে পারলো না। ফলে অনাস্থা প্রস্তাবগুলো আর এগুলো না—কোন বিতর্ক হবার সুযোগ হলো না—হুমায়ুন কবিরের উপর হামলা হলো—তিনি হিন্দু বিয়ে করেছেন সুতরাং তিনি আর মুসলমান নেই—এ কথা সাধারণ লোক বিশ্বাস করল।

শহীদ সাহেব খেলাফত নেতাদের নিকট থেকে শিখেছিলেন রাজপথের রাজনীতি,

বিলেতে শিখেছিলেন সংসদীয় রাজনীতি আর দেশবন্ধুর কাছ থেকে শিখেছিলেন ঐ দু'ধরনের রাজনীতির সমন্বয় করে নেতৃত্বে সমাসীন হতে। সত্যি বলতে শহীদ সাহেব তখন কেবল আফতাব আলীকে কিছুটা সমীহ করতেন কারণ তিনি খিদিরপুরের অসংখ্য সিলেটবাসী জাহাজীদের প্রিয় নেতা ছিলেন, আফতাব আলী শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বে নিজেই ছিলেন একজন জাহাজী। কিন্তু যেহেতু আফতাব আলীই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে পরিষদ কক্ষে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন তাই তিনিও তার শ্রমিক নেতৃত্বের অবসানের জন্যে ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব মালিক ও ফয়েজ আহমদকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিতে এবং তাদের কাজের সহায়তার জন্য টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আফতাব আলীর মধ্যে আর মিল হয়নি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

১৯৩৭ সনের অক্টোবর মাসে লক্ষ্মৌতে মুসলিম লীগের অধিবেশন ডাকা হলো। জিন্নাহ্ সাহেব সভাপতি—এ সভা এক কারণে হলো ঐতিহাসিক, এ অধিবেশনেই এ. কে. ফজলুল হক, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান ও স্যার সাদুল্লাহ তিন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীত্রয় আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন—এতে করে সর্বভারতে মুসলিম সংহতি দৃঢ়তর হলো। ফজলুল হক সাহেব বাংলার একচ্ছত্র নেতা হলেন। ১৯৩৬ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদে জিন্নাহ্ সাহেব যেভাবে ভুলাভাইর দেশাইর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সদস্যদের সাহায্যে দাদন গ্রহণ ও কংগ্রেসের সদস্যদের সাহায্যে ফেডারেল অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলে পাশ করিয়ে নিলেন তাতে অনেকেই তার নেতৃত্বের অজস্র প্রসংশা করেছিলেন—ষ্টেটসম্যান কাগজ জিন্নাহ্ সাহেবকে তুলনা করেছিলেন "পাইড পাইপার অব হেমেলিনের" সঙ্গে—একই বাঁশীর সুরে ইঁদুর যেমন সে ধ্বংস করেছিল—আবার সেই বাঁশীর সুরেই সে দেশের প্রিয় সন্তানদেরও ধ্বংস করেছিল। ১৯৩৭ সনের অক্টোবরেও তেমনি করে জিন্নাহ্ সাহেব বাংলা কৃষক-প্রজা পার্টির ও পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে গেল বাংলায় ও আসামে আগে—পাঞ্জাবে কিছুকাল পরে, বাকি রইল শুধু সীমান্ত প্রদেশের খোদায়ে খেদমতগার—আবদুল গাফফার খানের নেতৃত্বে। সেখানে জিন্নাহ্কে বেগ পেতে হয়েছে এবং অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক বছর—ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত।

ফজলুল হক বাধ্য হয়ে শামসুদ্দীন সাহেবকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করলেও তার প্রতি সুবিচার না করায় ১৯৩৯ সনে শামসুদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করেন। আর তমিজুদ্দীন সাহেব তার পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করে বাকি জীবন রাজনীতি করে গেছেন।

রাজনীতি যারা পেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সে যুগে তাদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ্য—একজন খাজা শাহাবুদ্দীন অন্যজন ফজলুর রহমান সাহেব। প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্কুল কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর পদ থেকে মন্ত্রী, গভর্ণর ও রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। আইউব খানের পতনের পরই তিনি রাজনীতি থেকে

অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকার নবাব বাড়িতে জন্মালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কতগুলো সুবিধা পাওয়া যেত স্বাভাবিকভাবেই ফজলুর রহমান তা পাননি, তাকে সৃষ্টি করতে হয়েছে তার নিজের পথ। সে পথ সহজ ও মসৃণ ছিল না, আঁকাবাঁকা পথে উৎরাই চরাই করে তাকে পৌঁছতে হয়েছিল উচ্চশৃঙ্গে—যেখান থেকে গোলাম মোহম্মদ তাকে তাড়াতে পেরেছিলেন গণ-পরিষদকে সৈন্যাধ্যাক্ষের সাহায্যে ভেঙ্গে দিয়ে। এদের কারোই কোন গণ-সংযোগ ছিল না সুতরাং গণ-পরিষদে গঠনতন্ত্র তৈরীর কাজে হাত না দিয়ে আশিজন সদস্যের নেতৃত্বে বহাল থেকে ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন। তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল জিন্নাহ্ সাহেব।

ফজলুর রহমান সাহেব তার দলের লোকদের জন্যে সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন। তাদের ব্যবসার সুবিধা করে দেয়া, চাকুরীর সুবিধা করে দেয়া বা অন্য কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হলে—তাই করার চেষ্টা এটা তার একটা বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু তিনি শত্রুকে ক্ষমা করতে জানতেন না। একবার যার সঙ্গে মতবিরোধ হলো তার ক্ষতি তিনি না করা পর্যন্ত অন্তরে স্বস্তি পেতেন না—এ প্রতিহিংসা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। যেমন, যেহেতু রেজায়ে করিম সাহেব ও খান সাহেব আবদুল খালেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে তার দলের বিরোধিতা করেছিলেন সেজন্য খালেক সাহেবের শ্যালক মহীউদ্দীন সাহেব যখন ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হলেন—ফজলুল রহমান সাহেব সাত দিনের মধ্যেই চাকুরী খতম করার ব্যবস্থা করলেন। এতে অবশ্যই মহীউদ্দিন সাহেবের শাপে বর হলো—তিনি তার বড়ভাই হাফিজুদ্দীন সাহেবের পরামর্শ নিয়ে ইম্পেরিয়াল পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হলেন—কিন্তু প্রথমবার ডাক্তারী পরীক্ষায় টিকলেন না দ্বিতীয়বার আবার পরীক্ষা দিয়ে সফল হলেন।

এ কথাটা লিখতে গিয়ে আমার একটি পরশ্রীকাতরতার উদাহরণ মনে পড়ল। একদিন রাইপাড়ার নাগর মিঞা সাহেব এলেন আমার বাসায় আমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে এর আগেই মহীউদ্দীন সাহেব তারযোগে তাঁর পরীক্ষা পাশের খবরটা আমাকে দিয়েছিলেন এবং আমার শ্বশুরকে আমি সে কথাটা বলেছিলাম—আমার শ্বশুর সে কথাটা নাগর মিঞা সাহেবকে বলতেই তিনি বললেন, "দূর আপনি এ কথা বিশ্বাস করেন—সারা বাংলাদেশে এত ছেলে থাকতে সরকার বেছে বেছে কেবল কুদ্দুস মিঞার ছেলেদের এস. পি. বানাবে, বোধহয় কোথাও বিয়ে ঠিক হয়েছে তাই দারোগা এস. পি. হয়ে গেছে। নাগর মিঞা সাহেব ভদ্রলোক, প্রথম জীবনে করোটিয়ার পন্নীদের জমিদারী দেখাশুনা করতেন কিন্তু ছেলে রশীদ (Raschid) সাহেব (পরবর্তীকালে ষ্টেট ব্যাংকের গভর্ণর) ন্যাশনাল ব্যাংকে চাকুরী পাবার পর বাড়িতেই থাকতেন।

আমি যখন বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষে তখন কাজী আনোয়ারুল হক সাহেব ও মহীউদ্দীন সাহেবের বড় ভাই হাফিজুদ্দীন সাহেব অনার্স পাশ করে একই সঙ্গে আই. পি. এস. পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। মহীউদ্দীন সাহেব যদিও আমার জুনিয়র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তবু তার সাথেই আমার বন্ধুত্ব ছিল বেশি। এমনকি বিবাহ করে প্রথম

যখন স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় আসেন তখন তিনি আমারই অতিথি হয়েছিলেন। আই. পি. এস. হবার পরেও কাজী আনোয়ারুল হক সাহেব টেনিস খেলতে সলিমুল্লাহ হলে আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে টেনিসের মাঠে দেখা হতো। হাফিজুদ্দীন সাহেব যেহেতু আর হলে আসেন নাই—সুতরাং আমার সঙ্গে তার তেমন পরিচয়ও ছিল না। তাদের ভাইদের মধ্যে স্কলার হিসেবে শামসুদ্দীন সাহেবই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম করেছিলেন বেশি।

জিন্নাহ্ সাহেব কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি। বড় কারণ ছিল অর্থাভাব। মুসলমান নেতাদের মধ্যে জিন্নাহ্ই সবচেয়ে নিচের স্তরে অর্থাৎ বিত্তহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরিচয় দেবার মত আর কিছুই ছিল না। তার পিতামহ রাস্তার ফেরিওয়ালা, পিতা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কিছু ব্যবসা করেছিলেন—জিন্নাহ্ পুঞ্জাই প্রথম মুসলিম প্রথা অনুসারে তার ছেলের নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলীর চেহারা ছিল সুন্দর-রাজপুত্রের মত—সুন্দর মুখই তাকে সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। স্কুলে যখন পড়ছিলেন তখন এক ধনী ব্যবসায়ী তার কন্যাকে তার কাছে বিয়ে দিয়ে তাকে বিলেতে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। জিন্নাহ্ বিলেতে যাবার কিছুকাল পরেই তার বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যারিষ্টার হবার খরচ তার শ্বশুরই বহন করেছিলেন।

বিলেতে গিয়ে জিন্নাহ্ দেখলেন যে ভারত থেকে যারা তখন বিলেতে যেতেন তারা সবাই অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান। তাদের গল্পে, কথায়, চলাফেরায় আভিজাত্যের ছাপ জিন্নাহ্ সেখানে বেমানান। জিন্নাহ্ নিজেকে ভুলতে চাইলেন। প্রথম প্রচেষ্টা চালালেন নিখুঁত সাহেব হবার জন্যে—পা থেকে মাথা পর্যন্ত ময় "মনোকল" পর্যন্ত "অস্টিন চেম্বারলেন"। নামটিও ইংরেজী করে ফেললেন—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হয়ে গেলেন এম. এ. জিন্নাহ্। শেষোক্ত পদবীটা পিতার প্রথম নাম। তার জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এম. এ. জিন্নাহ্ রয়ে গেছেন—মোহাম্মদ আলী নামটা আর উল্লেখ করেন নি এমনকি যখন তিনি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা এবং ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্রষ্টা। অন্যেরা অনেকে শেষের দিকে তাকে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লিখলেও তিনি সই করতেন এম. এ. জিন্নাহ্। সে যুগে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না সুতরাং অবসব ছিল বিস্তর। সে অবসর তিনি কাটিয়েছেন থিয়েটার দেখে এবং অংশ নিয়ে, বিলিয়ার্ড খেলে, বল ডান্সে যোগ দিয়ে, শেকস্পিয়ার পড়ে আর পার্লামেন্টের বিতর্ক দেখে। সবকটি তার পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অভাবকে ঢেকে রেখেছিলেন ইংরেজী বলা-কওয়ার মধ্য দিয়ে। তার জীবন-দর্শন বলে কিছু ছিল না বলেই তিনি ছিলেন "প্র্যাকটিক্যাল" রাজনীতিবিদ। পরিষদের বিতর্কে খোঁচা থাকত যথেষ্ট কিন্তু পাণ্ডিত্য থাকত না। উদাহরণ যেমন,

> "What then does the Government want me to do now ? What does Mr. James want me to do ? Mr. James has compared me to a film star. Mr. James threatened me with dire consequences when the resolution terminating the Ottowa Agreement was

passed. Mr. James has said that Japan is ready with its knife, and that Great Britain would be too glad to put an end to the agreement. I can only compare him with Marlene Dietrich (laughter). He can only play tragic part, and that is a tragedy. I do not follow him. Today what song is he singing ? He says that this is an enormous improvement on Ottowa. The Govenment are also beckoning me. Cinderella is to be taken to the ballroom, to have her round with the pruice and then be sent to the kitchen. Greta Garbo is not going to be Cinderella. She is going to be a star artiste (more laughter). You cannot go on like that and ask me to walk into your parlour.

জিন্নাহ্ সাহেবের অন্তরে সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে কোন কিছু জানবার বাসনা কখনো তেমন জাগ্রত হতো না, তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল ভারতীয় রাজনীতির দিকে অথবা ওকালতির দিকে। শেকস্‌পিয়ার তিনি পড়েছেন কিন্তু সেটা অভিনয় করার প্রয়োজনে—সাহিত্য হিসেবে নয়। তার জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল অভিনেতা হওয়া কিন্তু কিছুতেই ভাল "পার্ট" না পাওয়াতে তার ধারণা হলো যে, যেহেতু সে ভারতীয় তাই তাকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে এরই প্রতিক্রিয়া হলো তার ইংরেজ বিদ্বেষ যার ফলে দাদাভাই নওরোজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করতেন না শেষের দিকে আর কোর্টে যেতেন না। বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের এবং দেশীয় রাজ্যের নরপতিদের আইনে পরামর্শ দিয়ে বিস্তর টাকা উপার্জন করতেন। বাংলাদেশে এক "টেগোর" ছাড়া আর কোন কবি ছিলেন এটা তার জানা ছিল না ১৯৪৮ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত। বাঙ্গালী বলতে তিনি হিন্দুদেরই বুঝতেন, আর কলকাতার বাইরে গ্রাম বাংলায় মুসলমান বলে যারা পরিচয় দিতেন তাদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে তারা হিন্দু ধর্মই পালন করতেন মুসলমান নামে। এ ধারণা অবশ্যই স্যার ফিরোজ খান নূনেরও ছিল। পূর্ব-বাংলার গভর্ণর থাকাকালীন তিনি একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন যে এখানকার মুসলমানরা সন্তান হলে ব্রাহ্মণ ডাকতেন নামকরণের জন্য—কুষ্ঠী তৈয়ার করার জন্যে। পূজা অর্চনায় যোগ না দিলেও অনেক আচার অনুষ্ঠানই ছিল হিন্দুয়ানী এমনকি এখানকার মুসলমান ছেলেদের খৎনাও করান হয় না। সুতরাং এটা যে কেবল জিন্নাহ্‌র অজ্ঞতা বা পণ্ডিত নেহেরুর অজ্ঞতা তা বলা যায় না, এটা বাংলার বাইরের লোকদের অজ্ঞতা। পণ্ডিত নেহেরু লিখেছেন,—

"Probably 98 p.c. of the Muslims were converts from Hinduism, usually from the lowest stratum of society."

নেহেরু তার কোন পুস্তকে বাংলার বুদ্ধদের কি হলো সে সম্বন্ধে নির্বাক থেকেছেন, বাংলার সমস্ত বুদ্ধরা নিশ্চয় বাংলা ছেড়ে বার্মা চলে যায়নি। বাংলার মুসলমানদের কেন "নেড়ে" বলা হয় তারও কোন উত্তর দেননি তিনি। জিন্নাহ্ সম্বন্ধে নেহেরু বলেছেন,—

"Mr. A.. Jinnah himself was more advanced than most of his colleagues of the Muslim League. Indeed he stood head and shoul-

ders above them and had therefore became indispensable leader'.

তিনি আরো বলেছেন,—

Of economics, which overshadow the world today, he appeared to be entirely ignorant. The extraordinary occurrences that had taken place all over the world since World War I had apparently no effect on him.

Mr. Jinnah is a lone figure even in the Muslim League, keeping apart from his closest co-workers, widely but distantly respected more feared than loved. About his ability as a politician there is no doubt, but somehow that ablility is tied up with the peculiar condition of British rule in India today. He shines as a lawyer-politician, as a tactician, as one who thinks that he holds the balance of between the nationalist India and the British power.

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"Moslems were poor in the quality of their leaders and were inclined to look to government service alone for advancement. Mr. Jinnah was a different type. He was able tenacious, and not open to lure of office which had been such a failing of so many others".

তিনি আর এক স্থানে বলেছেন,—

"His idea of politics was of a superior variety, more suited to the legislative chamber or to a committee room."

জিন্নাহ্ যৌবনে তার বড়বোনের বিবাহের অনুমতির জন্যে আগাখানের সঙ্গে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও সাক্ষাৎ পাননি সে আগাখান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

"Different in many superficial characteristics different in the success which attended the one and the failure of the other, these two—Mossolini and Jinnah both apparently inconsistent in many things, shared one impressive, life long quality of consistency. Each had one guiding light, whatever the policy, whatever the political philosophy underlying it, it would be successful and it would be normally justified, so long as he was the head of it and directing it. In neither of them can this be dismissed as mere ambition; each had a profound and unshakable conviction that he was superior to other men, and that if the conduct of affairs were

in his hands and the last word on all matters his, everything would be all right, regardless of any abstract theory (or lack of it) behind political action. This belief was not pretentious conceit, it was no self-glorification or shallow variety. In each man its root was an absolute certainty of his own merit, an absolute certainty that, being endowed with greater wisdom than others, he owed it to his people, indeed to all mankind, to be free to do what he thought best on other's behalf.

In view of both Mossolini and Jinnah, opposition was not an opinion to be conciliated by compromise or negotiation, it was a challenge to be obliterated by their superior strength and capacity. Each seemed opportunist, because his self-confidence and his inflexible will made him believe, at every need turn he took that he alone was right and supremely right. Neither bothered to confide in others or to be explicit.

Mossolini travelled the long road from Marxism not because of doctrinal doubts and disagreement, because, in the world of socialist politicians and theorists in which he spent his stormy youth as an exile in Lausanne, doctrines and theories were constant obstacles across the only path of political achievement in which Benito Mossolini was the leader.

Jinnah throughout his career displayed a similar characteristic. He would admit no superior to himself in intellect, authrority or moral stature, He knew no limitation of theory or doctrine. The determined and young barrister who against all the omens, without influence, and without inherrited wealth-triumphed within a few years despite entrenched opposition."

জনাব ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভারতীয় রাজনীতিতে তার সমকক্ষতার দাবী করতে পারত যদি তার সংগঠন করার ক্ষমতা থাকত। ফজলুল হক কোন সংগঠনকেই সহ্য করতে পারতেন না—কৃষক প্রজা পার্টিকে ১৯৩৮ সনে কবর দিতে যেমন ইতস্তত করেননি তেমনি করেননি যখন মুসলিম লীগকে দূরে ফেলে দিতে—১৯৪২ সনে। বাংলার রাজনীতিতে ইতিমধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি নির্ভর করতেন বিশেষভাবে তার ভাগ্নে মনজুর মোরশেদ এবং অন্যান্য ভাইস্তা ভাগ্নেদের উপর। তিনি নিজেকে "ইনষ্টিটিউশন" বলে মনে করতেন। এ দুর্বলতাই তার পতনের মূল কারণ হয়েছিল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সে যুগে মনজুর

মোরশেদ ও তার অন্যান্য আত্মীয়রা অন্যান্য অনেকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ না থাকার জন্য তাদের উপদেশাবলী ফজলুল হক সাহেবকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। এ ব্যাপারে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পথ ছিল ভিন্ন। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেই তিনি বুঝলেন যে কলকাতার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে তা যথেষ্ট নয়। পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে তাকে সারাজীবন মন্ত্রীসভার একজন সাধারণ সদস্য হয়েই থাকতে হবে। তার আকাঙ্খা ছিল উচ্চ—সুতরাং তাকে খুঁজে বের করতে হয়েছিল পূর্ব বাংলার অন্তস্থলে প্রবেশের পথ। অসুবিধা তার ছিল অনেক। প্রথমতঃ পূর্ব-বাংলার তার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না; দ্বিতীয়তঃ তার বাংলা ভাষা জানা ছিল না। এ দুটো বাধা অতিক্রম করতে তিনি সচেষ্ট হলেন। প্রথমে দৃষ্টি পড়ল ফজলুল হকের সঙ্গে তার আত্মীয়তার বন্ধন ঝালাই করা। যে কথা এর পূর্বে তাদের বংশে আর কারো তেমনিভাবে মনে হয়নি। ঢাকার নান্না সৈয়দ সাহেবের এক মেয়ে বিয়ে করেন ফজলুল হক সাহেব আর এক কন্যা শহীদ সাহেবের আপন মামু কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দী। সে মামুর সঙ্গে আবার শহীদ সাহেবের তেমন মধুর সম্পর্ক ছিল না—সুতরাং ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হয়ে দাঁড়াল কর্ণেলের একমাত্র মেয়ে সোগরা (বেগম ইকরামুল্লাহ্), শহীদ সাহেব তাকে আপন বোনের মতই স্নেহ করতেন বলে মনে হতো। অবশ্যই সোগরার রাজনৈতিক চেতনাবোধ বেবীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল—তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং উর্দু সাহিত্যে বেশ দখলও ছিল। ইংরেজীও ভাল বলতে পারতেন। বিয়ে হয়েছিল তার নাগপুরের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ইকরামুল্লাহ্‌র সঙ্গে। সোগরাও চিরদিনই শহীদ ভাই বলতে অজ্ঞান ছিলেন। তারপর কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দীর পিতা ওবায়েদুল ওবায়েদী আল্ সোহরাওয়ার্দীকে দাফন করা হয়েছিল ঢাকার লালবাগে। ঐ আত্মীয়তা সূত্রেই প্রথম সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব-বাংলায় ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে তার মন্ত্রী হিসেবে ঘুরতেন। বাংলায় বক্তৃতা অভ্যাস করার জন্যে ইংরেজী অক্ষরে বাংলা লিখে তাই সভায় বলতেন বা পড়তেন। বছর দুয়েক তিনি ঐভাবে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরিয়েছেন এবং ইংরেজী জানা লোকদের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। অসুবিধা হয়েছিল যে ইংরেজী বলার ভঙ্গি ও উচ্চারণ ছিল অক্সোনিয়ান যে অসুবিধাটা উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দীনের ছিল না। যেমন ছিল তার উর্দু তেমনি ছিল তার ইংরেজী। তার প্রকাশভঙ্গির উপর ঢাকার ছাপ ছিল—সে জন্যেই জেলার উকিল-মোক্তার-ডাক্তার, তার যত নিকটে আসতে পারত তা পারত না শহীদ সাহেবের কাছে। তা ছাড়া ফজলুল হক সাহেবের প্রথমা বিবির সঙ্গে ফজলুল হক সাহেবের কোন দিন মিল ছিল না। ফজলুল হক সে বিয়ে ভেঙ্গে দেননি এ জন্যে যে সে বিবাহসূত্রেই তিনি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অভিজাত ঘরের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী করতে পারতেন। তার প্রথম মন্ত্রিত্বের আমলে তার স্ত্রীর আপন ভাই ডক্টর সৌয়োদ হোসেন দীর্ঘকাল আমেরিকায় নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর ভারতে এসেছিলেন। ফজলুল হক সাহেব তার সম্মানে মস্তবড় ভোজের

আয়োজন করেন কলকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে যেখানে কংগ্রেসের অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। গল্প প্রচলিত ছিল যে মতিলাল নেহেরুর "ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট" কাগজের সম্পাদিয়কতা করার সময় বিজয় লক্ষ্মীর সঙ্গে তার বিবাহ হতে যাচ্ছিল, সে বিবাহ গান্ধীজি নিজে এসে বন্ধ করে দেন। হুসেন সে দুঃখে দেশ থেকে চিরদিনের জন্য চলে যান। তার মত সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুবক্তা আমি খুব কমই দেখেছি। ঢাকার কার্জন হলে তিনি তিন দিন বক্তৃতা করেছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল,—

1. America-Today
2. Europe After the World War.
3. Indian Renaissance.

বক্তৃতা ঠিক দু'ঘণ্টা চলত প্রতিদিন—অথচ একবারও ঘড়ির দিকে তাকাতেন না।
এ পথে যখন খুব বেশি দূর এগুনো গেল না তখন শহীদ সাহেব খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে এমন একজন যুবক যাকে তিনি গ্রহণ করতে পারবেন নিজের বলে এবং যার মধ্যে রাজনীতির নেশা আছে যে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবে তাঁর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে। তিনি খুঁজছিলেন একজন সাহসী ছেলে—রাজনৈতিক দল সংগঠনে যার প্রতিভা আছে অথচ তাঁর সঙ্গে কাজ করবে আমরণ। ১৯৩৮ সন থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত অনেককে তিনি পরীক্ষা করেছেন কিন্তু তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি পাননি—যদিও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন চিরদিন। এদের মধ্যে ছিলেন নূরুল হুদা, আনোয়ার, নূরুদ্দীন, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর প্রভৃতি।

১৯৪৩ সনে আবুল হাসিম সাহেব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর মুসলিম লীগ বামপন্থীও দক্ষিণ পন্থীতে ভাগ হলো। মাওলানা আকরাম খান, হাসান ইস্পাহানী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান আরম্ভ হয়—এ অভিযান প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে—কিন্তু শহীদ সাহেবকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দেয়া হয় কারণ শহীদ সাহেব বুর্জোয়াঁ কিন্তু তিনি শিল্পপতিও নন জমিদারীর মালিকও নন। এমনকি কলকাতায় তার একখানা বাড়িও ছিল না। কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গেই ছিল তার উঠা-বসা যার জন্যে মফস্বল জেলার উকিল, মোক্তার, ডাক্তার যারা রাজনীতি করতেন, সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে উঠা-বাসা করে নিজেরা সম্মানিত হতেন তারা তাঁকে গুণ্ডাদের নেতা আখ্যা দিয়ে তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে থাকতেন—১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের পর রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক লোক সংসদে প্রবেশ করলেন যারা তাদের জেলার অভিজাতদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। তারা শহীদ সাহেবকে জননেতা হিসেবে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন না। এমনি পরিস্থিতিতে শহীদ সাহেবকে প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে ধরা হলো না। ফলে আবুল হাসিমের আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ সংসদীয় রাজনীতিতে শহীদ সাহেবই গ্রহণ করেছিলেন।

বছর চারেক পরের একটি ঘটনা এখানে এসে পড়ছে ব্যাপারটা বোঝার জন্যে। ১৯৪৪ সনের নভেম্বর মাসে যখন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বাৎসরিক কাউন্সিল সভা ডাকা হলো তখন সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন ও মাওলানা আকরাম খান একত্রে বসে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে আবুল হাসিম সাম্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সুতরাং মুসলিম লীগের সম্পাদক পদে তাকে রাখা যায় না। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো অত্যন্ত গোপনে—তারপর শহীদ সাহেবের বাড়িতে অন্যান্য নেতাদের যেমন খাজা শাহাবুদ্দীন, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবদুস সবুর খান ও ডাক্তার মালিককে ডাকা হলো এবং সেখানে স্থির হলো যে আবুল হাসিমের স্থলে ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব মালিককে সাধারণ সম্পাদক করা হবে। শহীদ সাহেব আবুল হাসিমকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন এবং আবুল হাসিম কোন আপত্তি না করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সকাল না হতেই এ খবর কাউন্সিলরদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, তখন আবদুল হাসিমের অনুরাগীদের মধ্যে একটা ভয়ানক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। নির্বাচনের পূর্বের দিন সন্ধ্যায় তারা এ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যার দিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সম্মুখে ফজলুল কাদেরের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হলো—বক্তৃতা করল প্রথম নূরুদ্দীন তারপর মুজিবর রহমান। আমি, আবুল হাসিম ও হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেব তখন বাইরে পায়চারী করছিলাম—আমি ঘরে ঢুকলাম পরিস্থিতি দেখার জন্যে—আমি যখন ঢুকছি তখন নূরুদ্দীনের বক্তৃতা প্রায় শেষ—শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন তার বক্তৃতার মাঝখানে বর্ধমানের আজমিরী লাফিয়ে উঠলেন টেবিলের উপর। মুজিবের বক্তৃতার সময় শহীদ সাহেব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হলো ফজলুল কাদের তার নেতৃত্ব কিছুক্ষণের জন্যে মুজিবের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুজিবের বক্তৃতা জোরালো হয়েছিল এবং যুক্তিপূর্ণও, ফলে শহীদ সাহেব কাউন্সিলের উপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। আমার মনে হয় সেদিন এমনকি সে মুহূর্তেই শহীদ সাহেব বেছে নিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। হতে পারে যে শেখ মুজিবর রহমান আবুল হাসিমের বামপন্থীদের একজন হলেও শহীদ সাহেবের স্নেহ ও প্রীতিভাজন হলেন। এত দিনে যেন শহীদ সাহেব সন্ধান পেলেন তিনি যাকে খুঁজছিলেন তাকে। শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি অনেক সম্মুখে এগিয়ে এসেছি কারণ এ ঘটনা লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করার চার বছর পরের ঘটনা। দ্বিতীয় খণ্ডে এটা সবিস্তারে সবিশেষ বর্ণনা করা হবে।

খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ছিলেন অভিজাত ঘরের লোক—ঢাকা নবাব বাড়ির ঘর জামাইর ছেলে—ব্যবহারে ভদ্র। রাজনীতি করেছেন বহুকাল কিন্তু গণ-নির্বাচনে কোন দিন বিজয়ী হননি। প্রথম জীবনে বৃটিশ ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরবর্তীকালে জিন্নাহ্ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতার উপরই ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের ভরসা। আরো পরে ফজলুর রহমান খাজা শাহাবুদ্দীনই ছিল তাঁর বুদ্ধিদাতা। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্ম-নির্ভরশীল কোন নতুন নেতৃত্ব দিতে পারেন নি এবং পরবর্তীকালে ফজলুর রহমানও তাঁকে ব্যবহার করেছেন। নাজিমুদ্দীনকে সর্বসমক্ষে সাধু, সত্যবাদী এবং ভাল লোক বলে প্রমাণ করাই ছিল শাহাবুদ্দীনের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক দক্ষতার একটা অঙ্গ। এ জন্য নিজে অন্যায় না করেও নাজিমুদ্দীনের পাপকে নিজের অপরাধ বলে স্বীকার করে ভাইকে ঊর্ধ্বে রাখতেন। কারণ শাহাবুদ্দীনকে লোকে জানত ম্যাকিয়াভেলীর

"প্রিন্স" বলে—তাই কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। সত্যি বলতে সবাই তাকে ভয় পেত। সুতরাং তার প্রয়োজনেই নাজিমুদ্দীনকে উর্ধ্বে রেখে তিনি তার উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করতেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ছিলেন সরল মানুষ। আবুল হাসিম তার সম্বন্ধে বলতেন যে নাজিমুদ্দীন "Was very simple and so simple that his simplicity could be measured in tons. অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা যায় যে সে "Simple" নয় "Simpleton" অর্থাৎ বোকা। এর কারণ মুসলিম লীগ সরকার যখন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা বলেছিলেন তখন দিনাজপুরে ল্যাণ্ড হোল্ডারসদের এক সভায় তিনি বললেন যে তাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই—ক্ষুধার্ত কুকুরকে হাড়-গোড় কিছু ছুড়ে না দিলে তারা হয়ত সমস্ত মাংসটাই নিয়ে নেবে—ফ্লাউড কমিশনের কাজ তারা যেন সে দৃষ্টিতেই দেখে।

খাজা নাজিমুদ্দীন রাতে কিচ্ছা কাহিনী বলতে ভালবাসতেন—অফুরন্ত ছিল তার কিচ্ছার ভাণ্ডার আর সে কিচ্ছা শোনার জন্যে তার পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, সবাই তার ড্রইং রুমে জমা হতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত এ কেচ্ছা বলা চলত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর ফলে জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। জেনারেলের স্ত্রী ছিলেন স্যার নাজিমের কন্যা। তিনি সময় পেলেই কাওয়ালীর বৈঠক করতেন। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দীন মুরগী মোসাল্লেম ও জরদা খেতে খুব ভালবাসতেন। শহীদ সাহেব ভালবাসতেন ঝাল খেতে আর ফজলুল হক সব কিছু খেতে ভালবাসতেন বিশেষ করে ভাত, ডাল, মাংস, মাছ ও ফলমূল। আম খেতে আরম্ভ করলেন তো এক ঝাঁকি আমই খেয়ে ফেলতেন। তবে আর দু'জন যেমন সাহেবী কায়দায় খেতেন অর্থাৎ আঙ্গুলের বদলে কাটাচামচ—ফজলুল হক আঙ্গুল ব্যবহার করতেই ভালবাসতেন।

১৯৩৭ সনের এপ্রিল কি মে মাস ঠিক মনে নেই আমার এক প্রফেসর বন্ধু আমাকে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এম. এন. রায় সম্বন্ধে অনেক রকম কাহিনী আমার কানে এসেছিল—সন্ত্রাসবাদী, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ম্যাকসিকো গিয়ে সাম্যবাদ নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লেনিনের সঙ্গে রুশ দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক অংশ গ্রহণ করতেন। লেনিনের অনেক লেখায় কমরেড রায়ের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু ১৯৩০ সনের পর তিনি কম্যুনিষ্ট মতবাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন এবং কয়েক বছর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে 'র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটীক পার্টি' গঠন করেন।

আলোচনাকালে কমরেড রায় বলেছিলেন যে, "রুশদেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলে মেহনতি মানুষের জন্যে যে স্বর্গ তৈরী হবে ভেবেছিলাম তা সফল হয়নি। অবশ্যই এটা আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে সমস্ত বিপ্লবটাই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ,—The brutalities of progress are called revolutions but when they are ended, the fact is recognised, the human race has been chastised but it has moved onwards. The Utopia of today is flesh and bone tomorrow. তবু না বলে পারছিনা যে রুশ দেশের সর্বহারারা আজো তাদের স্বর্গের সন্ধান পায়নি। অবশ্যই নেতৃবৃন্দের দিন ফিরে গেছে—সবাই বিরাট বিরাট বাংলো (Datcha) তৈরী করেছে।

মুক্ত বুদ্ধির স্থান সেখানে নেই। যারা ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আছে সেখানে আজ তারা অভিজাত সম্প্রদায়। আজ সেখানকার মেহনতী মানুষ গাধার খাটুনী খেটে চলেছে (Donkey work)। ষ্ট্যালিনের নামে যে গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল তাতে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে—কি সে অধিকার কিভাবে আদায় করা যাবে তার কোন নিয়ম নেই। ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষে কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল কিন্তু কিছু করা গেল না। হিটলারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্যে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টি ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে—ভবিষ্যতে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারবে না—তারা ভাবছে গণতন্ত্রের ভিত্ ভেঙ্গে দিতে পারলেই তারা নাৎসীদের শেষ করতে পারবে কারণ জনতা ডিকটেটরশীপে একবার অভ্যস্ত হলে দক্ষিণের স্বৈরাচারী সরকার ছেড়ে দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ডিকটেটরশীপ অব দি প্রলিতারিয়েৎ গ্রহণ করবেই। এটা একটা বিরাট ভুল, আমি ষ্ট্যালিনকে এর ভবিষ্যৎ বুঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। ফলে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে গলা টিপে মেরে ফেললাম। 'দুনিয়া জোড়া বিপ্লব'-এর আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সেখানে আজ জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। অতীতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ যেমন জাতীয়তাবাদের সেই হবে শেষ পরিণতি। সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক আজ রুশদেশ হয়ে যাচ্ছে—আমি তাই আমার স্বপ্নের দেশকে ছেড়ে এসেছি।"

গণতন্ত্রের বুলি আবার কপচায় ইউরোপের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলো। তারা স্পেনে "পপুলার ফ্রন্ট" এর বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়েছে—কিন্তু ফ্রন্টকে ধ্বংস করার জন্যে মুসোলিনি ও হিটলার যখন অস্ত্র পাঠাতে লাগল—গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ তখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর 'কূপ'কে ঘরোয়া ব্যাপার বলে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। Policy of Non-Intervention যে মানবতা বিরোধী তা গণতন্ত্রের ধ্বজাধররা যে বুঝতে চাইলে না সে বোধহয় সত্য নয়। প্রস্তুতির অভাবেই বোধহয় আদর্শকে বলি দিল একনায়কত্বের কাছে। অবশ্যই এও হতে পারে যে যেহেতু সোভিয়েত "পপুলার ফ্রন্ট'কে সাহায্য করছিল তাই তারা ভাবছে "পপুলার ফ্রন্ট'কে সাহায্য করা মানে সাম্যবাদকে সাহায্য করা। আমি তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী কারণ সেখানে ব্যক্তিকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। আর আমি সাম্যবাদ থেকে সরে এসেছি যেহেতু সেখানে ব্যক্তিকে অস্বীকার করে সমাজবাদ সৃষ্টি চায়। বাকি জীবনে ব্যক্তি ও সমাজ এ দুটোকেই রক্ষা করা যায় কি না বা এ দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় কিনা তারই চেষ্টা করে যাবে। রোজার বেকন বলেছিলেন,—

"Cease to be ruled by dogmas and authorities, look at the World". আমার দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্য জগতে যে হারে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠছে না, সমাজ বিজ্ঞানও সে অনুপাতে অগ্রসর হচ্ছে না। যে অনুপাতে বিজ্ঞানের চর্চা ও মরণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে রীতিমত এবং হবে সে হারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসামঞ্জস্য কতটা প্রকট।

তারপর কমরেড রায় চীন-জাপানের যুদ্ধ, হিটলার ও মুসোলিনির মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন যা আমার সবটা মনে নেই। তিনি বলেছিলেন, "সমাজকে গড়ে তুলতে হবে মানুষকে তার নিজের শক্তি দিয়ে—নিত্য নতুন আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু অনেক দিন থেকে একটা কিছু চলছে বলে তাকে আক্‌ড়িয়ে ধরে রাখতে হবে তার কোন অর্থ নেই। ১৮৪৭ সনের কম্যুনিষ্ট পার্টি মেনিফেষ্টো শত বছর পরে অনেকটা অকেজো হয়ে যেতে বাধ্য। বিজ্ঞানের মত দর্শনেরও শেষ কথা নেই।"'

আমার মনে হচ্ছিল যে কমরেড রায়ের অন্তরে ভট্টাচার্জি ব্রাহ্মণ—সুতরাং সে তার নিজের কাছ থেকে মুক্তি পাবে না যেমন গৌতম বুদ্ধ সব কিছু থেকে পালিয়েও নিজের কাছ থেকে পালাতে পারেননি।

আমি রাজনীতির এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন বা যারা বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছেন তাদের যেমন দেখেছি দর্শক হিসেবে তারই একটা প্রতিচ্ছবি দিতে চেষ্টা করছি।

গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মূলতঃ হিন্দু "শোভেনিজম"-এ অর্থাৎ যাকে বলে অন্ধ দেশপ্রেমে পরিণত হয়েছিল—যারা বিরুদ্ধে দাঁড়াল জিন্নাহ্‌র মুসলিম লীগ। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের মিশ্রণ। ভারতমাতা নিজেই একজন দেবী। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার ভেতর দিয়ে মুসলমানদের পরদেশী করে রাখা হয়েছিল। অবশ্যই এশিয়ার জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সাধারণভাবে ধর্মভিত্তিকও বটে। আমার সে যুগে মনে হতো যে বাংলার মুসলমানের মধ্যে যতদিন এমন নেতার আবির্ভাব না হবে যে নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবে না, অর্থাৎ যতদিন বাংলা তার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারবে ততদিন বাংলার মুক্তি অসম্ভব। জনাব ফজলুল হকের মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু উর্দূভাষী অভিজাত ঘরের স্ত্রী থাকার ফলে তার জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সে যুগে দেশমাতৃকার সেবায় যারা ব্রতী হয়েছিলেন তারা ছিলেন সকলেই বর্ণহিন্দু—অথচ বাংলার শোষিত জনগণের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান যারা বেশির ভাগই ছিল বর্ণহিন্দুদের নিকট অস্পৃশ্য। সুতরাং তাদের ব্যথা কোথায় তা নেতার বুঝতেন না। সুতরাং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল থেকে কোন মুসলমান নেতারা অবির্ভাব ঘটলেই বাংলার আপামর মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস ছিল।

১৯৪০ সন পর্যন্ত ঢাকায় যাদের নেতা বলা হতো তাদের কয়েকজন সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি—যেমন সর্বজনাব রেজাই করিম, ফজলুর রহমান, কফিলুদ্দীন চৌধুরী ও খাজা শাহাবুদ্দীন। এর মধ্যে রেজাই করিম সাহেব ও কফিলুদ্দীন সাহেব ছাড়া বাকি দু'জন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় রাজনীতি করতেন। ফজলুল রহমান সাহেব স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচনে বলিয়াদীর লাবিবুদ্দীন সিদ্দিকির কাছে পরাজিত হবার পর আর ঢাকার রাজনীতির সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক রাখেননি—তার পক্ষে রাজনীতি করতেন জনাব এ. কে. ফজলুল হক (মাওলা মিঞা), খাজা শাহাবুদ্দীনের পক্ষে রাজনীতি করতেন প্রথমে সৈয়দ আবদুস সলিম তার পরে সৈয়দ

সাহেবে আলম। সৈয়দ আবদুল হাফিজের মৃত্যুর পর মুসলিম লীগের মনোনয়ন দেওয়া হলো তার ছোট ভাই সৈয়দ সাহেবে আমলকে। রেজাই করিম সাহেব এবার আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না—মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন। যখন সাহেবে আলমের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াল তখন মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব সাহেবে আলমের পক্ষে নির্বাচনী অভিযান আরম্ভ করলেন—রেজাই করিম ভেবেছিলেন যে সাহেবে আলমকে তিনি নিশ্চয়ই পরাজিত করবেন—কিন্তু তিনি কিছুতেই ভাবতে পারেননি যে ফজলুল হক, যিনি তার পিতার বন্ধু, যে তখনো কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি পদে ইস্তফা দেননি তিনিই আসবেন সাহেবে আলমের পক্ষে ও তার বিরুদ্ধে নির্বাচন অভিযান চালাবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রেজাই করিমই পরাজিত হলো সাহেবে আলমের কাছে, যে সাহেবে আলম কোন দিন স্কুলে পড়েননি যার একমাত্র উপার্জনের উপায় ছিল ঘোড়ার দৌড়ের 'জকীগিরি', এর ফলে তিনি অন্তরে যে আঘাত পেলেন তার ফলে জীবনে এল 'ফ্রাষ্ট্রেসন' বা নৈরাশ্য। রাজনীতিতে যারা ফ্রাষ্ট্রেসনে ভোগে তারা আর জীবনে কখনো শুদ্ধ বা "কারেক্ট" সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে এল তার উপর আর এক আঘাত। ফজলুর রহমানের দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান সমান ভোটের আয়োজন করেছিলেন বহু কষ্টে। একটি ভোটের উপর নির্ভর করছিল তার ভবিষ্যৎ সফলতা। সে ভোটটি ছিল কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দীর—তিনি আসছিলেন কলকাতা থেকে ষ্টীমারে ঢাকায়। ভোটের পূর্বে যাতে হাসান সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এসে না পৌছতে পারেন তার জন্যে নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ জাহাজের সারেঙ্গের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হলো যে জাহাজটা যদি সে পদ্মায় কোন চরে তুলে দিতে পারে তাহলে তাকে দু'হাজার টাকা দেয়া হবে। সারেঙ্গ টাকাটা আগেই দেয়ার কথা বললেন—এ টাকাটা অনেক দুয়ারে ধর্ণা দিয়েও যোগাড় করতে পারলেন না। ফলে জাহাজ সময় মত চলে এল আর তার দল এক ভোটেই হেরে গেল। তার ধারণা হলো যে অজস্র টাকা না হলে এ সংসারে কিছুই পাওয়া যায় না। এরই ফলে তিনি পরবর্তীকালে "বার্মা রিফিউজী" কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েন।

নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ নামেমাত্রই নবাব হলেন। তার পিতা স্যার সুলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সহজ সূত্রে ধার নিয়েছিলেন। কারণ হিন্দু মহাজনরাই পেত তার কাছে প্রায় বার লক্ষ টাকা। সরকার তাকে সহজ শর্তে এ ঋণ দিয়েছি তাকে দলে ভেড়াবার জন্যে, ত্রিশ বছরে শোধ করতে হবে—সে ঋণ তিনি তো শোধ করার কথা ভাবতে পারেননি—খাজা হাবিবুল্লাহ নবাব হলে সে ঋণের বোঝা তার ঘাড়ে চাপে। এ ঋণের ভার তাকে তেমন যাতনা দেয়নি যতদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তারপর যে অবস্থায় তার দিনগুলো কেটেছে তা যারা প্রত্যেক্ষ করেনি তারা উপলব্ধি করতে পারবে না।

আর একজন ছিলেন শেফাউল মূলক, হেকিম হাবিবুর রহমান। তার বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার লেখাপড়াও জানতেন—হেকিম হিসেবেও তার খুব সুখ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যে কোন্ দলে ছিলেন তা তার শত্রু-মিত্র কেউ জানত না। তিনি পুরাতন ঢাকা সম্বন্ধে উর্দু

ভাষায় এক পুস্তক লিখেছিলেন। যে তিনজন এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন—তারা ছিলেন ভূতপূর্ব ডি পি. আই. খান বাহদুর আওলাদ হুসেন, হেকিম ও পরবর্তীকালে সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর।

তখনকার দিনে মন্ত্রী হবার প্রথম সোপান ছিল—মিউনিসিপ্যালিটী বা জেলা বোর্ড শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ছিলেন মেয়র, সোহরাওয়ার্দী ডেপুটী মেয়র, খাজা নাজিমুদ্দীন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, খাজা শাহাবুদ্দীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইত্যাদি। অল্পসংখ্যক লোক সে যুগে এ সোপানে আরোহণ না করেই মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে নাম করা যায় ঢাকার নবাব বাহাদুর ও ফজলুর রহমান। অবশ্যই এখন আর সে ঐতিহ্য নেই।

এ সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দেয়। হিটলারের ক্ষমতায় আসা মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণ—স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর আবির্ভাব। হিটলারের যুদ্ধ প্রস্তুতি। চারদিকে যেন আগুনের হল্কা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভেলী চেম্বারলেন মিউনিকে গিয়ে হিটলারের কাছে নতি স্বীকার করে তার সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করলেন। ১৯৩৮ সনের ৬ই অক্টোবর চেম্বারলেন বললেন,—

> "What we did was to save her (Chezckoslovakia) from annihilation and give her a chance of new life as a new state which involves the loss of territory and fortification but perhaps would enable her to enjoy in the future, and develop, a national existence under neutrality and security comparable to which we see in Switzerland today".

লীগ অব নেশনস-এর তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় আগা খান মিউনিক প্যাক্ট সম্বন্ধে তার আত্মচরিতে লিখেছেন,—

> "And now, all these years later, after all the violent and troubles happenings since then, I say without hesitation that I thank God that we did not go to war in 1938. Apart altogether from any highly debatable question of military preparedness or lack of it, if great Britain had gone to war in 1938, the doubt about the moral justification of decision would have remained for ever".

১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসে হিটলার ষ্ট্যালীনের সঙ্গে "যুদ্ধ নয়" (Non-Agression Pact) চুক্তি সই করে পূর্ব ইউরোপের ভাগ্য স্থির করে ফেলেন।

ঠিক এ সময় আমার জীবনে আসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। আরমানিটোলা সরকারি হাই স্কুলে হেকটর ডেনিয়েলের স্থলে চাকুরীটি পেয়ে নানা কারণে খুশীই হয়েছিলাম। কিন্তু যে দিন চাকুরীতে যোগ দিয়েছি তার দশদিন পরেই অত্যন্ত অকস্মাৎভাবে আমাকে বিবাহ করতে হলো—অগাষ্ট মাসের ২৬শে তারিখে। যেহেতু আমার স্ত্রী তখনো সাবালিকা হননি—তাই তার পিতার 'এজিনে' বিয়ে হল। আজো আমি বুঝতে পারিনি এমনি

তাড়াহুড়া করে বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল। ঠিক এমনি সময় এমনিভাবে বিয়ে করার জন্যে আমার মন প্রস্তুত ছিল না—সুতরাং সমাজের এক শ্রেণী পথপ্রদর্শকের উপর আমি শ্রদ্ধা হারাই। অবশ্যই সাহিত্যিক আবুল ফজলের মত বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে মেয়ের বাবারা ছেলে খুঁজে বেড়াতেন—পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন হয়েছে চতুর্থ দশক থেকে। ছেলের বাবারাই এখন মেয়ে বেছে বেড়ায়। আমার নাবালিকা স্ত্রীর মধ্যেও আমার বিরূপ মনের প্রতিক্রিয়া হল। বিয়ের অর্থটা তার বোঝার বয়স না হলেও আমার মানসিক বিরক্তি সে মনে মনে অনুভব করেছিল। তার অন্তরও স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ হয়েছিল আমার প্রতি। ফলে সে নিজেকে নিজের তৈরি খোসার মধ্যে লুকিয়ে রাখল চিরদিন। কোন দিনই আর আমার সঙ্গে সহজ হতে পারল না। সংসার তাই তার কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে রইল। বৃহৎ সমাজের প্রতি তার কোন আকর্ষণ জন্মালো না। আমার কোন বাইরের অতিথির প্রতি তার মনোযোগ চেষ্টাপ্রসূত—আমার প্রতি কর্তব্যের নিদর্শন। সংসারটা ছেলেমেয়ে পিতৃ ও মাতৃকূলের আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে এবং এখনো চায়। এর জন্য তাকে দুঃখ পোহাতে হয়েছে বিস্তর—ঠকেছে, আঘাত পেয়েছে তবু তাদের মাঝেই সে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে।

আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কিন্তু আমার ধারণা আমি তাকে কোন দিনই জানতে পারিনি। কারণ বোধহয় সেও কোনদিন নিজেকে আমার নিকট খুলে ধরেনি। আমাকেই কি সে বুঝেছে কোনদিন ? তাও আমি জানি না। সারা জীবনটাকে সে নামাজ, রোজায়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ভরে রেখেছে। কোন দিন স্বেচ্ছায় সাজ-গোজ করেনি, যেটুকু করেছে সেটা আমার প্রয়োজনে। পার্টি রিসেপশনে আমার মান রাখার তাগিদে। যৌবনেও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেনি—কোন সিনেমা দেখতে চায়নি এমন কি ১৯৫৩-৫৪ সনে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে যখন সকালে অনেকদিন একাকী সেন্সরের কাজ সারতে হয়েছে তখনো আমার সঙ্গে যাবার জন্যে রাজী করাতে পারিনি। এ পৃথিবী তার কাছে কোন দিনই একটা বাস্তব বলে কিছু মনে হয়নি। প্রথম জীবনেই সে ধর্মকে আকড়ে ধরেছিল—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীর দরবেশের সংস্পর্শে এসে সেটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এলিওপ্যাথিক ঔষধের উপর তার বিশ্বাস কোনদিনই দেখিনি। সে আমাকে যা দিতে পেরেছে আমি তা গ্রহণ করেছি কিন্তু আমার কাছে সে কিছু চায়ওনি পায়ওনি। তার আত্ম-অহঙ্কার, আত্ম-মর্যাদাবোধ, স্পর্শকাতরতা তাকে বাধা দিয়েছে আমার কাছে কিছু চাইতে। তার নিজস্ব অধিকারেই যেন সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে—কারো করুণার উপর নয়। আমি ওকালতি, রাজনীতি বা কূটনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম—সংসারে টাকাটা পৌঁছে দিয়েই সমস্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চাই আজো। তার আর আমার দুনিয়া যেন ভিন্ন। আমার আস্থা জীবনের উপর—তার বিশ্বাস পরজগতের উপর। তবু আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। আমার চরিত্র, আমার স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি বেশি কথা বলি আর সে খুব কম কথা বলতে অভ্যস্ত এমনকি অজু

থাকা পর্যন্ত কোন কথা বলে না—আছর, মাগরেব ও এশা একই অজুতে আদায় করার পক্ষপাতি। আমি আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকতে ভালবাসি। বাইরের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে ভাল লাগে। আমি বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ হয়ে না পড়া পর্যন্ত একই জায়গায় বা একই কাজে পাঁচ ছ' বছরের বেশি মনোনিবেশ করতে পারতাম না। সুতরাং আমাদের দুজনের যাত্রাপথ ছিল সমান্তরাল রেখার মত। আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন তার আকাঙ্খার বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমি একাকী থাকতে পারি না। মানুষের সঙ্গ না পেলে বই-এর সঙ্গ আমার চাইই। অনেকটা Southey-র ভাষায় বলতে পারি,—

"My days among the Dead are past
Around me I behold
Where'er their casual eyes are caste
The mighty minds of old
My never-failing friends are they
With whom I converse day by day".

যাক যা বলছিলাম—এমনি এক অকস্মাৎ বিবাহের পরের দিনই আমার শ্বশুর-শাশুরী আমার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের দেশে চলে গেলেন।

আমার মনের মধ্যে একটা ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলছিল। সমাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল—আমি কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। একবার ভেবেছিলাম আর একবার গাড়ো পাহাড়ে যাই, এবার শিকারের জন্য নয়—বিশ্রাম নিতে—জনপদ ছেড়ে বনের দিকেই যেন মন টানছিল। এমন সময় আমার এক বোন জায়েদা আখতারের কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম তার সঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করার জন্যে। আমি বরিশালে তার কাছে গেলাম। সে অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি ও সমবেদনা ঢেলে দিয়ে আমাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করল। ঐ সময় আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল এমনি সহানুভূতি। একটু মমত্ববোধ—আমি তার কাছ থেকে তা পেয়েছিলাম আমার জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে—এ জন্যে আমি তার কাছে আজো কৃতজ্ঞ রয়েছি।

আমাদের বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই গরম খবর। যুদ্ধ বেধে গেছে ইউরোপে, হিটলার আক্রমণ করেছে পোল্যাণ্ড—এ আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ৩রা সেপ্টেম্বর। ভারতের ভাইসরয়ও ঘোষণা করলেন ভারতের এ যুদ্ধে যোগ দেবার কথা। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে, যেহেতু ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ না করে ভারত সরকারকে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে সুতরাং কংগ্রেস প্রতিবাদে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের মন্ত্রীসভাগুলোকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ্ সাহেব "নাজাত দিবস' ঘোষণা করলেন এবং সারা ভারতের মুসলমানরা "নাজাত দিবস" নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করল—ফলে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল তা আর হয়নি। জিন্নাহ্র এটা একটা মস্তবড় দক্ষ রাজনৈতিক চাল যেটা কংগ্রেসের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

জিন্নাহ্ সাহেব এক বিবৃতিতে বললেন, "এ যুদ্ধের ফলে আমাদের অবস্থা হয়েছে তরমুজের মত—ছুরি যদি তরমুজের উপর পড়ে তা হলে তরমুজ কাটে। আবার তরমুজ

যদি ছুরির উপর পড়ে তাও তরমুজই কাটে। আমরা বহু বর্ষব্যাপী সংগ্রাম করে বৃটিশ যে শেকল পরিয়েছে আমাদের চেষ্টায় প্রায় তা আজ পুরানো হয়ে ভাঙ্গবার উপক্রম কিন্তু আমরা যদি জাপানের হাতে পড়ি তবে সেটা হবে নতুন শৃঙ্খল—সেটা ভাংতে লাগবে আরো দুশো বছর।"

আমার অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত ভীতি হলো সে হচ্ছে যদি হেকটর ডেনিয়েল লণ্ডনে পৌঁছতে না পারে তার জাহাজ যদি ফিরে আসে বোম্বে তবে আমার চাকুরী নেই—আগে ছিল ভাই-বোন এখন যোগ হয়েছে স্ত্রী। যাক মাস দুয়েক পরে খবর পাওয়া গেল যে হেকটর ডেনিয়েল লণ্ডনে পৌঁছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। যাক এদিকে নিশ্চিত হওয়া গেল।

১৯৩৯ সনে রুশ-জার্মানী 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' (Non-Aggression Pact) হওয়ার ফলে জার্মানী ইউরোপে বিনা বাধায় দেশের পর দেশে আক্রমণ চালাতে লাগল। বৃটেনে নেভেলী চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন কারণ দেশময় 'মিউনিক প্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা চলছিল। তার 'এপিজমেন্ট পলিসি'র বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো সাধারণ ইংরেজের কণ্ঠ। উইনষ্টন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৩ই মে ১৯৪০ সনে চার্চিল দেশের উদ্দেশ্যে বললেন—"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat." চার্চিল যেভাবে ইংল্যাণ্ডের মানুষকে অনুপ্রাণিত করলেন তা কেউ পারত না। জার্মানীর ভয়ানক 'ব্লিৎসক্রিগের' মধ্যেও তারা নিরাশ হলো না। এটাই বোধহয় চার্চিলকে চিরদিন স্মরণীয় করে রাখবে প্রতিটি ইংরেজের কাছে।

এদিকে "নাজাত দিবস" পালনের পর কংগ্রেস নতুন প্রোগ্রাম নেবার কথা ঘোষণা করল আর মুসলিম লীগকে আরো শক্তিশালী এবং সংহত করার জন্যে জিন্নাহ্ সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ বার্ষিক সভা ডাকলেন লাহোরে—মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতারা এটা লাহোরে অনুষ্ঠানের কথা বললেন—স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানকে "ইউনিয়নিষ্ট" মন্ত্রীসভাকে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারে পরিণত করতে যেমন বাংলায় ফজলুল হক চালাচ্ছিলেন তেমনি মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্যে চাপ দিতে—আর জিন্নাহ্ সাহেব সভাস্থল লাহোরে চেয়েছিলেন এ জন্য যে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্রস্থল পাঞ্জাবকে আলোড়িত করতে পারলে বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করতে সাহস পাবে না।

স্যার সেকেন্দারের ইচ্ছে ছিল না যে লাহোরে এ অধিবেশন হউক। তার সুখী পরিবারকে উলট পালট করার জন্যেই যে তার প্রতিপক্ষ ব্যবস্থা করছে—এটা তার মনে হল। সুযোগও এসে গেল—খাকছাররা আন্দোলন শুরু করল—খাকছার নেতা আল্লামা এনায়েতুল্লা মোশরেকী গ্রেফতার হলেন—ফলে খাকছাররা হলো ক্ষিপ্ত—স্যার সেকান্দর চালালেন গুলি—১৯শে মার্চ। ১৪৪ ধারা জারী হলো। স্যার সেকান্দার ও ম্যামদোতের নবাব দুজনেই দিল্লীতে জিন্নাহ্কে টেলিফোনে অবস্থা জানালেন এবং জানতে চাইলেন যে এ অবস্থায় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন করা ঠিক হবে কিনা। জিন্নাহ্ প্রত্যুত্তরে বললেন—সভা হবেই—লাহোরে এবং ঠিক তারিখ মতই—কেবল ১৪৪ ধারার জন্যে কোন মিছিল হবে না। ২১শে মার্চ সব প্রদেশের প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছল—এদিকে মুসলিম লীগ

ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং চলতে থাকল। ২৩শে মার্চ সাধারণ সভার প্রস্তাব উপস্থিত করলেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক। প্রস্তাবটি হলো ঃ

*"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অত্র অধিবেশন এ মর্মে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে নিম্নোক্ত মৌলিক আদর্শসমূহকে ভিত্তি হিসাবে না ধরিয়া অপর যে কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী এবং মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না—নিলিখ ভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি মুসলমান দাবী করিতেছে যেসব এলাকা একান্তভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল প্রয়োজনানুযায়ী সীমান্তের রদবদল করিয়া ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক যাহাতে উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ (States) এর রূপ পরিগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিট দ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।*

*নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল আদর্শসমূহের ভিত্তিতে লীগ ওয়াকিং কমিটিকে শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে। উক্ত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাটি এরূপ ভাবে প্রণীত হইতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ, কাষ্টম্‌স এবং প্রয়োজন বোধে যে কোন দফতরের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে।"*

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কোন কথা থাকল না—এর কারণ ফজলুল হক সাহেবের ক্ষমতা বাংলাদেশে একচেটিয়া করা। তার বক্তৃতার কিয়দংশ আমার "A Socio-Political History of Bengal"-এ উদ্ধৃত করা হয়েছে। রাজনীতির ইতিহাসে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থ সব সময়েই কাজ করে। এর থেকে মুক্তি পেতে আমার পরিচিত কোন রাজনৈতিক নেতাকে সে যুগে দেখিনি।

এ প্রস্তাব পাশ হবার পর মুসলমান যুব সমাজ এক নতুন প্রেরণা পেল—তারা আর একটা সম্প্রদায় নয়—তারা নিজেরাই একটা জাতি। সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচের জন্যে যে সংগ্রাম করছিল প্রায় দুই শতাব্দী ধরে তার যেন পরিসমাপ্তি ঘটল। বয়োজ্যেষ্ঠরা অবশ্যই এ প্রস্তাবকে সেভাবে গ্রহণ করেনি। তারা ভেবেছিল—তাদের দাবী দেখে কংগ্রেস তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছবে।

এদিকে ১৯৩৯ সনেই কমরেড রায় বলেছিলেন,—"এবারকার যুদ্ধ জনযুদ্ধ—স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ", প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টি তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে তাকে অভিহিত করল—কিন্তু সে কম্যুনিষ্ট পার্টিই আবার যে যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করল—যখন জার্মানী রুশদেশ আক্রমণ করল।

আমার দৃষ্টি তখনো মানচিত্রের দিকে। প্রতি সন্ধ্যায় কাগজ দেখে, রেডিও শুনে মানচিত্রের উপর রেখা আঁকছি।

মে মাসে রুশদেশ ইষ্টোনীয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুনিয়া গ্রাস করল—জার্মানীর প্যানজার ডিভিশন আশ্চর্য গতিতে ১০ই মে বেলজিয়াম, ১৪ই মে নেদারল্যাণ্ডস, জুন মাসে ফরাসীদেশ দখল করে নিল—যদিও মার্শাল পেঁত্যার অধীনে একটি ভিসি

সরকারের অস্তিত্ব রাখা হলো। জাপান সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান-ইটালিয়ান শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে যোগ দিল—হিটলার রুমানিয়া আক্রমণ করল সেপ্টেম্বর মাসে। যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্ট ওয়েণ্ডেল উইল্কিকে পরাজিত করে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। অপরদিকে জার্মানীর এ অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে মুসোলিনিও গ্রীস আক্রমণ করল—কিন্তু ইটালিয়ান সৈন্যরা গ্রীস সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণে পিছে হটতে লাগল, উপায়ান্তর না দেখে মুসোলিনি হিটলারের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এরপর আবার সবাইকে আশ্চর্য করে দিল যখন হিটলারের সবচেয়ে নিকটতম বন্ধুরুডলফ হেস অকস্মাৎ একটি উড়োজাহাজে চড়ে গ্রেট বৃটেনে গিয়ে উপস্থিত। সমস্ত বিশ্ব যেন হতবাক হয়ে গেল। এর কারণ কেউ বুঝতে পারল না। যুদ্ধে অনেক কিছু ঘটে যা সাধারণ ইতিহাসের ছাত্ররা বুঝে উঠতে পারে না। হয়ত হেস ভাবছিলেন,—

*"Death is the end of life, ah! Why*
*Should life all labour be ?*
*Let us alone, what is it that will last ?*
*All things are taken from us, and become*
*Portions and parcels of the dreadful Past."*

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে গ্রামে যে হত্যাযজ্ঞ, অগ্নি-সংযোগ ও নানা প্রকার দৈহিক উৎপীড়নের সংবাদ মুখে মুখে আমাদের জেলখানায় এসে পৌঁছছে তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আজ হউক কাল হউক স্বাধীনতা লাভ করবেই—তাই যদি হয় তবে পাকিস্তানের আন্দোলন কি ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ? আমরা যারা সে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলাম তারা কি ভুল পথে মানুষগুলোকে পরিচালিত করেছিলাম ? ত্রিশ বছর পূর্বের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের বিচার করতে হবে। আমার আজো ধারণা যে ইতিহাসের প্রয়োজনেই পাকিস্তান এসেছিল আবার ইতিহাসের প্রয়োজনেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত।

আমি আমার ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত ইতিহাস বইতে সে-সময়কার অবস্থা বিশ্লেষণ করেছি—এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে আরো আলোচনা করব। এ পর্যন্ত যা এ বইতে লিখেছি তা পাঠ করলে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। আমরা মুসলমান ছেলেরা যেমন করে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ করেছিলাম বা হিটলার, মুসোলিনি, অষ্টম এডওয়ার্ড, রুজভেল্টের এমনকি লিণ্ডবার্গের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, কমনরুমে আলোচনা করেছি, আমাদের সমসাময়িক হিন্দু ছেলেদেরও দৃষ্টিভঙ্গি কি এসব ব্যাপারে একই রকম ছিল ? আমার বিশ্বাস কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'স্বরাজ'-এর জন্যে এবং সন্ত্রাসবাদীরা যে ভাবধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবছিল—সে সবের প্রতি হিন্দু ছাত্রদের দৃষ্টি এমনিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহকে বিশ্লেষণ স্বাভাবিকভাবেই তারা করেনি বা তার প্রতি তেমনভাবে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। আমি অবশ্যই দেশের নেতৃবৃন্দের কথা বলছি না, আমি আমাদের মত ছেলেদের কথা ভাবছি।

আমাদের হলে তখন মফস্বল কলেজ থেকে অনেক ছাত্র আসত যারা বিদ্যুতের আলো কিভাবে নেভাতে হয় তা জানত না—ট্রেনের শব্দকে ঝড়ের শব্দ ভেবে আজান

দিতে আরম্ভ করত। হিন্দু ছেলের সে যুগ অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছিল। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। মুসলমান সমাজে তখন একটা জড়তা বিরাজ করছিল।" এর উপর পূর্ব থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নবাগত মুসলমান মধ্যবিত্তের স্থান করে দিতে রাজী হয়নি—যার ফলে তাদের পক্ষে আত্ম প্রতিষ্ঠার লড়াইতে নামতে হয়েছিল—এমনকি জিন্নাহ্ সাহেব যখন তাদের প্রিয় নেতা ফজলুল হককে রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য করলেন তখনো তারা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন জাতীয়ভূমি সৃষ্টি করতে—তা নইলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হতো। হিন্দু ছাত্ররা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি যতটা আকৃষ্ট ছিল আমরা তা ছিলাম না, কেবল ১৯৪০ সনের পর থেকে আমাদের মধ্যে সে অনুপ্রেরণা এসেছিল। সুতরাং আমাদের পথ ভ্রান্ত ছিল না বলে আজো আমি বিশ্বাস করি—যদিও আজ আমি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্যাতীত, কারাগারে আবদ্ধ—মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেন জাতির জন্য আবাসভূমি চাই ? জাতি অর্থে আমরা কি বুঝি ? বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনের শুরু থেকে হিন্দু ও মুসলমান দুটো সম্প্রদায় দুটো পৃথক রাস্তা গ্রহণ করল যদিও মুসলমান নেতা যেমন ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল্ "দি মোসলমান" পত্রিকার সম্পাদক, বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেব, কহিনূর সম্পাদক রোওশন আলী চৌধুরী, সাহিত্যিক ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সুবক্তা লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীকে সমর্থন করেছিলেন তবু যেহেতু তাদের সবারই কর্মস্থল ছিল কলকাতা, যে শহর বৃহৎ মুসলিম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তাই বাংলার হিন্দু-সমাজ তাদের নেতৃত্বকে তেমন গুরুত্ব দিল না। তারা স্যার সলিমুল্লাহ্‌কে একচ্ছত্র নেতা বলে ধরে নিল। ফলে বাংলার সব বাঙ্গালী আর এক বাঙ্গালী জাতি থাকল না, দুই সম্প্রদায় ভিন্নমুখী হয়ে "আমরা" তারা হয়ে গেল—তারই ফলে দ্বি-জাতিত্বের সৃষ্টি হলো বাংলাদেশে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ঐ দু'টি ধারণা। "আমরা" বলতে আমরা কি বুঝি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে তো বটেই এমনকি ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই হিন্দু ও মুসলমান—নিজেদের আমরা বলে ভাবিতে পারেনি। —তারই স্বাভাবিক পরিণতি ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব। আবার পঁচিশ বছর পর আজ যখন "পাঞ্জাবী" ও "বাঙ্গালী" নিজেদের "আমরা" শব্দের অন্তর্গত বলে ভাবতে পারল না—সেখানেও আবার সেই "আমরা" ও "তোমরা" মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বিশেষ করে একদল প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একদল শোষক সম্প্রদায়, একদল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ ও একদল আমলা বাংলাকে শোষণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ব্যস্ত হলো ফলে যে কারণে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সে কারণেই আজ বাংলার স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়েছে। এটা বাঁচা-মরার লড়াই—জিততে হবেই আমাদের এ সংগ্রামে—নইলে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না। এতদিন ভেবেছিলাম বাঙ্গালীর পক্ষে পাকিস্তানে থেকে তাদের মানসিক পরিপূর্ণতা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন—২৫শে মার্চের

ভয়াল রাত থেকে মনে হয়েছে আমাদের সে পরিণতি অসম্ভব। তাই বোধহয় নিজের সন্তানকেও মুক্তি সংগ্রামে পাঠাতে দ্বিধা করিনি।

আবার মনে প্রশ্ন জাগে—বাংলা স্বাধীন হলেই আমাদের পরিপূর্ণতা আসবে। আমরা স্বাধীন বাংলার জন্য চেষ্টা করেছি—আমরা ১৯৪৮ সনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে আন্দোলন করেছি—আমরা ১৯৫০ সনে পাকিস্তানের গণ-পরিষদের শাসনতান্ত্রিক মৌলিক নীতির বিরোধিতা করেছি—আমরা ১৯৫২ সনে ভাষার জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছি—কিন্তু আজ পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারির সংকলনসমূহ ছাড়া আমাদের কবি সাহিত্যিকদের নিকট থেকে তেমনি বিশেষ কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি—একমাত্র শ্লোগান চলছে পশ্চিম বাংলার পুস্তক আমদানি বন্ধ কর। ইংরেজীর বদলে বাংলা চালু কর। মনে হয় যেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত এদের সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ছিল এমনি কোন "বয়কোট" আন্দোলন। আমার রাজনৈতিক জীবন প্রথম শুরু যখন সৈয়দ আবুল হুসেন মুসলমানদের জন্যে শতকরা ৪৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে এর ফলে "মুসলমানদের আকাঙ্খা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হবে, কর্ম-স্রোতে ভাঁটা পড়বে, মন সংকীর্ণ হবে, মস্তিষ্ক শ্রমবিমুখ হবে। তারা জীবন সমস্যার জন্য ক্ষমতা অর্জনে পরাঙ্মুখ হবে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দিক হতে জীবনের স্রোত আনবার সকল চেষ্টা ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ ও শিথিল হয়ে যাবে।" আমার বিশ্বাস, যে সাহিত্যিকের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস আছে তারা এমনি সব শ্লোগানের পৃষ্ঠপোষকতা কিছুতেই করবে না। আসন সংরক্ষণ সমস্যার উপর সৈয়দ আবুল হুসেন তার যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে দেশ স্বাধীন হলে। বাংলার মুসলমানদের জন্যে বাংলাভাষাই মাতৃভাষা হওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে বিতর্ক বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়েছিল—কারণ নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন উর্দু ভাষাভাষীরা—ঢাকার নবাব পরিবার আর তার উপর বিহার ও উত্তর ভারতের সন্নিকটস্থ কলকাতা নগরীর বাসিন্দারা। ঢাকার নবাব পরিবারের আদি আবাসভূমি কাশ্মীর পরে দিল্লী। দু'পুরুষ কাটিয়ে কার্পেটের ও চামড়ার ব্যবসা করতে আসাম তারো পরে ঢাকায় প্রথম ব্যবসায়ী হিসেবে—পরে জমিদার।

এমনকি ১৯২৭ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে স্যার এ. এফ. রহমান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তার ভাষণে উল্লেখ করেন,—

> "একটা বিষম আন্দোলন শুনতে পাই যে বাংলাদেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা কি ? দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি statistics নেয়া যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশে কত মুসলমান আছে, কত পুরুষ, কত নারী কার কি ভাষা। তবে অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে একটা নিষ্পত্তি হয়। তা না হলে মাতৃজাতিকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে তাঁদের ভাষা কি ? কিন্তু এ আন্দোলনের আর একটু অংশ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিত ? আমার মনে হয় আমার যদিও বিশেষ জানা নেই, জাতি ও ধর্ম হিসেবে ভাষা হয়নি, দেশ হিসেবেই ভাষা

হয়েছে। এক এক দেশের এক এক ভাষা। সুতরাং যে দেশে আমাদের বাস তার ভাষাও আমাদের।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও বাংলার মুসলমানদের "মাতৃভাষা কি বা কি হওয়া উচিত" তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল—আর চতুর্থ দশকে আমাদের সমস্যা ছিল শিক্ষার বাহন ও অফিস আদালতের ভাষা বাংলা হবে কি না এবং আরো পরে এ ভাষাকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হবে কি না। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যে মাতৃভাষাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে বলেছেন—আমরা কেবল সে সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম—একে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৪৮ সনের আন্দোলন ছিল প্রতিবাদের ভিত্তিতে আর ১৯৫২ সনের আন্দোলন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভিত্তিতে। ১৯৪৮ সনে ভীরু মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আমাদের প্রতিবাদ সহজেই মেনে নিল—কারণ সম্মুখে ছিল গভর্ণর জেনারেল ও জাতির পিতা জিন্নাহ্ সাহেবের ঢাকা আগমনের তারিখ। তাই তিনি আট দফা সই করে আন্দোলন প্রশমিত করলেন—যদিও সেটা ছিল মুখ্য সেক্রেটারী আজীজ আহমদের মতের বিরুদ্ধে। তবু নাজিমুদ্দীনের প্রতি আজীজ আহমদের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল বলে তিনি শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীনের সম্মান রক্ষার্থে বিরোধিতা পরিহার করেন। আজীজ আহমদের পরামর্শ মত নাজিমুদ্দীন পরিষদে আট দফা ঘোষণা না করে দু'একটি দফা পড়েই বসে পড়লেন। এটা করেছিলেন যাতে পরিষদের প্রসিডিং-এর ভিতর দফাগুলো লিপিবদ্ধ না হয়। তিনি ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন রাজনৈতিক "ষ্ট্যাটেজী" হিসেবে। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে তার ইচ্ছা ছিল না। তারপর যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ঢাকা এসে ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভা তার প্রতিশ্রুতির "তওবা" হিসেবে ঘোষণা করলেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা" অর্থাৎ জিন্নাহ্র ১৯৪৮ সনের বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি। এবারে তাই আন্দোলন কেবল প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ রাখা চলল না—সরকার এবার প্রস্তুত ছিল তাই প্রতিবাদ আন্দোলন ঢাকায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পরিসমাপ্ত হলো—কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে উঠল জাতি হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ল—শহীদ মিনার হলো প্রতীক, কবিতা নাটক, গল্প লেখা আরম্ভ হলো প্রতি বছর সৃজনশীলতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ তার আত্ম-আবিষ্কার করল। এবারে আর ধর্মের দোহাই নেই। ১৯৪৮ সনেও কম্যুনিষ্টরা কাজ করেছে কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের কোন হিন্দুকে সদস্য করা হয় নি। ১৯৫২ সনের সে ভয় ভেঙ্গে গেল তার কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা আন্দোলন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে চালাতে চাইলেন নবীনরা বিশেষ করে যুবলীগ ও ছাত্র সম্প্রদায় ওরকম সীমারেখা টানতে অস্বীকার করলেন। ১৯৪৮ সনে বিরোধী দলের কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার সমর্থন পেয়েছিলেন—কারণ তারা ঐ আন্দোলনের সুযোগে নাজিমুদ্দীনকে তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আনতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, ডক্টর মালিক ও তোফাজ্জল আলী—তারা অবশ্যই কেউ রাষ্ট্রদূত আর কেউ মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৫২ তে তাই এদের বাদ দিয়ে চলতে হলো যদিও কয়েকজন পরিষদ সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন এবং একজন প্রতিবাদ করে তার পরিষদের

আসনও ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত বাংলার আপামর জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে দলমত নির্বিশেষে বাঙ্গালী হয়ে যেতে চাইল না। অর্থাৎ ১৯৫২ সনের প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে উঠল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এরই ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগে পরিণত হল।

আসলে ভাষা পণ্ডিতদের নিকট একটা সদা পরিবর্তনশীল বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে পরিবর্ধিত। যারা ঐ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বিরোধিতা করে তারা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি যে কারণে গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত মৃত ভাষা সে কারণেই যে কোন ভাষাই বন্ধ জলাশয়ের মত সদা গতিশীল ও বেগবতী হতে হবে—জাতীয় ভাষাকে আন্তর্জাতিক মানে তুলতে না পারলে সে ভাষা শিক্ষা করে কূপমণ্ডূক হতে হবে। জাতীয় ভাষা সমৃদ্ধশালী করতে হলে বিশ্বের নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষতা ও সর্বক্ষেত্রে তার ব্যবহার করার প্রয়োজন, জাতির প্রতিটি লোককে মানুষের পর্যায়ে তোলার জন্যে। পরাধীন দেশের বাসিন্দারা যারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত, অজ্ঞ তাই স্বাধীনতার পর মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করে—তার মধ্য দিয়েই সবাইকে বলতে হবে যে তারাও মানুষ। ব্যাপক অর্থে যাকে আমার বলি মনুষ্যত্ব, বলি তার রূপায়ন ও উদ্বোধন। আবুল ফজল সাহেব ঠিকই বলেছেন,—"আমরা দেশ, আমার ধর্ম, আমার সভ্যতা, আমার জাতি জগতের সেরা এ মনোভাব অত্যন্ত হাস্যাস্পদ"। স্বাধীন জাতি সৃষ্টির প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, অন্য অর্থে মানবতার অংশ হতে। বুদ্ধের মতে মানুষের মুক্তি নির্বাণে—যেমন নদীর প্রবাহ সাগরের দিকে তেমনি ভাষার প্রবাহ হবে উত্তরোত্তর জ্ঞান আহরণের পথে কেবল স্ব-সমাজের পরস্পরের সাথে যোগাযোগের বা ভাব বিনিময়ের জন্যেই নয়। আবুল ফজল সাহেব তার "রাঙ্গা প্রভাতে" লিখেছেন,—"জীবনও হয়ত সামনের এই প্রবহমান শঙ্খেরই মত—কে জানে কোন্ দুর্গম গিরিগুহায় তার জন্ম, আঁকা-বাঁকা তার পথ, কত ঘর-বাড়ি-লোকালয় গ্রাস করে, কত দেশ-দেশান্তরেকে ফলে পুষ্পে সুশোভিত করে আপন মনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এ শঙ্খ—অথই সমুদ্রে তার নিলয়—নির্বাণ নয়। মুক্তি যেন তার কাম্য"।

জ্ঞানই শক্তি। ইংরেজীতে যাকে বলে "Knowledge is power"—কারণ জ্ঞানই মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বে পৌঁছায়—একেই বলে বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী। আমরা যতই শ্লোগান দি "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা আর যমুনা।" কিন্তু পদ্মা, মেঘনা, বা যমুনার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তারা চলেছে সাগরের পানে আমাদের কখনো উপকার করে, কখনো ধ্বংস করে।

বর্মাদেশে প্রায় চার বছর অবস্থান করে আমার ধারণা হয়েছে যে বর্মাদেশ নিজেকে লৌহ-বর্মে আচ্ছাদন করে একটি দ্বীপে পরিণত হয়েছে। বৃহৎ মানব সমাজের সঙ্গে তার যেন সংযোগ নেই। আমি জানি একদিন তারা জানতে পারবে মহাসাগরের দ্বীপসমূহ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তলাতে তাদের একই মাটি যদি সে ভাসন্ত প্রবাল-দ্বীপ না হয় যার অস্তিত্ব যে কোন সময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। আমি আজো

বিশ্বাস করি যা সৈয়দ আবুল হোসেন ও শিখা গোষ্ঠীর চিন্তানায়করা বিশ্বাস করতেন "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

বাংলার আজকের দুর্দিনে আমার মনে আসছে অতীতের নানান কথা। ভাবছি, ১৯৩৭ সনে শরৎ বসু যদি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে রাজী হতেন, যদি ফজলুল হক সাহেবকে শর্তাধীনে সমর্থন না দিতেন, যদি ফজলুল হক সাহেব তার নতুন প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে শরৎ বাবুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় নিরাশ হয়ে না ফিরে আসতেন তবে বাংলার ইতিহাস কি ভিন্ন মোর নিতে পারত ? শরৎ বাবু বলেছিলেন যে কংগ্রেস ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে, যদি রাজবন্দীদের সর্বপ্রথম মুক্তি দেয়া হয়। তার দল এ শর্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন কারণ প্রথমেই ঐ আদেশ দিলে গভর্ণর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিবেন। আবার, নির্বাচন হলে তাদের পক্ষে মুসলিম লীগের অর্থ ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন না—ফলে সে নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়জয়কার হবে। ফজলুল হক সাহেব তার প্রস্তাব আলোচনা করতে গেলেন যে তিনি কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কংগ্রেস প্রদেশসমূহে যেদিন ঐ আদেশ দিবেন তিনিও সে দিন একই আদেশ দিবেন। কিন্তু শরৎ বাবু রাত দশটায় বিছানায় শুয়ে পড়েছেন তাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। মুসলিম লীগের কর্মীরা এ সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং ফজলুল হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিহাসও নেতাদের কাজের জন্য বিভিন্ন মুখে চালিত হয়।

পাকিস্তান দুই জাতিত্বের ভিত্তিতে হয় নি। মুসলমান জাতির ধর্মীয় নেতারা যেমন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা হুসেন আহমেদ মাদানী—সত্যি বলতে বিশিষ্ট মাওলানারা বেশির ভাগই ছিলেন "জমাতে ওলামায়ে হিন্দ" প্রতিষ্ঠানের সদস্য, তারা অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। তারা সাম্প্রদায়িতকতা প্রচার করেননি—সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সব স্থানে মুসলমান, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল—তারা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে নি। নতুন করে তার প্রমাণ দিতে হবে না। এমন কি পাঞ্জাবেও প্রথমে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়নি—কেবল যেখানে মুসলমান সম্প্রদায় উচিত বিচার পায়নি—সেখানেই মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা হয়েছিল। এমনিভাবে আরো কত কথাই না মনে পড়ে।

আমি ক্রমাগতই অসুস্থ হয়ে পড়ছি। হয়ত সব কথা লিখে যেতে পারব না। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এসে মনে হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

ডিসেম্বর মাস—যুদ্ধ বেঁধেছে—বিমান থেকে ভারতের প্রধান সেনাপতির নামে কাগজ ফেলা হচ্ছে—পাকিস্তানের সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে। আমাদের জেলখানায় এ কাগজ পড়ছে। আমার আর কিছু লেখা সম্ভব নয়। আপাততঃ তাই আমাকে লেখা সমাপ্ত করতে হলো। যদি কোন দিন বাইরে যেতে পারি তবেই আমার জীবনের বাকি কথা লিখব। রাজনীতি আর করব না—এ স্বাস্থ্য নিয়ে। যদিও রাজনীতি করে এটা জানতে পেরেছি যে "He who is silent is forgotten, he who does not

advance, falls back; he who ceases to become greater, becomes smaller." আরো জানি যে "If you don't kick at the world, you would be kicked around by the world." তবু স্থির করেছি নীরবে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মত মনের অবস্থা আর ফিরে পাব না। দেশকে আমার যতখানি দেবার ছিল তা দিয়েছি। আমার আর কিছু দেবার নেই। নতুনের যুগ এসেছে। পুরাতনের বিদায় নেবার পালা এখন। পুরাতন যেন নতুনের বাধা স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়—এ প্রার্থনাই করব বাকি জীবন, যদি অবশ্য জীবন্ত ঘরে ফিরে যাই। পুরাতন ও নতুনের মধ্যে দূরত্ব সম্যক উপলব্ধি করেই এ সিদ্ধান্ত আজ আমি নিচ্ছি।[১]

১. প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি। পরবর্তী পাতা থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু।

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু

## প্রথম অধ্যায়

# পাকিস্তান আন্দোলন

লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের নেতাদের নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্যে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং ২৮ 'ক' ধারা গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হয়। ঐ ধারায় বলা হয় যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগসমূহের উপর কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। এর ফলে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাগুলোর উপর ও কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের, যেখানে সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহ থেকে বেশির ভাগ সদস্য গ্রহণ করা হত তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হলো। এর পর থেকে কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে, ফলে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের নেতৃবৃন্দ মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের নেতৃবৃন্দের ভাগ্যবিধাতা হয়—এমনকি কোথায় কিভাবে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে কে কে মন্ত্রিসভায় থাকবে তাও স্থির হত জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী খানের ইচ্ছার উপর। সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলিম লীগের নেতারা প্রাদেশিক নেতায় পরিণত হলো। বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানদের নেতার ভাগ্য স্থির করার মালিক হলো ভারতের উত্তরপ্রদেশ, বোম্বে প্রভৃতি দেশের নেতাদের যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে কোনদিন কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাগেই মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের নেতাদের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাটা হলো সাম্যবাদী রুশ দেশের মত। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিকেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা।

লাহোর প্রস্তাবকে পরবর্তী দিল্লী অধিবেশনে জিন্না সাহেব "পাকিস্তান প্রস্তাব" বলে অভিহিত করেন। যদিও বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ "লাহোর প্রস্তাবকে" পাকিস্তান বলে আখ্যায়িত করছে, অন্যদিকে আমরাও একটা নাম খুঁজছিলাম—তাই আমরা আজ থেকে "লাহোর প্রস্তাবকে" পাকিস্তান প্রস্তাব বলেই অভিহিত করব, কিন্তু সত্যিকার কারণ ছিল গঠনতন্ত্র সংশোধন করে একনায়কত্ব সৃষ্টির যে পথ করা হয়েছিল পূর্বের অধিবেশনে তারই ভিত্ আরো শক্ত করাই ছিল তার উদ্দেশ্যে। লাহোর তাঁর বক্তৃতার যে অংশ লক্ষ লক্ষ অনুলিপি করে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের মুসলমানদের নিকট পাঠানো হয়েছিল তার মুসাবিদা করেছিলেন পরবর্তীকালে "ডনের" সম্পাদক ও আরো পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলতাফ হোসেন। অংশটি ছিল নিম্নরূপ,—

"We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. We are a nation of hundred million, and what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions, in short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we are a nation."

উপরোক্ত বক্তব্যের উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন,—

"If we accept the arguments of Sree Jinnah the Muslims of Bengal and the Muslims of Punjab would become two distinct and separate nations."

পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে কিনা তাই নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক লিখেন ডক্টর আম্বেদকার। তিনিই প্রথম পাকিস্তানের একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপদান করেন। আরো পরে সাংবাদিক মুজিবুর রহমান খান বাংলা ভাষায় "পাকিস্তান" লিখেন। তাঁর পুস্তকে বর্ধমানকে বাংলার মানচিত্র থেকে বাদ দেয়া হয়। আরো পরে পাকিস্তানের উপর একখানা পুস্তক বেরোয় ইংরেজীতে। গ্রন্থকারের নামের স্থলে শুধু লেখা ছিল "বাই এ পাঞ্জাবী"। খুব সম্ভব বইখানা ইফতেখার হুসেন খান মামদোতের লেখা। ভবিষ্যতের পাকিস্তানের অর্থনীতির আলোচনা করে এক পুস্তক প্রকাশ করেন জন মাথাই।

এ সময়ে ঢাকায় আন্দোলনকে রূপ দেন ফজলুল রহমান সাহেবের নেতৃত্বে শহীদ নজীর আহম্মদ ও তাঁর অনুগামী কিছুসংখ্যক ছেলে যাদের মধ্যে নাম করা যায় শামছুল হক, আজিজ আহম্মদ, গিয়াসউদ্দীন, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ এবং আরো অনেকে। এ. কে. ফজলুল হক (মাওলা মিঞার) নাজীরাবাজারের বাসায় আলোচনা বৈঠক আরম্ভ হয়।

১৯৩৮ সনে রাজা সৈয়দ মোহাম্মদ মেহেদীকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয় কংগ্রেস প্রদেশসমূহে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তারই তদন্তের জন্য। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে কমিটি মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ঐ রিপোর্টই "পীরপুর রিপোর্ট" নামে খ্যাত। ১৯৩৯ সনে এ. কে. ফজলুল হক সাহেব রিপোর্টটি বাংলাদেশে প্রকাশ করেন। মুসলিম লীগ ঐ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পটভূমিতে "ডিফেন্স কমিটি" গঠন করা হয়। ঐ সংগঠনের জন্যে ঢাকায় এসেছিলেন মামদোতের নওয়াব, কাজী ঈসা, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, মাওলানা জামাল মিঞা প্রভৃতি। রেজাই করিম সাহেবের বাসায় কয়েকদিন বৈঠক বসেছিল। এঁদের সম্মুখে বদরুদ্দীন সিদ্দিকী ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে হুলি উৎসবের সময়। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শহরে সকালের দিকে। গ্রামের নিরক্ষর মুসলমান যারা সকালে শহরে আসছিল মামলা-মোকদ্দমা বা ব্যবসার প্রয়োজনে তারা হলো প্রথম শিকার। এর ফলে গ্রামের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৯২৬ সন থেকে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবারে সেটা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের রায়পুরা, মনোহরদী ও নরসিংদি এলাকাসমূহে। পূর্ব বাংলার গ্রামসমূহ যেহেতু মুসলিম প্রধান সেহেতু প্রথমেই হিন্দু বাড়ি লুটপাট শুরু হয়—গ্রামগুলোতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে বন্দুকধারী গারোয়ালী স্পেশাল পুলিশ পাঠানো হয়—যার ফলে মুসলমানদের উপর এমন অত্যাচার শুরু হয় যে বেটাছেলেরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে—পুলিশ তাদের না পেয়ে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে থাকে; বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ রক্ষা করার জন্যে তারা অনন্যোপায় হয়ে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। হাজার হাজার মুসলমান কৃষকদের দড়িবেঁধে ট্রেনে ঢাকায় চালান দেয়া হয়। অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কোর্টে উপস্থিত করা হয়। তাদের জামীনের ব্যবস্থা করার জন্য একটি "লিগ্যাল ডিফেন্স কমিটি" গঠন করা হয়। মামলা পরিচালনার ভার নেন রেজাই করিম সাহেব, সুলতানউদ্দীন সাহেব, আতাউর রহমান খান সাহেব (পরবর্তীকালে চীফ মিনিস্টার), আলী আমজাদ খান (পরবর্তীকালে পরিষদ সদস্য), ওয়াছিহ্উদ্দীন সাহেব (পরবর্তীকালে জুডিসিয়াল সেক্রেটারী), এ. টি. মোজহারুল হক সাহেব (পরবর্তীকালে পরিষদ সদস্য) প্রভৃতি মুসলমান উকিলগণ। এর মধ্যে এক সুলতানউদ্দীন সাহেব ছাড়া আর বাকি সবাই রেজাই করিম সাহেবের জুনিয়ার ছিলেন। মোক্তারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন—শামসুল হক সাহেব, হেমায়েতউদ্দীন সাহেব ও মোমতাজউদ্দীন সাহেব। যেহেতু প্রচুর টাকার প্রয়োজন ছিল তাই *চান্দা* তোলার জন্যে কাদের সর্দার সাহেবকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি করে দেয়া হয়। ঐ কমিটিতে কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেবও ছিলেন। আমার কাজ ছিল এসব বিভিন্ন কমিটির সমন্বয় সাধন করা। আমাদের ছাত্র সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কখনো যোগ দেয়নি বা তাদেরও আমরা ব্যবহার করিনি। মুসলিম লীগ সরকার একটি "ইনকোয়েরী মিশন" বসান। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা সকল রাজনৈতিক পার্টি-ই তাদের আর্জি দাখিল করে। মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন—রেজাই করিম সাহেব এবং তাঁর সহকারীরা। মামলা পরিচালনা করতে ময়মনসিংহ থেকে নূরুল আমীন সাহেবকেও আনতে হয়েছে মাঝে মাঝে, হিন্দু মহাসভার পক্ষে গিরীশ দাশ ও পংকজ ঘোষ, কংগ্রেস পক্ষে শ্রীশ দাশ তাঁদের স্ব-স্ব পার্টির পক্ষে উপস্থিত হন। কয়েক মাস পর ফজলুল হক সাহেব তাঁর ভাগ্নে মাহবুব মোর্শেদ সাহেবকে "স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল" মনোনীত করেন সরকারি পক্ষে ছওয়াল জবাব করার জন্যে। মোর্শেদ সাহেব তার কিছুদিন পূর্বেই ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। যদিও তার পূর্বে তিনি এডভোকেট ছিলেন। পরিষদে তাই বিরোধীদল ঐ মনোনয়নের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। বিশেষ করে তাঁর "ফিস্" দৈনিক পাঁচ শত টাকা স্থির করায় ফজলুল হক সাহেবকে

স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পরিষদে জবাব দিতে উঠে বলেন যে—*অভিজ্ঞতা বা বয়স দেখেই কেবল গুণাগুন বিবেচনা করা যায় না। মনোনীত কাউন্সেল তাঁর ভাগ্নে সুতরাং এটা ধরে নিতে হবে যে, সে অন্য সবার চেয়ে বেশি উপযুক্ত।* আলোচনা এর পর আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

ঐ বছর চলছিল দেশে আদমশুমারী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এক সভায় 'চ্যালেঞ্জ' করেন যে, বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। বৃটিশ সরকার হিন্দুদের দাবিয়ে রাখার জন্যে বাংলাকে মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। মুসলিম লীগ ঐ 'চ্যালেঞ্জকে' কোন গুরুত্বই দেয়নি, কিন্তু যখন লোক গণনার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে তখন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের চৈতন্য উদয় হলো—এবং তিনি এক বিবৃতিতে বললেন যে, হিন্দু উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সবাই মিলে ঐবারের আদম-শুমারীতে তাঁদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হলো—পরে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটমাট করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেল—লোক গণনার ফলে দেখা গেল সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের লোক সংখ্যা ও অনুর্বর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা সমান সমান। যার ফলে বাংলা যখন বিভক্ত হলো তখন ১৯৪১ সনের লোক গণনার উপর ভিত্তি করেই জেলাগুলো ভাগ হলো ফলে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুসলিম অধিকৃত অনেকাংশ চলে গেল বাংলাদেশের বাইরে।

ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি "জাতীয় দেশরক্ষা কাউন্সিল" গঠন করার প্রয়োজনবোধ করেন। যে সকল নেতারা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে এ. কে. ফজলুল হক, স্যার সেকান্দার হায়াৎ খান, স্যার সাদুল্লাহ, বেগম শাহনেয়াজ, স্যার মোহাম্মদ সোলেমান প্রভৃতির নাম খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো। জিন্নাহ্‌র মত ছাড়াই যেহেতু উপরোক্ত নেতারা দেশরক্ষা কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিল সেহেতু তাঁদের পদত্যাগ করার জন্য তিনি হুকুম জারী করলেন। সবাই পদত্যাগ করলেন—এবং জিন্নাহ্ সাহেবকে এক চরম নিন্দাসূচক খোলা পত্র লিখে পাঠালেন এবং সেটা সংবাদপত্রেও প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্ সাহেব বাংলার মন্ত্রী পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করার আদেশ দিলেন। দোসরা ডিসেম্বর মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ পত্র পেশ করেন এবং বিরোধীদলের জন্যে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। ১৩ই ডিসেম্বর ফজলুল হক সাহেব—হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা "শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা" বলে পরিচিত হয়। হক সাহেব তাঁর নিজের দলকে প্রগ্রেসিভ্ মুসলিম লীগ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ঐ নাম আর কেউ গ্রহণ করেনি—হিন্দুরা করেনি কারণ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মুসলিম লীগ সমঝোতা তাদের নিকট ছিল একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। তবু ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশজন বাদে আর বাকি সকল মুসলিম লীগ পরিষদ সদস্যরাই সরকারী দলে যোগ দিল। ফলে পরিষদে মুসলিম লীগের পক্ষে ফলোৎপাদক বিরোধিতা করা সম্ভবপর হলো না। যদিও জিন্নাহ্ সাহেব গর্বভরে বললেন,—

"I make a Christmas gift of Fazlul Haq to the viceroy of India and a New Years Day Present of Nawab of Dacca to the Governor of Bengal."

মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন গণসংযোগের জন্য দেশের অভ্যন্তরে সভাসমিতি করে বেড়াতে লাগলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেব কিছুদিন পরই পরিশ্রান্ত হয়ে কলকাতা ফিরে যান, কিন্তু শহীদ সাহেব ভয়ানক পেটের পীড়া নিয়েও সভা করতে থাকেন। তাঁরা দু'জনে মিলে প্রায় ৮০০ সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রসমাজ প্রথমবারের মত রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কলকাতার ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক হক সাহেবের সঙ্গে থেকে যান। ফজলুল হক ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে জেলা বোর্ডগুলোতে নিজের চেয়ারম্যান বসাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং বগুড়া মোহাম্মদ আলীর স্থলে তাঁর পিতা নবাবজাদা আলতাফ আলীকে চেয়ারম্যান করতে সক্ষম হন।

সে যুগে অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন আধা-সামন্তবাদী সুযোগসন্ধানী লোক। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে সরকারী দল ও বিরোধীদলের সভ্য থাকত। যেমন পিতা আলতাফ আলী কৃষক-শ্রমিক পুত্র মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ, খান বাহাদুর ফজলুল করিম কৃষক-শ্রমিক পুত্র রেজাই করিম মুসলিম লীগ, ফরিদপুরের লাল মিঞা কংগ্রেস তাঁর ভাই মোহন মিঞা মুসলিম লীগ। ঢাকার নবাববাড়ির সৈয়দ আবদুল হাফিজ কৃষক-প্রজা তাঁর ভাই সৈয়দ আবদুস সলিম মুসলিম লীগ। এর কারণ সরকার যে দল গঠন করুক না কেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের যেন তাঁদের বাড়িতে অতিথ্য গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা না হয় সেটার জন্যেই সুপরিকল্পনা।

১৯৪১ সনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র খোলাখুলিভাবে বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস-এর মস্কোতে কূটনৈতিক সাফল্য যার ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি আরো ঘোরাল হয়ে উঠে। বৃটিশ কূটনীতির ব্যাকরণ চিরকালই যুদ্ধ বাধলে তার প্রথম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের দলে ভেরাবার চেষ্টা করে। আর যারা দলে আসতে চায় না তাদের নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করে—তারপর শত্রুকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। প্রথম মহাযুদ্ধেও বৃটিশ যে পন্থা গ্রহণ করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তার পুনরাবৃত্তি করে। স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস মস্কোতে যে সফলতা লাভ করে চার্চিল দীর্ঘদিন চেষ্টা করে রুজভেল্টকে সে পথেই নিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

১৯৪১ সনের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। ঢাকায় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরমে পৌঁছে তখন আমাদের বেচারাম দেউড়ীর বাড়ি ও বলিয়াদির খানবাহাদুর কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের মৌলভী বাজারের বাড়ির মধ্যে একটি মাত্র বাড়ি ছিল সেখানে ছিল মিনার্ভা প্রেসের হিন্দু মালিকরা। তারাই ছিল আমাদের মহল্লায় একমাত্র হিন্দু পরিবার। দাঙ্গা এত আকস্মিকভাবে লেগেছিল যে, তারা আরমানিটোলা পাড়ায় যেটা সম্পূর্ণ হিন্দুপাড়া ছিল সেখানে যেতে পারেনি। তারা প্রাণের ভয়ে

আমাদের বাড়ির পেছনে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। এ কথা মহল্লার লোকেরা অনুমান করেছিল। এবং আমাদের বাড়িতে ঢুকে দেখার জন্য হৈচৈ করেছিল—কিন্তু আমরা তাদের সে চেষ্টা সফল হতে দেইনি। বয়সে আমার বছর ছয়েকের ছোট ছেলেটি যার নাম ছিল "সাইক্লোন" (কারণ তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৯ সনের প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে) তার বোনদের এবং মাকে নিয়ে দোতালায় আমার ঘরে আশ্রয় নেয়। বাইরে যত চীৎকার হচ্ছিল তারা ততই ভয়ে কাঁপছিল। আমি তাদের শব্দ করতে না করে গেটের লোকদের বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, তারা আমাদের বাড়ি আসেনি। প্রায় এক সপ্তাহ তাদের লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল।

১৯৪২ সনের ইতিহাস বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের একটি নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরেই মুসলিম ছাত্রসমাজ সরকার-বিরোধী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

জানুয়ারি মাসে ঢাকার নবাবকে ঢাকা বাইশ পঞ্চায়েতের নিমন্ত্রণে ঢাকা আসার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। লৌহজং, মুন্সিগঞ্জে, নারায়ণগঞ্জে ও সর্বশেষে ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে শহীদ নজীর আহমদ ও বদরুদ্দীন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। কালো নিশান, পচা ডিম ও টমেটো নিক্ষেপের মারফৎ এ বিক্ষোভ পরিচালনার সংকল্প নেয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের ছাত্ররা প্রবল বিক্ষোভ চালায়। নবাব সাহেবকে সে সব স্থানে যে সব ভদ্রলোকেরা স্বাগতম জানাতে এসেছিলেন—তারা প্ল্যাটফরমের কাছেও এগুতে পারেনি। অন্যদিকে ঢাকায় তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন বেচারাম দেউড়ীর খান সাহেব আবুল হাসনাত, সাতরৌজার খানবাহাদুর ফজলুল করিম শেফাউল মূলক হেকিম হাবিবুর রহমান এবং ঢাকার মহল্লা সর্দারগণ। আগেরদিন খবর পাওয়া গেল যে, বিক্ষোভকারীদের উপর চরম হামলা চালনা করা হবে। আমি আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়ি সন্ধ্যাবেলা গিয়ে তাঁকে এবং খানবাহাদুর ফজলুল করিম সাহেবকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে কারণ এটা রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা গণতান্ত্রিক অধিকার এর জন্য তাদের উপর হামলা চালনা করা উচিত হবে না। খানবাহাদুর ফজলুল করিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম যে, আপনাদের কারো কারো সন্তানরাও এ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করবে। আবুল হাসনাত সাহেব ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের আত্মীয়—বৈবাহিকসূত্রে। তিনি আমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, কেউ যদি ঢাকা স্টেশনে কালো নিশান নিয়ে যায় তবে সে জীবন নিয়ে ফিরবে না একথা যেন আমি ছাত্রনেতাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই। ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আমার বিফল আলোচনার কথা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা দমবার পাত্র নয়—স্থির হলো যে, পচাডিম ও টমেটো ব্যবহার করা হবে না—তবে ছেলেরা ভিড়ের মধ্যে কালো কাপড় লুকিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করবে—এবং নবাব সাহেব নামবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে কালো রুমাল উড়াবে—শহীদ নাজির প্ল্যাটফরমে

মুসলিম লীগ নিশান নিয়ে উপস্থিত হবে। নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ্, আবদুস সলিম ও সাহেবে আলম নবাববাড়ির ঐ তিনজন বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সম্মুখে থাকবে যাতে ঢাকার পঞ্চায়েতের লোকেরা ছাত্রদের উপর হামলা না চালায়। তখন পুলিশ সুপার ছিলেন—খাজা শাহাবুদ্দীনের জামাতা আলমগীর কবীর—যদিও তিনি সরকারি চাকুরে তবু তাঁর উপরে আমাদের অনেকটা ভরসা ছিল। আমাদের এও ধারণা ছিল যে, তাঁর পুলিশবাহিনী ছাত্রদের উপর গুণ্ডামি থেকে রক্ষা করবে।

আমরা স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম হাজার হাজার ঢাকার আদিবাসিন্দা হিন্দু-মুসলমান বড় বড় লাঠি নিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সংখ্যা শ'পাঁচেক এর বেশি হবে না। কিন্তু ছাত্রদের সংকল্প ছিল দৃঢ়। যেইমাত্র ট্রেনটি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছেছে তখনই একদিকে যেমন আল্লাহু আকবর, নবাব বাহাদুর জিন্দাবাদ ধ্বনি আরম্ভ হলো—ছাত্ররাও তেমনি কালো রুমাল উড়িয়ে মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ বলে উঠল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল শহীদ নজীর ও বদরুদ্দীন সিদ্দিকী। হঠাৎ আবুল হাসনাত সাহেব হুকুম দিলেন বিক্ষোভকারীদের মেরে স্টেশন থেকে বের করে দিতে আর অমনি লাঠির বাড়ি আরম্ভ হলো। শহীদ নজীরের মাথা ফেটে গেল, কিন্তু সে নিশান হাত থেকে ছাড়ল না—অন্যান্য ছাত্ররা কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পালাবার সময় অনেকে আহত হলো। খাজা নছরুল্লাহ্ এবং সাহেবে আলমও আহত হলো। ছাত্রদের মধ্যে আহতদের সংখ্যা ছিল বায়ান্নজন। শহীদ নজীরকে হাসপাতালে নেয়া হলো—নবাবের মিছিল নবাবপুর রাস্তায় যাবার পরে। শহীদ নজীর জ্ঞান হারালো হাসপাতালে যাবার পথে—অনেক পরে তার জ্ঞান ফিরল। নবাব সাহেব বিকেলবেলা আহতদের দেখতে গেলেন মিটফোর্ড হাসপাতালে —নজীরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে নজীর তাঁকে 'গুণ্ডার রাজা' বলে সম্বোধন করে বসল। নবাব সাহেবের মুখ-চোখ অপমানে রক্তিম হয়ে উঠেছিল—তিনি তাড়াতাড়ি ঐ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সন্ধ্যাবেলা সলিমুল্লাহ্ হলে নবাবের দলের গুণ্ডামির প্রতিবাদে সভা ডাকা হয়। রেজাই করিম সাহেব কথা দিয়েও রেল স্টেশনে না গিয়ে ঐ সভায় বক্তৃতা করার জন্যে উপস্থিত হলে—ছাত্ররা হলঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে তাঁর উপর হামলা চালায়। বহু কষ্টে আমরা কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রভোস্ট ডক্টর হাসানের বাড়িতে নিয়ে যাই। ঢাকার ছাত্রদের উপর এই হামলা সমস্ত দেশে যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন মফঃস্বলের ছাত্ররাও এর পাল্টা প্রতিবাদ করতে সচেষ্ট হলো। নবাব সাহেব তার পরের দিন আহ্সান মঞ্জিলে এক সভায় শহরবাসীদের সম্বোধন করে বললেন যে, ঢাকা শহরের লোকেরা তাঁর মান রেখেছে তার জন্য তিনি 'শুকরিয়া' জানালেন তাঁদের আর বললেন যে, তাঁর বাবার তৈরী বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলো "দেহাতি" ও "ক্ষেতুয়ারা" জোট করেছিল তাঁকে অপমান করার জন্যে। সুতরাং শহরে যে সব "দেহাতি" এবং "ক্ষেতুয়া" বাস করে—তাদের শহর থেকে উৎখাত করা প্রয়োজন হতে পারে। কিছুসংখ্যক দেহাতি ভদ্রলোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেও তাদের ছেলেরা ছাত্রদের দলে ছিল—তাই তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

"ক্ষেতুয়া", "দেহাতি" শব্দ দুটো গালি হিসাবে ব্যবহার করায় মফঃস্বলের ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—এর পর শ্যামাপ্রসাদ কুমিল্লা সফর করেন—সেখানেও ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাল। কুমিল্লার তদানীন্তন পুলিশ সুপার জাকির হুসেন অনেক ছেলেদের গ্রেফতার করে হাজতে পাঠালেন—তাদের মধ্যে ছোট ছোট বালকরাও ছিল। ঢাকার ছাত্রনেতা বদরুদ্দীন সিদ্দিকী তাদের জামিনের জন্যে জাকির হোসেনের সঙ্গে দেখা করলে—জাকির হুসেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে বললেন যে, পাটখড়ির মাথায় সবুজ কাগজ উড়িয়ে পাঠশালার ছাত্ররা পাকিস্তান আনবে—আর সে পাকিস্তানে কোন ভদ্রলোক বাস করবে এটা হতে পারে না—সুতরাং ঐসব চেঙরা ছোকরাদের সাজা পেতেই হবে। মুসলিম লীগ নেতারা ঐখানে না পৌঁছা পর্যন্ত ছাত্রদের জামীন হয়নি। এর পরে ফজলুল কাদেরকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করলে বদরুদ্দীন সিদ্দিকী ঢাকা ছেড়ে যান।

বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আমন্ত্রণে জিন্নাহ্ আসেন সিরাজগঞ্জে ১৯৪২ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি। ঢাকা থেকে অন্যান্যরা ছাড়া শহীদ নজীরের অধীনে প্রায় শ'দুয়েক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র নিয়ে ঐ কনফারেন্সে যান—এই সময় শামছুল হক ও খন্দকার মোশতাক আহমদ ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আবদুল্লাহ্ আল-মাহমুদ ও যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশীদ মাহমুদ ও সৈয়দ আকবর আলী। এই কনফারেন্সের মধ্যে প্রথম আমরা দেখতে পাই—বিভিন্ন নেতার দল ও উপদল গঠনের প্রচেষ্টা এবং কে জিন্নাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তারই পরোক্ষ প্রচেষ্টা। ফরমুজুল হক ও আনোয়ার হোসেন শহীদ সাহেবের দলের, নজীর, শামসুল হক প্রভৃতি ঢাকার ছাত্ররা ফজলুর রহমানের উপদলের। এই কনফারেন্সেই শহীদ সাহেব বাংলা বক্তৃতা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কনফারেন্সের পর কলাকাতায় সবাই ফিরে এলে যাঁদের নাম দেয়া হলো কাগজে তাঁরা হলেন স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, আক্রাম খান, খাজা শাহাবুদ্দীন, হাসান ইস্পাহানী, খাজা নূরুদ্দীন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শহীদ সাহেব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম "স্টার অব ইণ্ডিয়া" কাগজে দেখা গেল না। শহীদ সাহেব কাগজের সম্পাদককে টেলিফোন করে রুষ্ট মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন "Am I etc ?" তাঁর ঐ কথাটা পরে বহুলপ্রচার হয়ে গেছিল মুসলিম লীগ লোকদের মধ্যে কারণ সম্পাদক পরদিন ছোট একটা খবরে ক্ষমা চাইবার নামে বাক্যটি লিখেছিল। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে একটি বইস্টলে দেখা গেল একখানা নতুন বই পাকিস্তান সম্বন্ধে—লিখেছেন হাবিবুল্লাহ্ বাহার। বাহার-নাহার ভাই-বোন ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছিল সুধিমহলে বুলবুলের সম্পাদক হিসেবে। সুতরাং সবাই তাঁর বইখানা একখানা করে নিয়ে নিল। বাহার সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারতেন—তাঁর সঙ্গে কেউ ট্রেনে একই কামরায় উঠতে চাইত না—কারণ সারারাতেও তাঁর কথার শেষ হত না। তিনি জিন্নাহ্ সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক গল্প তৈয়ার করেছিলেন—যেমন জিন্নাহ্র মারবেল খেলার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ক্রিকেট খেলার প্রতি আকর্ষণ। বাল্যকালে

জিন্নাহ্‌র আর্থিক অবস্থা ক্রিকেট খেলার উপযোগী ছিল না। এসব অনর্থক গল্প সৃষ্টি করে সত্যিকার জিন্নাহ্‌কে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গেছে। তাঁর বাল্যকালের ইতিহাস একমাত্র আল্লানা সাহেব যিনি ছিলেন বিশ্বাসী বন্ধু এবং অনুরাগী কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। শহীদ নজীর এ সময় বোধহয় প্রথম বাহার সাহেবের সান্নিধ্যে আসেন এবং খবরের কাগজ চালানো সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে বিস্তর আলাপ-আলোচনা করেন। শহীদ নজীরের ও বাহার সাহেবের মধ্যে আলোচনার সময় ঢাকায় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবটা বুঝতে পারেনি কারণ দু'জনই নোয়াখালী জেলার অধিবাসী বলে তারা তাদের ডায়েলেক্টে আলোচনা করছিলেন। এটা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, সিলেট, চিটাগাং ও নোয়াখালী জেলার লোকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে সাধারণ বাংলার পরিবর্তে নিজেদের ডায়েলেক্টে আলোচনা করতে ভালবাসেন। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স থেকে ফিরে এসেই শহীদ নজীর একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করার প্রস্তাব ফজলুর রহমান সাহেবের নিকট উল্লেখ করেন—ফজলুর রহমান সাহেবের সম্মতি লাভ করে অবাঙালী রফিক সাহেব ও এ. কে. ফজলুল হক (মাওলা মিঞার) আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে "পাকিস্তান" কাগজটি বের করে। প্রথমেই সাপ্তাহিক কাগজ বের না করে দু'সপ্তাহ পরে পরে কাগজখানা বেরুতে থাকে। লেখা যোগাড় করা, প্রেসে বসে প্রুফ দেখা, তারপর গ্রাহক সৃষ্টি করা, কাগজের যোগাড়—পোষ্ট করা বেশির ভাগ কাজই নজীরের একাই করতে হয়েছে। অনেকদিন গভীর রাতে দরজার খট্ খট্ আওয়াজ, প্রায়ই খুলে দেখতাম নজীর—আমার স্ত্রীকে বলত খাওয়া হয়নি। আমাদের খাওয়া শেষ—একদিন তো বাসিভাত খেয়েই খুশী—তার জন্যে আর শামসুল হকের জন্যে ঘরে কিছু না কিছু খাবার রাখতে হত—তাদের আসার কোন স্থিরতা ছিল না—হঠাৎ কখন হুট করে আসবে বলা যেত না।

ঐ পত্রিকায় আমার লেখায় একটি মাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় থাকত—সে হচ্ছে 'ভারত কোনদিনই একটি দেশ ছিল না'—মোঘল ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর সৃষ্টি ভারতবর্ষের যে রূপ সে তৈরি হয়েছে বেয়নেটের জোরে, স্বেচ্ছায় নয়। আমার লেখা বেরোত তখনো "শহীদ আহমদ" নামে। শহীদ আমার বড় ছেলের নাম। আমার বড় ছেলে ১৯৪১ সনের ১১ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করে। আমি যেহেতু সরকারি চাকুরী করি—সেহেতু তার নামেই আমাকে লিখতে হত। একদিন আমার এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর এক উদ্ধৃতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ভারতে একটা জাতি সৃষ্টি করার প্রয়াস অনেকটা সুইজারল্যাণ্ডের বিরাট নৌবাহিনীর সৃষ্টির পকিল্পনার মতই অবাস্তব হতে বাধ্য। এজন্যে ফজলুর রহমান সাহেবও লেখাটা ছাপতে নিষেধ করেন। আমার যুক্তি ছিল যে, লাহোর প্রস্তাব খণ্ড ভারতের প্রস্তাব—ইসলামিক রাষ্ট্রের নয়। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব দ্বি-জাতি ভিত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন ভারতে বহু জাতিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এর পর "পাকিস্তান" কাগজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কমে গেল।

এর পর এল নাটোর ও বালুরঘাটের উপনির্বাচন—মুসলিম লীগের সংগ্রামের পরীক্ষা। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ল—কলকাতার

ছাত্রদের মধ্যে যেমন দলাদলি ছিল তা ঢাকায় ছিল না—ছাত্ররা বিয়াল্লিশ সন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ফজলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ছিল। নাটোরে ও বালুরঘাট উপনির্বাচনে শেরেবাংলার বিরুদ্ধে কি কৌশল খাটানো হবে তাই হলো আমাদের সমস্যা। স্থির হলো যে, শেরেবাংলাকে নানা প্রশ্ন করা হবে। যুদ্ধাবস্থার জন্যে দেশে তখন আকাল আরম্ভ হয়েছে—কেরোসিন নেই, অনেক জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। কোথাও শেরেবাংলার সভা হবে জানতে পারলেই ছাত্ররা ঢেড়া পিটিয়ে দিত যে, ঐ সভায় কেরোসিন দেয়া হবে। সকল লোক বোতল নিয়ে, টিন নিয়ে উপস্থিত কিন্তু কেরোসিন বিক্রির কোন ব্যবস্থা নেই। তাই সাধারণ মানুষ ঐ সভা ছেড়ে এসে অদূরে যেখানে মুসলিম লীগ গ্রামোফোনে গানের ব্যবস্থা করেছে সেখানে চলে যেত—আর সে ফাঁকে মুসলিম লীগের পার্টির জন্যে সোজা ক্যানভাস না করে শেরেবাংলা ও তাঁর লোকেরা কত বড় ধাপ্পাবাজ এটাই তাদের বোঝানো হত। প্রতি সভায় ক্রমগত কৌশল পরিবর্তন করতে হত—করণ শেরেবাংলা একবার যদি দেশের লোকদের তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে গল্প বলতে আরম্ভ করেন তবে মুসলিম লীগের পরাজয় অনিবার্য। শেরেবাংলা কোন রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন না—দেশের লোকদের তিনি গল্প বলে সব কথা বোঝাতেন। আজকালকার মত শ্রেণীসংগ্রামের কথা তখনো নেতারা শোনেননি যদিও ১৯১৯ সনের পরে এবং বিশেষ করে ১৯২৯ সনে শ্রেণীসংগ্রামের কথা তখনকার যুবকদের অজানা ছিল না—বিশেষ করে হিন্দু যুবকদের। আমাদের কৃষক সম্প্রদায় ১৯৪২ সনেও ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাসী ছিল। সবকিছুর জন্যেই খোদার উপর নির্ভর করত। তাঁরা ধর্মপরায়ণ না হলেও ধর্মকে বড় বলে মনে করত।

শেরেবাংলার গল্প আবার স্থানকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ নিত। যেমন রেজাই করিম সাহেব ও সাহেবে আলম (কালু মিঞার) ঢাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নিরেট মুর্খ কালু মিঞার পক্ষে বক্তৃতা করতে এসে বলেছিলেন,—"দেশের নায়ের মাঝি আমিই আছি আমার প্রয়োজন মাল্লার। রেজাই করিমের মত এমন একজন বুদ্ধিমান ও নামকরা উকিলকে আমি মাল্লা হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না। মাল্লা হতে পারে কালু মিঞা—আমি মাঝি আমি দেশের হাল ধরি এই যদি আপনারা চান তবে কালু মিঞাকে ভোট দেন আর যদি মনে করেন আপনাদের মাঝি বদলানো প্রয়োজন তবে রেজাই করিমকে ভোট দেন। আমি হাতের বৈঠা ছেড়ে আবার ওকালতি করব।" অন্য এক সভায় বললেন,—"আমার মন্ত্রিত্ব রাখার বিপদ হচ্ছে যে, বুদ্ধিমান পরিষদ সদস্যরা কেবলই লাফ দিয়ে অন্য নায় উঠতে চায় আমার প্রয়োজন এমন লোকের যে, পাথরের মত পকেটে থাকবে বেঙের মত লাফাবে না।"

শেরেবাংলা এর পর মুর্শিদাবাদের উপনির্বাচনে সৈয়দ বদরুদ্দোজার জন্য বক্তৃতা করতে গেলেন। তাঁদের প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ভাইসব আপনারা যখন হাটে বা বাজারে যান মাটির হাঁড়ি আমরা যাকে বলি রাইং কিনতে তখন কেনার আগে বাজিয়ে নেন কি না ? কেউ রূপার টাকা দিলে তা বাজিয়ে নেন কি না ? "সমস্বরে উত্তর এল জী হ্যাঁ।" হক সাহেব তখন বদরুদ্দোজাকে বললেন,—"পাঁচ মিনিট বাংলায় বক্তৃতা কর ত

তুমি", অমনি বদরুদ্দোজা তাঁর সেই কর্ডোভা, গ্রানাডা থেকে আজকের অবহেলিত, পদ-দলিত, নির্যাতিত মুসলমানদের ইতিহাস ওজস্বিনী ভাষায় বলতে লাগলেন। হক সাহেব আবার তাঁকে পাঁচ মিনিট উর্দুতে বলতে বললেন। একইভাবে এক-ই কথা বদরুদ্দোজা বলে গেলেন। হক সাহেব আবার তাঁকে বললেন, ইংরেজীতে এবার বলো দেখি—অমনি বদরুদ্দোজা দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে একইভাবে বক্তৃতা করে গেলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হক সাহেব বললেন,—"দেখুন আমি আপনাদের জন্যে যে প্রার্থী এনেছি সে রূপার টাকার মত বাজে না মেকী টাকার মত বোবা।" গাঁয়ের লোক কি জানত যে, রেজাই করিম ভাল উকিল ও সুবক্তা তাই তিনি ব্যাঙ আর বদরুদ্দোজা একই কারণে আসল রূপার টাকা?

সুতরাং শেরেবাংলাকে বক্তৃতার সুযোগ আমরা দিতে চাইনি। আমাদের কৌশল সফল হয়েছিল। এর ফলে তাঁর সঙ্গে যে সব সদস্যরা চলে গিয়েছিল তারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর দল ছেড়ে মুসলিম লীগে ফিরে আসতে আরম্ভ করল—তাদের সেজন্যে মাঝে মাঝে নগদ বিদায় করতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের যুদ্ধে যোগ দেবার পর থেকে যুদ্ধ আমাদের বাড়ির কাছে চলে এল। এবং মার্চ মাসে রেঙ্গুন দখল করায়—বর্মার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেনাপতি জেনারেল স্লীম (পরবর্তীকালে "ফিল্ড মার্শাল") মাংডো, বুম্‌ডিং ছেড়ে বাংলাদেশে তার সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে এলেন। ফলে জাপানী সৈন্যরা নাফ নদী পর্যন্ত তাদের দখল বিস্তার করতে পারল—বিরাটকায় যুদ্ধজাহাজ "প্রিন্স অব্ ওয়েলস্" ও "রিপালস" ধ্বংস, সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশ জাপানের অধীনে চলে এল—সুতরাং এবার বাংলাদেশের পালা। নেতাজী সুভাষ বসু "আজাদ হিন্দু ফৌজ" গঠন করে "দিল্লী চলো" শ্লোগান দিয়ে ভারত আক্রমণের পায়তারা আরম্ভ করল। জাপানীরা অতি অল্প সময়ে—এত দেশ করায়ত্ব করে ফেলেছিল যে, সে সব দেশে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করাই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু "আজাদ হিন্দু ফৌজ" ও নেতাজীকে সাহায্য করার জন্য তাদের বিমানবাহিনীকে নির্দেশ দেয়—কিন্তু বৃটিশ সরকার তখন এত ভীত ও সন্ত্রস্ত যে, তারা 'বাংলাদেশ' খোয়া যাবে ধরে নিয়ে বিহারের রাঁচীতে তাদের রক্ষণ ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করে দিল—আর জেনারেল স্লীম তার সৈন্যদের ব্যারাকপুরে এনে নতুন করে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে গড়ে তুলতে থাকে।

এতকাল বর্মার চালের উপরই ভারতবাসী নির্ভর করত—বিশেষ করে বাংলাদেশ। বর্মার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে গেল। আরাকানের চাল পাবার জন্যে বৃটিশ সরকার আরাকান অঞ্চলের মুসলমান যুবকদের নিয়ে একটি "মোজাহেদ" বাহিনী গঠন করার ফলে সাম্পানে করে কিছু কিছু চাল সরবরাহ চলতেছিল। বর্মার লোকদের সঙ্গে আরাকানের মুসলমানদের সম্পর্ক চিরকালই তিক্ত ছিল—বর্মার লোকজন জেনারেল আউঙ্গসানের নেতৃত্বে জাপানীদের সমর্থন করলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, "মোজাহেদ" বাহিনী তার ফলে বৃটিশকে সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

রেঙ্গুনের পতনের পর ভারতবাসীরা দলে দলে বর্মা ত্যাগ করতে থাকে। বৃটিশ সরকারের অনুগত লোকজন জাহাজে বা বিমানে ভারতে আসে বাকি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় উত্তর বর্মার ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রওনা হয়। ভারতবাসীরা তাদের উপর যে শোষণ চালিয়েছিল তার প্রতিশোধ এতদিনে বর্মীরা নিতে আরম্ভ করল। বৃটিশ বেয়নেটের সাহায্যে ভারতীয়রা যে অত্যাচার করেছে অর্ধশতাব্দী ধরে—তা ক্ষমার অযোগ্য। তাই জাপানীরা বর্মা দখল করার পর জাপানীদের বাধা না দিয়ে ভারতীয় হত্যা করতে থাকে সুতরাং তাদের পক্ষে পালানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পালাবার পথে রোগে-শোকে জর্জরিত হয়ে, অনাহারে হাত-পা ভেঙ্গে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো—কত লোক গেল হিংস্র বাঘের পেটে—কত লোক মরল সর্পাঘাতে তার কোন হিসেব করা হয়নি। দিল্লীতে বর্মার নির্বাচিত সরকার এসব ছিন্নমূল ভারতীয় যারা বেশির ভাগই বাংলার অধিবাসী তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্যে একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করল। প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হলো এস. কে. ঘোষ (পেন্সনপ্রাপ্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক) আর খানবাহাদুর ফজলুল করিম সাহেব হলেন অতিরিক্ত প্রশাসক। এই প্রশাসকরা যেভাবে ছিন্নমূল বাস্তুহারা মানুষের দুঃখ-দৈন্যের সুযোগে বহু টাকার মালিক বনে গেছিল সে ইতিহাস কলঙ্কময়—যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আরো আলোকপাত করা হবে।

মস্কোতে বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করার পরে বৃটিশ সরকার ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্যে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে পাঠালেন মার্চ মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতির পরই। এমনি অদ্ভুত সময়ে সমস্যা সমাধানের আলোচনার জন্য বৃটিশ সরকার কেন তাকে পাঠালেন তা আমি আজো বুঝতে পারিনি। যখন অপরাজেয় জাপানী সেনাবাহিনী বর্মা দখল করেছে নেতাজী সুভাষ বসু সায়গন রেডিও থেকে ভারতবাসীদের বিদ্রোহ করার জন্যে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন—হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য আজাদ হিন্দু ফৌজে যোগ দিয়ে আসামের ইম্‌ফলের দিকে এগিয়ে আসছে—এবং ১৯৪০ সনে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে জিন্নাহ্‌র যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তা তখনো তার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি, তখন কোন সমাধান কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে—তা বৃটিশ সরকার কি করে ভাবলেন বোঝা সত্যিই দুরূহ। ক্রীপস্‌-এর প্রস্তাব ছিল যে, ভারতে একটি "ফেডারেল ইউনিয়ন" গঠন করা হবে কিন্তু কোন প্রদেশ যদি ঐ ইউনিয়নে যোগ না দিয়ে বাইরে থাকতে চায় তবে সেসব পার্টির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। কংগ্রেসের নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ পরোক্ষভাবে এ প্রস্তাবে পাকিস্তানের বীজ নিহিত ছিল কারণ এতে সম্ভাবনা থাকল যে, মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহ হয়ত ফেডারেল ইউনিয়নের বাইরে থেকে যাবে। মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ যে সব প্রদেশ বাইরে থেকে যাবে তারা কোন ইউনিয়ন গঠন করে প্রস্তাবিত ফেডারেল ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করার স্বীকৃতি প্রস্তাবে ছিল না। প্রস্তাবে তাদের ১৯৩৫ সনের আইনের আওতায় রাখার ব্যবস্থা কেবল থাকল। মুসলিম লীগ যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায়

দলীয়ভাবে যোগ দিতে অস্বীকার করাই ছিল স্বাভাবিক। গান্ধীজি বললেন, "প্রস্তাবিত সমাধান যুদ্ধের পরে কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে।" যুদ্ধে যখন বৃটিশ সরকারের জয়ী হবার আশা খুব কম তখন ক্রীপ্‌সের প্রস্তাব—একটি "Post dated cheque on a crashing Bank" ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ঐ প্রস্তাব কোন আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না।

এর পর কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া পথ থাকল না—কারণ প্রথমতঃ বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের ভিত্তি মেনে নিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ জাপানী বিমানবাহিনী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও কলকাতায় বোমাবর্ষণ আরম্ভ করেছে—তাই গান্ধীজির মতে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বিদ্রোহ করার। আগস্ট মাসে "ভারত ছাড়" (Quit India) আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করল—জিন্নাহ্‌র মতে বৃটিশ সরকার ভারতকে বিভক্ত না করে পাততাড়ি গুটাতে পারে না তাঁর মতে 'আগে ভাগ পরে স্বাধীনতা' (Divide and Quit)। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল ভারতের প্রতিটি প্রদেশে। মুসলমানরা বিদ্রোহে যোগ দিচ্ছে না বলে হিন্দুরা তাঁদের দেশের শত্রু ও বৃটিশের গোলাম বলে আখ্যায়িত করতে লাগল, ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মুসলমানরা ভাবল গান্ধীজির "ভারত ছাড়" আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের কোন দাবী না মেনে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ক্ষমতা দখল।

বাংলাদেশে তখন শ্যামা হক মন্ত্রিসভা চলছিল। বিহার এবং উড়িষ্যার সংলগ্ন এলাকা মেদিনিপুর জেলা, জয়প্রকাশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ অনেক ভলান্টিয়ার "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময় মেদিনিপুরে ঢুকে কৃষাণদের বিদ্রোহ করার জন্যে পরামর্শ দেয়। অবশ্যই মেদিনিপুরে বহুদিন যাবতই কৃষাণরা নানা কারণে মাঝে মাঝে সরকার-বিরোধী আন্দোলন করেছে। মাহিস্য সম্প্রদায় চিরদিনই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। আমি আমার পূর্ব প্রকাশিত ইতিহাস বইতে বলেছি যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই রাঢ় বা লাঢ় দেশের (অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান বিভাগ) লোকেরা ছিল রূঢ় স্বভাবের। বহুদিন পর্যন্ত অন্য কোন সভ্যতা সেখানে ঢুকতে পারেনি। তাদের সংস্কৃতির মিল হচ্ছে ছোট নাগপুরের নিষাদ সংস্কৃতির সঙ্গে। জৈন, বুদ্ধ ও ইসলাম পূর্ববঙ্গের মত সেখানে স্থান করতে পারেনি। ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ঐ দেশ এবং বাইরের লোক ওখানে গেলে তাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিত। মোটামুটিভাবে তারা "ট্রাইবাল ইনস্টিংটে" চালিত মুক্ত স্বাধীনভাবে জীবন গড়ার পক্ষপাতি। মেদিনিপুরে লবণ আইনভঙ্গের অপরাধে পুলিশের অত্যাচার ও বিদ্রোহের কথা বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও শোনা গেছে। সন্ত্রাসবাদীরা একে একে তিনজন শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছে। সুতরাং "ভারত ছাড়" আন্দোলন এখানে হিংসাত্মক রূপ নেয়। তমুলুকের মাতগিঙ্গী হাজরার নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এন. এম. খান (নেয়াজ মোহাম্মদ খান) আই. সি. এস. তখন মেদিনিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশবাহিনী তাঁর আদেশে বিদ্রোহীদের দমন করতে হিমসিম খেতে থাকে তাই সেখানে সৈন্য ডাকা হয়। তারা বিদ্রোহ কঠিনভাবে দমন করে। মাতঙ্গিনী হাজরা বুলেটের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

মেদিনিপুরে যেতে চাইলে পাঞ্জাবী এবং মুসলিম লীগপন্থী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণরকে জানিয়ে দেয় এ পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মেদিনিপুর এলে অবস্থার অবনতি হতে পারে তাই তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া উপায় থাকবে না। পরিষদে এর বিরুদ্ধে যখন তুমুল আলোচনা হয় তখন ফজলুল হক সাহেব একটি "ইনকোয়েরী কমিশন" বসান হবে বলে ঘোষণা করেন। গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট ফজলুল হকের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠায়। ফজলুল হক কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করেন। শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে একমাত্র পথ ছিল পদত্যাগ করা। বোধহয় ফজলুল হকেরও তাই করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি গভর্ণরকে কৈফিয়ৎ না দিয়ে এক খোলা চিঠি লিখে পাঠান : আমার Socio-Political History দ্রষ্টব্য।

১৯৪১ সন থেকেই ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। মাঝে মাঝে শান্তি ফিরে আসলেও একটা থম থম ভাব সর্বসময় বিরাজ করছিল। ১৯৪২ সনে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। ১৯৪২ সনের শেষের দিকে গুপ্তহত্যা ও স্থানে স্থানে দাঙ্গা সংগঠিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দেয়। মেয়েদের হোস্টেলে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে মুসলমান মেয়েদের প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাদের হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয় হিন্দু মেয়েরা। কারণ মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ১৯৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে মাঝে মাঝে হকি স্টিক নিয়ে দলবদ্ধভাবে মারামারি চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে একটা সমঝোতার চেষ্টা চালান শহীদ নজীর ও অন্যান্য ছাত্রনেতারা কিন্তু পরের দিন আবার ঘোর উত্তেজনা দেখা দিল। শহীদ নজীর আবার তাদের মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য হিন্দু ছাত্রনেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য গেলে একজন হিন্দু ছাত্র অতর্কিতে তাঁর পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। নজীর সেখানেই পড়ে যায় এবং হাসপাতালে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সামরিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মার্চ মাসের ২৭ তারিখে গভর্ণর ফজলুল হককে বাধ্য করলেন পদত্যাগ করতে। তার প্রায় এক মাস পরে ২৪শে এপ্রিল স্যার খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। ঠিক এ সময়ে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করা নিয়ে মুসলিম লীগ মহলে যথেষ্ট মতৈদ্বধতা ছিল। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির খবর আসছে অনেক গাঁ-গ্রাম থেকে—মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কলকাতা ও অন্যান্য শহরের রাস্তায় অসংখ্যা জনসমুদ্র ভাতের ফ্যানের জন্য কেঁদে কেঁদে গৃহস্থের দুয়ারে এসে দরজার কড়া নাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেউ বললে যে, মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা অর্থ অজস্র মৃত্যুর জন্য দায়ী হওয়া, আর একদলের মতে—যারা এই সঙ্কটমুহূর্তে দায়িত্ব এড়াতে চায় তারা জনগণের নেতা হবার অনপোযুক্ত এবং দল হিসেবেও তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকা উচিত নয়। সহস্র সহস্র লোক যখন মৃত্যুমুখে তখন ঘরের জানালা থেকে সে বিয়োগান্তক নাটক দেখার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। স্থির হলো মন্ত্রিসভা গঠন করে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যতটা সাহায্য করা যেতে পারে তাই করা মনুষ্যত্বের কাজ হবে।

১৯৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই চালের দাম বৃদ্ধির আভাস আমরা পাচ্ছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় চালের দাম হঠাৎ চার টাকা মন থেকে আট টাকায় উঠে যায়। হঠাৎ এতটা বাড়ায় সাধারণ লোকের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়। মুসলিম লীগের অনুরোধে কলকাতা 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স' থেকে ঢাকায় স্বল্পমূল্যে চাল বিতরণের জন্যে হাজার দুয়েক মন চাল এসে পৌঁছল কিন্তু এরই মধ্যে চালের দাম তেরো টাকায় উঠে গেল। বেচারাম দেউড়ীর মহল্লার লোকদের মধ্যে চাল বিতরণের ভার আমাকে দেয়া হলো। চাল আসতে আসতে অক্টোবর—প্রতি সপ্তাহেই তখন দু'চার টাকা করে চালের দাম বৃদ্ধি পেতে লাগল। এতদিনে বর্মার পতনের অনিবার্য ফল ফলতে আরম্ভ করল। মহল্লার লোকরা সবাই এল—চাল মাপ চলছে—কেউ কেউ নিয়েও গেছে। এমন সময় মহল্লার সর্দার এসে তাদের চাল নিতে নিষেধ করল। আমি বললাম কেন কি হয়েছে—সর্দার উত্তর দিল শাহ্‌জাদা মিঞার (আবুল হাসনাত সাহেব) হুকুম। সবাই একে একে চলে গেল—চোখে তাদের পানি। যারা চাল নিয়ে গেছিল তারাও চাল ফেরৎ নিয়ে এল। আমি তখনই হাসনাত সাহেবের বাড়ি গেলাম তাঁকে বোঝাতে। কিন্তু তিনি বললেন, তাঁর মহল্লায় বসে মুসলিম লীগের চাল দেয়ার নামে 'মুসলিম লীগ' প্রচার করতে আমি দেব না। আমার সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হলো। তিনি একেবারেই রাজী হলেন না—এবং আমার এটা জানা ছিল—তাঁর মতের বিরুদ্ধে মহল্লার লোক না খেয়ে থাকলেও মুসলিম লীগের চাল নেবে না—সে সাহস তাদের নেই। আমি চাল তুলে রেখে মুসলিম লীগ নেতাদের পরামর্শ চেয়ে পাঠালাম। নভেম্বরে চালের দাম বাইশ টাকায় দাঁড়ালো। নভেম্বরে রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ এসে আট টাকা দরে চাল নিতে লাগল। তাও পুরুষরা আসতে সাহস পায়নি—এসেছে মেয়েরা বোরকাবৃত হয়ে। আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আবুল হাসনাত সাহেবের তাঁর মহল্লার লোকের উপর।

১৯৪৩ সনের এপ্রিল মাসে চালের দাম চল্লিশ টাকায় উঠল। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় ঢাকা থেকে স্যার নাজিমুদ্দীন তাঁর ভাই খাজা শাহাবুদ্দীনকেও মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। আমি আর শামসুল হক, ফজলুল রহমান সাহেবকে খুব করে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর জন্যে প্রার্থী হন। আমাদের দু'জনেরই তাঁর সংগঠন শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল—এবং এটা আমি বিশ্বাস করতাম যে, আহ্‌সান মঞ্জিলের নেতৃত্বের সমাধি রচনা করার একমাত্র উপায় মুসলিম লীগ সংগঠনকে মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে আনা। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব আমাদের বোঝালেন যে, মধ্যবিত্তের পক্ষে শাসনক্ষমতা দখল করা যেতে পারে কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে এবং সেটা করা সম্ভব তাদের মধ্যে থেকে—বাইরে থেকে তা পারা যাবে না। আহ্‌সান মঞ্জিলের নেতৃত্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নয়—সেটা তারা প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের রাজনৈতিক এজেন্সীর মারফৎ। যেমন ময়মনসিংহে খানবাহাদুর নূরুল আমীন ও খানবাহাদুর আবদুল হামিদ চৌধুরী, বরিশালে খানবাহাদুর হেমায়েতউদ্দীন, আজিজুদ্দীন, কুমিল্লায় খানবাহাদুর আবেদুর রেজা চৌধুরী ও খান

সাহেব ফরিদউদ্দীন, চট্টগ্রামে নূর আহমদ ও রফিউদ্দীন সিদ্দিকী, ফরিদপুরে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা), নোয়াখালীতে রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী এমনিভাবে সারা বাংলায় তাঁদের এজেন্ট রয়েছে। নাজিমুদ্দীন সরকার জেলার কোন কাজই করবে না তাঁর এজেন্টদের মারফৎ না এলে, তাই তাঁদের জেলায় তাঁদের নেতৃত্ব—তাঁরাই জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। ফলে তাঁদের যাঁর যাঁর জেলার উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আর তাঁরা আবার সবাই খাজা ভাইদের তাঁবেদার। ঐ ব্যূহ কেবল মুসলিম লীগ সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করেই ভাঙ্গা যাবে না, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দাবার চালের ভিতর দিয়ে অভিজাত নেতাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন যে, ফজলুল হক তাঁর নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি যদিও দেশের সাধারণ মুসলমান সমাজ মোটামুটিভাবে তাঁর পক্ষেই ছিল। তাই আমি শহীদ সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে খাজা শাহাবুদ্দীনকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ করতে রাজী করেছি যাতে আমার শাহাবুদ্দীনের স্থানে "চীফ্‌হুইপ" হওয়া সম্ভব হয়। আমাদের এখন একমাত্র চিন্তা হচ্ছে এমন একজনকে জেনারেল সেক্রেটারী করা যে আভিজাত্যও দাবী করতে পারে আবার মধ্যবিত্তের সঙ্গেও কাজ করতে পারে।

আমাদের মতের ঐক্য হলো না। কারণ আমরা বেশি পক্ষপাতি ছিলাম সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার। ক্ষমতা পাওয়ার চেয়ে ক্ষমতাকে মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে আনা। আমাদের মনে হলো যে, তিনি মধ্যবিত্তের রাজনীতির প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন এবং অভিজাত শ্রেণীতে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করেছেন। মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর সত্যিই তিনি "চীপ্‌হুইপ" নিযুক্ত হলেন—তারপর আর একধাপ অগ্রসর হলেন সৈয়দ আতিকুল্লাহ্ সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করে। আমাদের ধারণা ঠিকই হলো এবং এর পর তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। যদিও তখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেনি। সৈয়দ আতিকুল্লাহ্‌র কন্যার জামাতা হিসেবে তিনি প্রায় বাংলার সব অভিজাত ঘরের সঙ্গেই আত্মীয়তা দাবী করার অধিকার পেলেন এমনকি তিনি নিজকে নবাব আলী চৌধুরীদের চেয়ে বড় মনে করেছিলেন কারণ সৈয়দ আতিকুল্লাহ্ সাহেবকে তাঁরাই কুলিন হিসেবে জামাতা এনেছিলেন। ফজলুর রহমান সাহেবের ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু কোন ভাষার উপর দখল না থাকার জন্যে সমাজসেবার যে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর স্ত্রী সেটা পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করলেন।

মুসলিম লীগ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপর ভার পড়ল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। তিনি কলকাতা রেডিও থেকে শপথ নেবার পরই এক বক্তৃতায় বললেন যে, "আমরা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরার প্রচুর সম্ভাবনা, দেশে চাল নেই, চাল কেনার জন্য মুসলিম লীগ সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু চাল যদি সংগ্রহ করা যায় তবু এ যুদ্ধাবস্থায় চাল পৌছান সব মহকুমায় সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমরা চেষ্টা করব গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খুলতে, চাল সবাইকে দেয়া যাবে না—আপনাদের আটা, বাজরা, ভুট্টাও খেতে হবে—জীবনটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য। লোক যাতে বেশি না মরে তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব—আপনাদের সহযোগিতা চাই। আল্লাহ্ আমাদের সহায়।"

শহীদ সাহেবের প্রথম কাজ হলো রাজধানী কলকাতা শহরে রেশনের ব্যবস্থা করা। এ সম্বন্ধে কারো কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে দু'জন দক্ষ লোক নিয়ে কলকাতার জন্য রেশনের একটি পরিকল্পনা তৈরী হলো তারপর ঢাকা, চিটাগাং-এর পরিকল্পনা। রেশন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বিপদ সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখা। যেখানে সব জিনিসের অভাব সেখানে এ সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখা খুবই শক্ত। ঐ সময় আমি দেখেছি শহীদ সাহেবকে দিনে আঠার ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে। তাঁর যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কি করে মানুষকে বাঁচাতে হবে। বাধা অনেক। যখনই দেশে অভাব আসে তখনই ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—দুর্নীতি, কালোবাজারী, ঘুষ, সবই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতনের পর মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়েছে—সুতরাং হিন্দুদের খবরের কাগজে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিয়োদ্গার অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ শ্যামা-হক মন্ত্রিসভাই হিন্দু বুর্জেয়াঁর বাংলায় সরকারি ক্ষমতার অংশীদার হবার শেষ ব্যর্থ চেষ্টা। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি বা সহায়তা পাওয়া অসম্ভব। তার উপর বাংলার মুসলমানদের খবরের কাগজ "নবযুগ" ও "আজাদ" দু'টো বাংলা কাগজ। আজাদের লেখকরা নবযুগের লেখকদের সমকক্ষ ছিলেন না। নবযুগের শক্তিশালী লেখকদের সমাবেশ করেছিলেন শেরেবাংলা। সম্পাদক কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ জনাব আবুল মনসুর আহমদ, সহ-সম্পাদক দু'জনেই তাঁদের শক্তিশালী কলম চালাচ্ছিলেন—মুসলিম লীগ সরকার ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে। কবি ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। আবুল মনসুর সাহেব সাংবাদিকতার ভিতর দিয়ে মসুলিম লীগকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন তিনি তাঁর "ফুড্ কনফারেন্স" পুস্তকে স্যার নাজিমুদ্দীনকে "মহিষে বাংলা", শহীদ সাহেবকে "কুত্তায়ে বাংলা" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে ব্যাঙ্গ পুস্তক "আয়না" লিখে সুধী সমাজে যথেষ্ট নাম করেছিলেন—ফলে "ফুড্ কনফারেন্স" মুসলিম লীগ সরকারকে দেশের সাধারণ লোকের কাছে যথেষ্ট হেয় করতে সমর্থ হয়েছিল।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ কাগজ 'আজাদ'ও শহীদ সাহেবের পক্ষে ওকালতি করার জন্যে ব্যস্ততা দেখায়নি ঘরোয়া দলাদলির কারণে। সত্যি বলতে মুসলিম লীগের অনেকেই মানুষের দুর্দশার জন্য শহীদ সাহেবকেই দায়ী (escape goat) করতে সচেষ্ট ছিলেন। এ সময় মুসলিম লীগের পরিষদ সদস্য আবুল হাসিম সাহেবও বেসরকারী সরবরাহ মন্ত্রীর বেশ কড়া সমালোচনা করেন।

কিন্তু নভেম্বর মাসে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত করা প্রয়োজন হলো, কারণ শহীদ সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে সে পদ ছাড়তে হলো, তখন আবুল হাসিম সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাতক্ষীরার আবুল কাসেমকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করে ৭ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। পরদিন সাধারণ অধিবেশনে তিনি তাঁর কার্যসূচী উপস্থিত করে যে বক্তৃতা দান করেন তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন যে, মুসলিম লীগ তিন

স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যার সলিমুল্লাহ্‌র সময় থেকে "নেতৃত্ব" বন্ধক আছে 'আহ্‌সান মঞ্জিলে', "প্রচার" বন্ধক রয়েছে দৈনিক 'আজাদ'-এর মালিকের কাছে আর "আর্থিক" বন্ধক রয়েছে 'ইস্পাহানী'র নিকট। আমি চেষ্টা করব ঐ বন্ধকসমূহ থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মধ্যবিত্তকে তাদের যোগ্য স্থানে বসাতে। নেতারা অবশ্যই কেউ এসব কথাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি তখন এবং সবাই মনে করেছিল যে, রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই এমন সব কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। আমরা যারা ঢাকার রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম আমাদের নিকট কিন্তু এ বক্তৃতা বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হয়েছিল। তাই আমরা জনাব আবুল হাসিম সাহেবকে ঢাকা যত সত্বর আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাই।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তে-ভাগা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হয় এবং উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়নি। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে—অর্ধমৃত মানুষকে শেয়ালে খেয়েছে। ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে মানুষে-কুকুরে লড়াই হয়েছে—অন্যদিকে কালোবাজারী, মুনাফাখোরদের কারসাজীর ফলে তাদের ব্যাংক একাউন্ট ফেঁপে উঠছে। সব রকম পাপ সমাজদেহে ঢুকেছে—সমস্ত দেশটার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এতদিন সাধারণের যা ধ্যানধারণা ছিল তার উপরে এল আঘাত। রায়ত-প্রজার বিপদে পড়লে মনিবের সাহায্য পেয়েছে—এখন যখন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দু'টো চালের জন্যে তাদের কাছে গেল তখন দেখা গেল যে, সে গোলাভরা ধান থেকে এতটুকুন সাহায্য তারা পেল না। কালোবাজারে তাই বিক্রি করে তারা পয়সা করছে। ঢাকার সিনেমা হলগুলোর সামনে যখন ভাত ভাত করে মানুষ মরে গেছে বা মরছে—তখনো সিনেমা হাউস ভর্তি (House full) লটকিয়ে দিয়েছে। নতুন কণ্ট্রাক্টররা পয়সা করেছে, দামী সিগারেটের টিন এক হাতে অন্য হাতে "ব্রীফ্‌কেস" যার মধ্যে নানা কোম্পানীর নামের রাবার স্ট্যাম্প—আর হিসাবপত্র। দেখতে দেখতে ১৯৪৪ সনের দিকে চালের দাম একশত টাকারও কিছু উপরে উঠে গেল। লঙ্গরখানায় খেয়ে খিচুরী গলায় আটকে লোক মরছে—অগণিত মানুষের কঙ্কালগুলো শহরে হেঁটে চলেছে। মানুষ মানুষের উপর সকল শ্রদ্ধা হারালো, সত্য ও ন্যায় বলে কোন কিছু আছে এটা আর মৃত্যুপথযাত্রী লোকগুলো ভাবতে পারল না—মেয়েরা সস্তায় দেহবিক্রি করতে লাগল। আমার জীবনে এত মৃত্যু আর ইতিপূর্বে দেখিনি।

আমার নিজের জীবনের উপর ধিক্কার এল। নিজকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল। অথচ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্যে মানবতার সেবার কাজে নিজকে নিয়োজিত করব তারও জো নেই কারণ সরকারি চাকুরী করি বলে একমন চার সের চাল বিশ টাকা দরে পাচ্ছি—চালের দাম যখন শতের কোঠায়, আর তাও পাবার জন্যে যখন হন্নে হয়ে ঘুরতে হয় কারণ সাদা বাজারে চাল বিক্রি হয় না। ঐ পরিস্থিতিতে সরকারি চাকুরী ছাড়া বিপজ্জনক। ঢাকায় আমরা এক রিলিফ কমিটি করলাম। খাজা শাহাবুদ্দীন ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি—তাছাড়া শালিমার কোম্পানী করে লক্ষ লক্ষ টাকার

মালিক হয়েছেন—তার কাছে চাঁদার জন্যে গেলাম দিল দশটি টাকা। সৈয়দ আবদুস সলিম ঢাকা মুসলিম লীগের সম্পাদক দিল পাঁচ টাকা। সুতরাং শামসুল হকের নেতৃত্বে একদল ছেলে পাঠানো হলো কলকাতায়, হাসান ইস্পাহানী দিলেন একশত টাকা। সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিলেন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান তেওয়ানা—হাজার টাকা।

ডাক্তার করিম, ডাক্তার মন্নান, ডাক্তার সাবেদ আলী এঁদের পাঠানো হলো মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে বসন্তের টীকা আর কলেরা ইনজেকশন দিতে। টাকার প্রয়োজন বসন্তে দেশ ছেয়ে গেছে—কিন্তু এত টাকার জৌলুসের মধ্যে এসব কাজে কেউ টাকা দিতে চায়নি।

আবুল হাসিম সাহেব আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে ১৯৪৪ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ আসার কথা। সুতরাং তাঁর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক সেলিম সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাঁর জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে জানতে চাইলে তিনি বললেন যে—ঢাকা জেলা লীগ তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি—সুতরাং তাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। ডাক্তার মইজুদ্দীন সাহেবকেই বললাম কথাটা। তিনি ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সভাপতি। তাঁর বৈঠকখানায় হাসিম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমাদের দলের কর্মী শামসুদ্দীনের বাড়ি লৌহজং তাঁকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি খবর দেয়া হলো তারপাসা (লৌহজং) স্টেশনে আবুল হাসিম সাহেবের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে। শামসুল হক সে খবর নিয়ে শামসুদ্দীনের বাড়ি গেল। আমি তিন তারিখে নারায়ণগঞ্জে আবুল হাসিম সাহেবের অভ্যর্থনার ব্যবস্থার জন্যে যাই। খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়িতে সভা ডাকা হলো আবদুল আওয়াল, আলমাছ আলী, শামসুজ্জোহা কর্মীদের সভার আয়োজন করে।

শামসুজ্জোহার পিতা খান সাহেব ওসমান আলী সাহেব প্রথম জীবনে পাটের ব্যবসা করে অজস্র টাকা উপার্জন করেন এবং নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। চাষাড়া স্টেশনের নিকট তখনকার দিনে সুন্দর একখানা বাড়ি করেন। বাড়ির নাম রাখেন "বায়তুল আমান"। ঢাকায় খাজা শাহাবুদ্দীনের বাড়ির নাম ছিল "বায়তুল আমান"। ভাবটা যেন "মারি তো হাতী লুটিতো ভাণ্ডার"। বাড়ির নাম দিয়ে যা শুরু ঢাকার নবাবকে পরবর্তীকালে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে তার পরিসমাপ্তি। সে বিজয়ের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন তিনি জীবনের পরিপূর্ণতা, জীবনের তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষার সফলতা ও পরি-সমাপ্তি।

তাঁর বাড়িতে আমাদের ছিল অবারিত দ্বার। কর্মীদের নানা রকম জুলুম হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আমরা যারা আহ্সান মঞ্জিলের ধ্বংস কামনার মধ্য দিয়ে ব্যাসটাইলের পতনের ছবি দেখতাম—তাদের পক্ষে খান সাহেব ওসমান আলীর মত আমাদের সাহায্য করার মত লোক অল্পই ছিল। আমাদের সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন—তাই আজো আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। শামসুল হক আজ আর নেই—শামসুদ্দীন পাকিস্তানী, আলমাছ আলী মৃত, আওয়াল কোথায় জানি না। আমার কর্মজীবনের অসরের পরে আজ আমিও মৃত্যুর দিন গুণছি।

খান সাহেব ওসমান আলী সাহেবের কথা বলতে গিয়ে তখনকার দিনে যারা আমাদের কর্মীদের সাহায্য করেছেন—তার মধ্যে ছিলেন মুন্সিগঞ্জের তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অশোক মিত্র, আই. সি. এস. এবং তখনকার দিনে শ্রীনগর হাসপাতালের ডাক্তার নন্দী ও তাঁর স্ত্রী। সত্যি বলতে ওঁরা দু'জনই কমিনিস্টদের বিশেষ করে মুসলমান কমিউনিস্টদের বুদ্ধি ও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। শামসুদ্দীন ও মুন্সিগঞ্জের বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান বামপন্থী ছাত্ররা তাঁদের সাহায্য পেত।

শামসুদ্দীন তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও পার্টির সদস্য হবার চেষ্টায় ছিলেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আবুল হাসিম সাহেবের ভাগ্নে মনসুর হাবিব সাহেবকেও শামসুদ্দীন আগে থেকেই জানত, তাই আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গলাভ করার সুযোগ তাঁর ছাড়ার কথা নয়। লৌহজং স্টেশন থেকে শামসুদ্দীন আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গেই ঢাকা আসে। শামসুদ্দীন ছাড়া বাকি যারা আবুল হাসিম সাহেবের আলোচনায় নারায়ণগঞ্জে যোগ দিয়েছিল—তারা সবাই একসময়ে ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছে—সুতরাং সংগঠন করার ব্যাপারে তাদের সবারই কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। আলোচনা তাই অনেকটা অর্থপূর্ণ হয়েছিল।

পরের দিন আবুল হাসিম সাহেবকে নিয়ে আমরা ঢাকা আসি। আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে ছিলেন কবি বেনজীর আহম্মদ। বেনজীর সাহেব একসময় নাকি সন্ত্রাসবাদীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং একবার ডাকাতি করে নাকি ধরাও পড়েন এবং পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যান—সুতরাং তিনিও একজন রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তার উপর আবার কবি ও রাজনীতিবিদ।

ঢাকায় সিরাজ-উদ্-দৌলাহ্ পার্কে এক জনসভায় আবুল হাসিম সাহেব বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার ধরন এতদিনকার মুসলিম লীগের নেতাদের বক্তৃতা থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। ইসলাম তাঁর কাছে একটা ধর্মই নয়—অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষার উপর তাঁর অপূর্ব দখল বিশেষ করে বিশেষণের ব্যবহারে। উচ্চারণভঙ্গি অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের যেমন ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। পূর্ববঙ্গের বন্ধুদের ঠাট্টা করে কবি বলতেন যে, যখনই আমি পূর্ববঙ্গে আসি তখন পদ্মার গর্ভে কয়েকটা জিনিস ফেলে আসি—প্রথমতঃ 'চন্দ্রবিন্দু', দ্বিতীয়তঃ 'বর্গিয় জ'-এর উচ্চারণ—তা নইলে তোমাদের সব কথা আমি বুঝতে পারি না। আবুল হাসিম সাহেব কবি ছিলেন না—তিনি ছিলেন চিন্তানায়ক রাজনীতিবিদ। প্রতিটি শব্দই তিনি ব্যবহার করতেন ভাষার মার্জিত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে—যেমন করতেন চার্চিল তাঁর নিজস্ব ভাষায় বক্তৃতা করতে। মুসলিম ছাত্রসমাজের নিকট তিনি শীগ্‌গিরই জননেতা হয়ে উঠলেন—হয়ে উঠলেন প্রেরণার উৎস। কিন্তু তিনি শিক্ষিত ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে তাদের প্রিয় নেতা হলেন—তেমনি আবার বয়স্ক লোকের নিকট অনেকটা অপ্রিয় হতে লাগলেন। আমার মনে হয় দু'টো কারণে প্রথম সে যুগের বয়স্ক লোকেরা "ইসলামকে" বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁদের নিকট ইসলাম খোদার ধর্ম—তাকে মেনে নিতে হবে বিনাবাক্যব্যয়ে। তাই তাঁর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে

ইসলাম এর আলোচনা তাঁদের নিকট বেইমানী বলে মনে হত। দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টিহীনতার জন্যে অনেক কথা শত্রুর অনুচরদের নিকট বলতেন যা কোন কোন মহলে ভুল ব্যাখ্যা হতো।

অনেক আলোচনার পরে স্থির হলো যে, মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বামপন্থী দল গঠন করা প্রয়োজন তা নইলে মুসলমানের উপর খাজা ও ইস্পাহানীরা যে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে তার থেকে বাংলার মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ঢাকায় যেহেতু খাজাদের একক নেতৃত্ব সুতরাং লড়াই এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ একটি পার্টি হাউস—তারপর "সর্বক্ষণ" (whole time) কর্মী সংগ্রহ।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার শ্বশুর সাহেব এলেন আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঢাকা রেলস্টেশনে এসে যখন পৌছলাম—তখন আমার স্ত্রীর প্রসবব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে। আশ্চর্য হাজার হাজার মানুষ যখন মরছে—তখন আবার নতুন শিশু জন্মাচ্ছে। আমি অনেকটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। একজন শ্বেতাঙ্গ ক্যাপটিন আমার অবস্থা দেখে নিজে থেকেই এম্বুলেন্স গাড়ির জন্যে টেলিফোন করতে থাকলেন প্রতিটি হাসপাতালে, কিন্তু কোথাও কিছু যোগাড় হলো না। সর্বশেষ সে তাদের কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে একটা এম্বুলেন্স নিয়ে এল—এবং সেই এম্বুলেন্সে উঠে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এলাম মিটফোর্ড হসপিটালে সাথে একজন পরিচারিকা। ওকে জেনারেল ওয়ার্ডে রেখে ক্যাবিনের জন্যে হাসপাতাল সুপারের নিকট গেলাম এবং বহু সাধ্যসাধনা করে একটা ক্যাবিন পাওয়া গেল। গাইনোকোলজিস্ট ডাক্তার ধীরেন দত্ত, যাঁর চিকিৎসায় ছিলেন আমার স্ত্রী, সে খবর পেয়ে রাতেই ছুটে এল, কিন্তু পরীক্ষা করে বললেন যে, আরো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা নেই। রাতভর তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি—আমার মেজো ছেলের জন্ম হয়।

প্রথম সন্তান প্রসবের সময় অর্থাৎ ১৯৪১ সনের নভেম্বর মাসে এমনি বিপদ হয়েছিল। চারদিকে হিন্দু-মুসলমান নিধনযজ্ঞ চলছে। নারায়ণগঞ্জ ট্রেনে যাওয়া অসম্ভব। গেণ্ডারিয়াতে ট্রেনে উঠে গুণ্ডারা মুসলমানদের হত্যা করছে। কোন মুসলমান ড্রাইভার ফরাশগঞ্জ এলাকা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে সাহস করল না। আমাদের সরকারি উকিল ও আমার শিক্ষক ইব্রাহিম সাহেব (পরবর্তীকালে হাইকোর্টের জজ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) আমাকে বললেন যে, তাঁর ড্রাইভার আমাদের পৌছে দেবে। দুর্জয় সাহসী ড্রাইভার সত্যি নারায়ণগঞ্জ আমাদের পৌছে দিয়েছিল। তারপর আমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার স্ত্রী জাহাজে উঠল রাতদুপুরের সময়। ড্রাইভার আবার আমাকে রাত তিনটার দিকে ঢাকায় বাসায় এনে পৌছে দিয়েছিল। দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমার সেই প্রথম সন্তানের জন্মের কথা মনে পড়েছিল।

আবুল হাসিম সাহেবের প্রেরণা পেয়ে "পার্টি হাউস" গঠন করা হলো ১লা এপ্রিল ১৯৪৪ সনে ঢাকায় ১৫০ নং চক মোগলটুলীতে। তিনতলা বাড়ি—নীচেরতলায় কাগজের দোকান হায়দার সাহেব বলে এক ভদ্রলোকের। দোতালায় আমাদের

অফিস—তেতলায় সর্বক্ষণ কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা এবং কনফারেন্স ঘর। সর্বক্ষণের কর্মীরা হলেন চারজন—শামসুল হক, শামসুদ্দীন, তাজুদ্দীন আহম্মদ, মোহাম্মদ শওকাত আলী। এঁদের খাবার-থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও তাঁদের পার্টির কাজের জন্যে যা খরচ হবে তার ব্যবস্থা করা। পার্ট-টাইম কর্মীদের মধ্যে ছিলেন—মোহাম্মদ তোহা, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, এ. কে. আর. আহ্‌মদ, নইমুদ্দীন আহম্মদ এবং ডাক্তার এম. এ. করিম-এর উপর ও যাঁরা নানা কাজে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায়—নজমুল করিম, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র। বাড়িটা ছিল একজন হিন্দুর। ১৯৪১ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে এ বাড়িটা ছিল পরিত্যক্ত। ভদ্রলোক আমাদের ভাড়া দিতে পেরে খুশী হলেন। আমাদের পরিকল্পনা ছিল রাজনীতি ও ইসলামের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা বিশেষ করে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিদেশীদের আলোচনা; মওলানা মওদূদীর লেখা ইংরেজী পুস্তকসমূহ, ইব্‌নে খালদূন, ইব্‌নে রুসদ, ইমাম গজ্জালীর উপর লেখা—এবং সাম্যবাদের উপর লিখিত যত পুস্তকসমূহ।

আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় "Islam—the only solution." তারপর শামসুল হকের লেখা "পাকিস্তান কি, কেন ও কোন্ পথে"—এটাও আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে আলোচনার ফল। ঐ পুস্তকে "অফিসিয়াল মুসলিম লীগের" সঙ্গে পাকিস্তান প্রশ্নে আমাদের মতের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছিল। তৃতীয় বই "খণ্ড ভারত বনাম অখণ্ড ভারত"—এটা আমাদের পার্টি হাউসে নিজেদের মধ্যে আলোচনার ফল। পুস্তক প্রকাশিত হয় নইমুদ্দীনের নামে। এর পর আমার পুস্তকসমূহ "Simla Conference And After". পূর্ব পাকিস্তান আর পার্টি সংগঠনের উপর "The way out" শেষের পুস্তকখানা প্রকাশিত হবার পর—খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব আমাকে ঠাট্টা করে ডাকতেন "অটিকারী বাবু"। অর্থাৎ আমি পার্টির গংগাধর অধিকারী। যেহেতু ঐ পুস্তকখানা প্রকাশিত হয় আমার চাকুরীতে ইস্তফা দেবার পরে—তাই ওটা আমার নিজের নামেই প্রকাশিত হয়।

এর পর মেহাম্মদ মোহসিন-এর নিকট থেকে "হুশিয়ার" সাপ্তাহিক কাগজ কিনে নিয়ে তা বহুদিন পার্টি পত্রিকা হিসেবে পরিচালনা করার দায়িত্ব আমরা নিয়েছিলাম—এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলাম তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে। চিরদিনই সে নিজেকে পশ্চাতে রাখতে অভ্যস্ত ছিল বলে তাঁর কর্ম-ক্ষমতার কথা অনেকের নিকট জানা ছিল না। সে ছিল অনেকটা নির্বাচক কর্মী। আমাকে বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি কথা বলত শামসুল হক, মোহাম্মদ তোহা তারপর শামসুদ্দীন। কিন্তু আমাদের অফিসে অনর্গল কথা বলার ব্যাপারে আবুল হাসিম বা হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেবদ্বয়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

শেফাউল মুল্‌ক হেকিম হাবিবুর রহমান সাহেব দিয়েছিলেন চারখানা "চারপায়া" সবক্ষণ-কর্মীদের শয়নের জন্যে। জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর সাহেব দিয়েছিলেন

কিছু পুস্তক। তখন তিনি সপরিবারে মৌলভীবাজার ও মোগলটুলী রাস্তার মোড়ের বাড়িতে ভাড়ায় ছিলেন। ইলিয়াস সর্দার কিছু টাকা দিয়েছিলেন টেবিল-চেয়ার কেনার জন্যে। গোলবদনের শাহ সাহেবের নিকট থেকে শামসুল হক বেশ কিছু চাঁদা নিয়ে বইয়ের জন্যে আলমিরা কিনে ফেলেছিল এবং সেই সঙ্গে লাহোরের আশ্রাফ পাবলিকেশনের কিছু বই। এইভাবে আমাদের 'পার্টি হাউস' গড়ে উঠেছিল। সেকালে ঢাকায় ব্যবসাকেন্দ্র ছিল না—শিল্প এলাকা ছিল না—যা ছিল তাও হিন্দুদের কয়েকটি কাপড়ের মিল—তাও নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জে কিছু পাটের দালাল ও আড়তদার ছিল। নগদ টাকার সাহায্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসত রেজাই করিম সাহেবের কাছ থেকে। আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ খরচ চাঁদা তুলে চলত।

১৯৪৪ সনের জুন মাসে স্যার নাজিমুদ্দীন ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এলেন মোগলটুলী পার্টি হাউসে। অনেক আলোচনার পর স্থির হলো যে, যেহেতু খাজা শাহাবুদ্দীন ও সৈয়দ আবদুস সেলিম, যথাক্রমে জেলা লীগের সভাপতি ও সম্পাদক কলকাতায় থাকেন সুতরাং ঢাকা জেলার জন্য "অর্গেনাইজিং কমিটি" প্রয়োজন। নূরুল আমীন সাহেব প্রস্তাব করলেন রেজাই করিম হবেন চেয়ারম্যান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা) প্রস্তাব করলেন সম্পাদক হবেন আসাদুল্লাহ। কমিটিতে থাকলেন সুলতানউদ্দীন সাহেব, ডাক্তার ময়েজউদ্দীন, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, খানবাহাদুর আওলাদ হুসেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিটি হয়ে গেল। রেজাই করিম সাহেব বললেন যে, শামসুল হক, শামসুদ্দীন ও আমি কমিটিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করব পার্টি হাউসের প্রতিনিধি হিসেবে। আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলে যে, এমনিভাবে চাঁদা তুলে পার্টি অফিস চালানো অসম্ভব সুতরাং প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সকল সাবালক মুসলমানদের দু'আনার সদস্য করা হলে ইউনিয়ন লীগে দু'পয়সা, মহকুমা লীগের অফিসের জন্য দু'পয়সা। বাকি চার পয়সা জেলা লীগের জন্যে। রেজাই করিম সাহেব বললেন যে, গ্রামের লোকরা পয়সা দিয়ে মেম্বার হতে চাইবে না সুতরাং রশীদবই ছাপাবার পয়সাটাই মারা যাবে—বিশেষ করে যুদ্ধের জন্যে যেখানে কাগজ কিনতে হবে কালোবাজারে চারগুণ বেশি দামে—ছাপাবার জন্যেও খরচ হবে বিস্তর। কিন্তু আমরা জেদ করতে লাগলাম। আমি বললাম এটা না করলে মুসলিম লীগ নেতাদের পকেটেই থেকে যাবে। দেশের লোকের মধ্যে চেতনা আসবে না। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আসাদুল্লাহ সাহেব ঢাকা সদর মহকুমার ভার নিতে রাজী হলেন। বাকি মহকুমাসমূহের ও উত্তর সদরের ভার পড়ল আমাদের পার্টি অফিসের উপর। শামসুদ্দীন মুন্সিগঞ্জের ভার নিলেন—তাজউদ্দীন আহম্মদ ভার নিলেন উত্তর সদরের। মানিকগঞ্জের ভার পড়ল মছিহউদ্দীন (রাজা মিঞা)-এর উপর, নারায়ণগঞ্জ শহর—আলমাছ আলী আর শামসুজ্জোহার উপর, আর সেই মহকুমার ভার পড়ল আবদুল আওয়ালের উপর আর ঢাকা শহরের ভার নিল ইয়ার মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শওকত আলী। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হলো যে, সব মহকুমারই আমাদের পার্টির লোকের হাতেই ভার পড়ল কারা ইউনিয়ন লীগের, শহর লীগের ও মহকুমা লীগের কর্মকর্তা হবে তা স্থির করতে

একমাত্র ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা ছাড়া, পার্টি অফিসের এক গোপন সভায় আমাদের পার্টির লোকদের বলে দেয়া হলো যে, তারা যেন এমন কৌশলে কাজ করে যাতে পুরাতন জেলানেতা বা অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আমরা কেবল আমাদের লোকদেরই সদস্য করছি—বা ইউনিয়ন লীগ বা মহকুমা লীগ থেকে তাদের সবাইকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার এও স্মরণ রাখতে হবে যে, মহকুমার কাউন্সিল সদস্য যেন সব আমাদের লোক হয়। মহকুমার কমিটিগুলোতে কেবল আমাদের সংখ্যাগুরু সদস্য থাকলেই চলবে। আর আমাকে বা শামসুল হককে কাজের সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাতে হবে কিন্তু শমসুল হকের উপর যেহেতু ময়মনসিংহের সংগঠনের ভার ছিল, কলকাতার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের কাজে তাঁকে যেতে হত—তাঁর পক্ষে রিপোর্টসমূহ পড়ার সময় হবে না। সুতরাং স্থির হলো যে, পনের দিন অন্তর আমাদের পার্টির যে আত্মসমালোচনার সভা বসবে তাতে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সংগঠনের অগ্রগতির খবরাখবর আলোচনা করা হবে।

আমাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেলো। আসাদুল্লাহ্ সাহেবের মহকুমায় আমাদের লোকদের বলে দেয়া হলো তাঁর কাজে যেন কোন বাধা না দেয়া হয়। আসাদুল্লাহ্ সাহেব, আবদুল ওয়াসেক, আক্রাম আলী বেগ প্রভৃতি লোকদের নিয়ে সদর দক্ষিণে কাজ আরম্ভ করল। আমাদের ধারণা ছিল যে, আবদুল ওয়াসেক সাহেব যেখানে আছেন সেখানে বক্তৃতা হতে পারে, কিন্তু সংগঠন হবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আসাদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করেছি। লোকটি ছিল নীরব কর্মী, রাজনীতির চিন্তা তাঁর মনে সকল সময় জাগরুক থাকত। রাজনীতির বাইরে বড় বেশি কথা বলত না—তাঁর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সবার কথা শেষ না হলে কোন কথা বলত না—আর যা বলার তা আবার সর্বসমক্ষে বলত না।

দুর্ভিক্ষের সময়ে সমাজসেবায় এবং বামপন্থী মুসলিম লীগ সংগঠনে জেলার পুরাতন কৃষক সমিতির সাহায্য পেয়েছিলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে, জনগণকে সমস্যা সচেতন করার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা আপোষের মনোভাব বিদ্যমান ছিল। এর ফলে বেশ কিছুসংখ্যক কৃষক সমিতির লোকও আমাদের সদস্য হয়েছিল। বেদনাবোধ করতাম যখন দেখতাম এম. এন. রায়ের মুসলমান শিষ্যবর্গ আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করত। যদিও রায়পন্থী হিন্দুরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতো।

এমনি সময় শ্রী রাজা গোপালাচারীরা হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার একটা সমাধান উপস্থিত করলেন। তার প্রস্তাব ছিল যে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে যে সকল জেলায় মুসলমান সংখ্যাগুরু তাদের গণ-ভোটের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া হবে।

প্রস্তাবটি দেয়া হলো জিন্নাহ্ সাহেবের নিকট—জিন্নাহ্ বললেন যে, তার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে উপস্থিত করা হবে। রাজা গোপালাচারিয়া জানতে

চাইলেন—জিন্নাহ্ সাহেবের নিকট ওটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত কিনা ? জিন্নাহ্ উত্তরে বললেন তার ভাষায়, "It was a shadow and a husk, maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan." সুতরাং তাঁর নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রী রাজা গোপালাচারিয়া তখন বললেন,—তা হলে প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটিতে যেন উপস্থিত না করা হয়।

১৯৪৪ সনের মে মাসে গান্ধীজি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৭ই জুলাই তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে এক চিঠি লেখেন,—

*"ভাই জিন্নাহ্,*

*আমার মুক্তির পর আমি আপনাকে চিঠি লিখিনি—কিন্তু আজ আমার অন্তর বলছে আপনাকে আমার চিঠি লেখা উচিত। আপনার যখন সুবিধা হবে তখনই আমি আপনার সঙ্গে মিলবার বাসনা রাখছি। আমাকে ইসলামের বা এ দেশের মুসলমানদের শত্রু মনে করবেন না। আমি কেবল আপনারই সেবা করতে চাই না—সমস্ত বিশ্ব-জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। আমাকে নিরাশ করবেন না বলে আশা করি।"*

ভবদীয়—

**এম. কে. গান্ধী**

জিন্নাহ্ তখন খুব অসুস্থ। ফুসফুসে তখন যক্ষ্মার বীজ। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে "হাউস বোটে" বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি উত্তরে লিখলেন,—

*"আপনাকে আমার বোম্বের বাড়িতে দেখতে পেলে আনন্দিত হব। আমি আগস্টের মাঝামাঝি বোম্বে পৌঁছব বলে আশা করছি। আমার বিশ্বাস এ সময়ের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং বোম্বে ফিরে যাবেন। সাক্ষাতের পূর্বে আর কোন কথা আমি বলতে চাই না। খবরের কাগজে আপনার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভাল হচ্ছে জেনে খুশী হয়েছি—আশা করি আপনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।"*

৯ই সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্র বোম্বের মালাবার পাহাড়ের বাড়িতে গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনায় সাহায্যের জন্যে গান্ধীজি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বোম্বে উপস্থিত থাকতে বলেন—কিন্তু জিন্নাহ্ তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানালেন না। কারণ জিন্নাহ্র বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে—আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ তাঁর দাবী কংগ্রেস কখনো মেনে নেবে না।

বাংলাদেশে আমরা স্থির করলাম যে, গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনার সফলতার জন্যে আমরা জনমত গঠন করব। আবুল হাসিম সাহেব, কংগ্রেসের নেতা জে. সি. গুপ্ত হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সভা আহ্বান করেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এসব সভায় যোগ দেয়। আলোচনা প্রায় তিন সপ্তাহ চলার পর ভেঙ্গে যায়—রাজা গোপালাচারিয়ার মত গান্ধীজিও মুসলিম সংখ্যাগুরু গণভোটের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেন। আলোচনা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশে এসব সম্মিলিত সভাসমিতির

মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা কমে যায় এবং আমরা বেশ খানিকটা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির পথে অগ্রসর হই। কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে এভাবে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়নি তাই সমঝোতার জন্য ও আলোচনার সফলতার জন্যে নেতাদের উপর জনতার কোন চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

আগস্ট মাসের মধ্যে ইউনিয়ন লীগ ও মহকুমা লীগের নির্বাচন শেষ হয়ে গেল। নারায়ণগঞ্জে সেলিম সাহেব একটু গোলমাল করার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবুল হাসিম সাহেবের দৃঢ়তার জন্যে সে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু সে দৃঢ়তা দেখাবার ফলে খাজা শাহাবুদ্দীনের টনক নড়ে এবং পরিস্থিতি সচক্ষে দেখার জন্যে তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আগমন করেন। শাহাবুদ্দীন সাহেব অফিসে এসে কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করেন—কিন্তু আমাদের তিনজনের কাউকে সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলা হলো না। তারপর মহকুমার ও সদরের যাঁরা নতুন সভাপতি বা সম্পাদক হয়েছেন তাঁদের ডেকে আলোচনা করে জানতে চাইলেন যে, তাঁরা কাদের ২৪শে সেপ্টেম্বরে জেলা লীগের নির্বাচনে কর্মকর্তা নিযুক্ত করবেন। সবাই বললেন যে, কে কে যে প্রার্থী হবেন তার কোন তালিকা তাঁরা তখনো পাননি।

২০শে সেপ্টেম্বর রেজাই করিম সাহেবের ৩১ নম্বর দেওয়ান বাজারের বাড়িতে কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হয়—আমাদের তিনজনকেও বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কোন্ ইউনিয়নে কতজন মেম্বার হয়েছে, আছে—সেটাই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের হিসাবমতে ঢাকা জেলার সদস্য সংখ্যা প্রায় দু'লাখ—কিছু কম-বেশি হতে পারে। রশীদ-বইয়ের হিসাব চাইলেন। কাউন্টার-ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে টাকার হিসাব তাঁর নিকট ২২শে তারিখে সকালে উপস্থিত করতে বলা হয়, আমাদের হিসাব তৈরি ছিল। আমরা রাজী হলাম। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, সদস্য সংগ্রহ করার অভিযান শুরু হবার পরে আমরা বাইরে থেকে কোন টাকা সংগ্রহ করিনি—কথাটা অবশ্যই পুরোপুরি সত্যি ছিল না—কারণ রেজাই করিম সাহেবের নিকট হতে শামসুল হকের টুরের টাকা আদায় করেছি। শামসুল হক যেহেতু সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াত তাই তাঁর খরচ একটু বেশি ছিল। অবশ্যই বেশির ভাগ ভ্রমণ তাঁর বিনা টিকিটেই চলত। সেকালে লোকের হাতে পয়সা ছিল কম—সুতরাং কর্মীরাও হিসেব করে খরচ করত। কর্মীদের মধ্যে তখনো আধুনিকতার অভিশাপ লাগেনি। রাজনীতি করতে এসে আমাদের সবাইকে বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মিশতে হয়েছে,—অভিজাত সম্প্রদায়, উচ্চ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা একেবারে বিত্তহীন কেউ বাদ যায়নি—ফলে জনগণের প্রক্রিয়া আমরা যতটা লক্ষ্য করতে পারতাম তা যারা অভিজাত্যের ফলে নেতা হয়েছে তারা তা বুঝতে পারত না। খাজা শাহাবুদ্দীনের মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি নির্ভর করতেন তাঁর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, জীবনে মধ্যবিত্তের সুযোগ পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, আর সর্বোপরি মধ্যবিত্তের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা। যেমন রেজাই করিম ও ফজলুর রহমান কেউ কাউকে নেতা বলে মানতেন না, কিন্তু নিরক্ষর সৈয়দ সাহেবে আলম

(কালু মিঞা) প্রেসিডেন্ট হলে তাঁরা দু'জনেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকতে আপত্তি করতেন না। আমার তাই ধারণা বাংলার সাধারণ লোক যে পশ্চিমের নেতা খুঁজেছে বহু দিন এবং তার জন্যে নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাকতা করেছে—এর আসল কারণ পরশ্রীকাতরতা। আমরা যে আহ্সান মঞ্জিলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলাম বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে তার কারণ তারা এসেছিল কাশ্মীর থেকে দিল্লী হয়ে। বাইশ তারিখ আমরা দু'জন আমি আর শামসুল হক সকালে তাঁর পরিবাগের বাড়িতে গিয়ে খবর পাঠালাম। তিনি প্রস্তুত ছিলেন—চা-নাশ্তা এল। হিসেব দেখার কথা ভুলে গেলেন। হাসিমুখ—আমাদের কর্মীদের কাজের খুব প্রশংসা করলেন—তিনি যে সভাপতির ভাষণ দিবেন তাও আমাদের পড়ে শুনালেন। সেলিম সাহেব যে আমাদের খুব প্রশংসা করেছেন তাও বললেন। সিগারেট কেস্ খুলে দিলেন। আমরা ঠিক এমনি ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাইনি তাই ভাবছিলাম এ আবার কোন্ চাল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'রেজাই করিম সম্বন্ধে আমার মতামত কি ?' আমি বললাম, 'তিনি মস্তবড় ফৌজদারী উকিল—সুতরাং আমরা মনে করি সে খুব বুদ্ধিমান। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে জেলা লীগের সভাপতি নির্বাচিত করলে কেমন হয়—আমরা শুধু বললাম, 'কেন আপনিই ত সভাপতি আছেন!' তিনি বললেন, 'না আমি মন্ত্রী হবার পর আর সংগঠনের সভাপতি থাকতে পারি না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।' আমরা যেন বিস্মিত হয়েছি এমনি ভাব দেখালাম। জিজ্ঞেস করলেন তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে কিনা। আমরা বললাম, 'কেন এ প্রশ্ন করছেন—আপনার মনে কেন এ প্রশ্ন জেগেছে ?' তিনি হেসে বললেন, 'এবার তো কাউন্সিল লিস্টে যাঁদের নাম দেখলাম তাঁরা বেশির ভাগই আমার অপরিচিত।' আমরাও বললাম, 'আমাদেরও প্রায় একই অবস্থা। অনেক কাউন্সিলরের মফঃস্বল থেকে কাল ও পরশু এসে পৌঁছার কথা তাঁদের সঙ্গে তখনই আমাদের আলাপ হবে। তবে যেহেতু তাঁরা বেশির ভাগই নতুন—তাঁরা কাউন্সিলে কোন গোলমাল করবে বলে মনে হয় না—বিশেষ করে যেখানে আবদুস সেলিম, খানবাহাদুর আওলাদ হোসেন, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, আসাদুল্লাহ্, আবদুল ওয়াসেক, সুলতানউদ্দীন, ফজলুর রহমান, রেজাই করিম প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকজন কাউন্সিলের সদস্য রয়েছেন।' এমনি হাল্কা আলাপ করে আমরা বিদায় নিলাম।

অফিসে ফিরে এসে আলোচনা করব ভেবেছি তখন দেখলাম অনেক কাউন্সিলর ও বাইরের লোকজন ইতিমধ্যেই পার্টি হাউসে পৌঁছে গেছে—তাই স্থির হলো ঢাকায় পার্টির আলোচনা না করে সন্ধ্যার পর নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়িতে আলোচনার বৈঠক বসবে। শওকাত আলীকে বলা হলো পার্টির সদস্যদের কানে কানে কথাটা বলে দেয়া। আলমাসকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম ব্যবস্থার কথা। খান সাহেবকে সোজাসুজি টেলিফোন না করার কারণ ছিল—যে তাঁর নিকট অনেক ব্যবসায়ী লোক আসত—কে সম্মুখে থাকবে বলা যায় না—হয়ত শাহাবুদ্দীনের লোক ওখানে বসে আছে।

শামসুল হক বিকেলেই নারায়ণগঞ্জ চলে যায়—আর বাকি সব সন্ধ্যার পর ট্রেনে। ওসমান আলী সাহেবের বাড়িতে বন্ধ দরজায় আমাদের আলোচনা শুরু হয়—বিশেষ ভূমিকা না করেই সবাইকে বলা হলো যে,—আপনারা আগামী পরশু দুটার সময় আহ্সান মঞ্জিলে কাউন্সিলরদের হুইপ করে নিয়ে যাবেন। আপনার কেবল আমাদের তিনজন (অর্থাৎ আমি, শামসুল হক ও শামসুদ্দীন)-কে আগামী পরশুর নির্বাচনের ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্ত নেবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে যেতে হবে কারণ এবারকার সংগ্রাম বাংলার মধ্যবিত্তের মরা-বাঁচার সংগ্রাম—আর আমাদের প্রতিপক্ষ বহুকাল ধরে বাংলার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত তার উপর যার সঙ্গে বিশেষ করে লড়তে হবে তিনি বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি চতুর, ধূর্ত ও ধড়িবাজ রাজনীতিবিদ। তাছাড়া তাঁরাই সরকার—যে কাউকে যে কোন পুরস্কার দিয়ে আমাদের এতদিনের সংগ্রামকে বানচাল করে দিতে পারে। অর্ধঘন্টা সভা চলছিল—তারপর ওখানে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে সাড়ে ন'টার দিকে ঢাকা চলে আসি। সমস্ত রাত কাউন্সিলরদের সঙ্গে আমরা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করি—বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরই আমি বিশেষ করে জোর দেই। আমার কথা হলো—বাংলার মুসলমান অর্থে বাংলার কৃষক—তারা ঋণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ঋণ করেই কিছুদিন বেঁচে থাকে তারপর সন্তান-সন্ততিকে ঋণে জর্জরিত করে ইহলীলা পরিত্যাগ করে। তাদের পরনে কাপড় নেই, ঘরে চাল নেই, গরুর ঘর নেই—তার উপর বছরের অর্ধেক সময় দেশ ডুবে থাকে বর্ষায়, কোন কোন স্থানে দশ-বারো হাত পানি উঠে গাঁয়ের বাড়িগুলোকে এক একটা দ্বীপে পরিণত করে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, আমাশয়ে গাঁয়ের অর্ধেক লোক আক্রান্ত হয়—এবং ধুঁকে ধুঁকে মরে। আমাদের দেশের নেতারা তাদের চিনে না—জানে না—চিনে কেবল গাঁয়ের টাউটদের যারা তাঁদের কাছ থেকে দু'পয়সা পেয়ে ভোট যোগাড় করে দেয়। তারাই দেশের নেতা—তাদের জন্যে বাংলা সোনার বাংলা—আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে অন্ধকার ভবিষ্যৎ—এ অবস্থার বিহিত করার জন্যে জমিদার, নওয়াব, বৃটিশের তৈরি খেতাব পাওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে আজ সংঘবদ্ধ হবার সময় এসেছে। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সত্যি বলতে কোন মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব নেই—তাদের পেশা কেবল চাকুরী। আজ যদি কৃষক সচেতন হতো তবে লক্ষ লক্ষ লোক এমনি করে মৃত্যুবরণ করত না। জীবনপ্রদীপ নেভবার আগে একবার জ্বলে উঠত।

আমার পরে শামসুল হক রবুবিয়াৎ ও রব্বানিয়াৎ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন যে, ইসলামে মজহাব ও সিয়াসৎকে ভিন্ন করে দেখা যায় না। ইসলাম ধর্ম প্রত্যেকটি মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করার জন্যে, এর কোন অংশ বাদ দিলে—মনুষ্যত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। সম্পত্তির উপর কোন মানুষের মালিকানা নেই—মালিকানা খোদার। একজন মানুষ শুধু হতে পারে—সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। অর্থ পরের প্রয়োজনে তার কাছে গচ্ছিত। পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়লেই সালাত্ কায়েম হয় না—সালাত্ কায়েম করার পূর্বে তাঁর প্রাণ পরের জন্যে উৎসর্গ করতে হবে। কিছু হাদিস থেকে তার প্রতিপাদ্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন। সালাত্ ও জাকাত কেন একই সঙ্গে কোরানে

নাজেল হয়েছে তারও বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করলেন—এসব আদর্শের বক্তৃতায় প্রায় রাত শেষ হয়ে এল প্রশ্ন ও উত্তর চললো—কিন্তু কারা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হলো না। আমরা ওটাকে শেষ মুহূর্তের জন্যে রেখে দিলাম।

পরদিন আলমাছ আলীকে টেলিফোনে বলে দিলাম যে, নারায়ণগঞ্জ কাউন্সিলরদের একত্র করে ২৪শে সোজা আহ্সান মঞ্জিলে চলে আসে। মানিকগঞ্জের মছিহ্উদ্দীন (রাজা মিঞা)-কে ২৩ তারিখে সন্ধ্যায় আসতে বলা হয়েছিল—আর বাকি সবাই ২৩ তারিখেই আসার কথা। সদর দক্ষিণের সদস্যরা বাইশ তারিখেই এল—বিশেষ করে আবদুল ওয়াসেকের দল। ওয়াসেক কেবলই জানতে চাইল, 'প্রার্থীরা কে কোন্ পোস্টের জন্যে।' আমি বললাম, 'সেটা এখনো স্থির হয়নি। খাজা শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা না করে এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না।' আমরা চাচ্ছিলাম, ওয়াসেক আমাদের ছেড়ে যাতে খাজা সাহেবের দুয়ারে ধর্ণা দেয়।

সদস্যদের খাওয়া-দাওয়া ও শোবার ব্যবস্থা ঠিক হবার পরে আমি বাসায় গেলাম—একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। কয়েকদিন ভাল করে খাওয়া হয়নি, চিন্তায় ঘুম হয়নি। শেষ পর্যন্ত কি হবে। ২৩শে বিকেলে যখন অফিসে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছি তখন শওকাত মিঞা আমাকে বললে যে, রেজাই করিম সাহেব আমাকে টেলিফোনে খোঁজ করছিলেন। সন্ধ্যায় শওকাত মিঞা পরোটা, কাবার নিয়ে এলো তাই সবাই হৈ হৈ করে খাচ্ছি এমনি সময় রেজাই করিম সাহেব অফিসে এলেন এবং আমাদের তিনজনকে বললেন, তাঁর বাড়ি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে—এবং তিনি আমাদের নিতে এসেছেন। আরো কিছু জরুরী আলোচনাও হবে। আমরা নীচে এসে দেখি রেজাই করিম সাহেব নিজেই তাঁর হুড্ ফেলানো সানবিম গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। শামসুল হক ও শামসুদ্দীন গাড়ির পেছনে বসল। গাড়ি ছেড়ে যখন তাঁর দেওয়ানবাজারের বাড়ির গেটে এসেছি—তখন সেখানে দাঁড়ানো তিনটে গাড়ি ছেড়ে দিল—আর রেজাই করিম সাহেবের গাড়িও তাদের পেছনে চলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি',—উত্তরে বললেন, 'খাজা সাহেবের ওখানে কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমরা ফিরে আসব খাবার জন্যে। খাজা সাহেবও আসবেন।'

আমার যেন একটু ভয় হলো—কিড্ন্যাপড্ হচ্ছি না তো ? আগামীকাল নির্বাচন—আর আমরা তিনজনই আটকা পড়ব নাকি ? খাজা সাহেব সবকিছুই করতে পারেন। কিন্তু উপায় নেই তখন আর। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া পথ রইল না। পরিবাগে এসে দেখতে পেলাম যে, আমাদের সামনের গাড়িগুলো থেকে নামল—ডাক্তার মইজুদ্দীন, সৈয়দ আবদুস সেলিম, ফজলুর রহমান, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, খানবাহাদুর আওলাদ হোসেন এবং আরো দু'চারজন। রেজাই করিমের সঙ্গে আমরা তিনজন ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পরেই খাজা শাহাবুদ্দীন এলেন এবং দু'চার মিনিট কথা বলেই তাঁদের বললেন, 'আপনারা বসুন—আমাদের তিনজনকে নিয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলেন। তাঁর চেয়ারের উল্টা দিকে আমাদের জন্যে তিনখানা চেয়ার। আমাদের বসতে বললেন। আমার মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল তখন একটু

অন্যমনস্কও বোধহয় হয়ে পড়েছিলাম—তাই আমি কিছুক্ষণ বসিনি—খাজা সাহেব বললেন, 'বসুন—চা আনতে বলেছি।' আমার যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। বসলাম। খাজা সাহেব তাঁর খান্দানের ইতিহাস—তাঁর নিজের জীবনের সংগ্রাম—তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বলে আমাদের বোঝাতে চাইলেন—যে রাজনীতি বড় কঠিন বস্তু এর মত কঠিন সংগ্রাম আর নেই—রাজনীতিতে হঠাৎ উপরে কেউ লাফ দিয়ে উঠতে পারে না—তার জন্য চাই ধৈর্য ও সহনশীলতা। আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল যে, আমরা আটকা পড়েছি। আমরা অপহৃত "কিড্‌ন্যাপড্"। বুঝলাম নির্বাচন শেষ হওয়ার পূর্বে আমাদের এখান থেকে বেরুতে দেয়া হবে না। পরের দিন দু'টার সময় আহ্‌সান মঞ্জিলে নির্বাচন—আমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার পার্টি থেকে দেয়া হয়েছে। সবাই বসে থাকবে—আমাদের নির্দেশের অপেক্ষায়। রেজাই করিম সাহেবের সঙ্গে এসেছি—সুতরাং তাঁরা সেখানে খুঁজতে গেলেও কোন খবর পাবে না। আমাদের অন্তত একজনকে বের করে দেয়া আমাদের প্রথম স্ট্যাটেজী।

ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে,—পরের দিনের নির্বাচনে কাকে আমরা দাঁড়া করছি। আমি বললাম, 'সে তো এখনো স্থির হয়নি—সব জায়গার কাউন্সিল সদস্যরা আজো সবাই এসে পৌঁছেনি—তাঁদের সাথে আলাপ হবে—তারপর কমিটির সঙ্গে আলাপ হবে আপনার উপস্থিতিতে—তারপরেই একটা প্যানেল তৈরি হবে। আমরা তো প্রার্থী নই— কারণ আমি সরকারি চাকুরী করি, শামসুল হকের বাড়ি টাংগাইল আর শামসুদ্দীন এখনো ছেলেমানুষ। সুতরাং আমরা যেখানে প্রার্থী নই সেখানে সবার মত নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করব বলেই আমরা স্থির করেছি।' খাজা সাহেব বললেন, 'দেখুন যেহেতু আমিও প্রার্থী নই তখন দেখা যাচ্ছে যে, আমরা চারজনে মিলেই নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য প্যানেল তৈরি করতে পারি।' আমরা বললাম যে, 'কাউন্সিলগণ যে আমাদের তৈরি কর্মকর্তাদের লিস্ট মেনে নেবে তার কি প্রমাণ ?' খাজা সাহেব বললেন,—'আমি জানি যে নারায়ণগঞ্জের এক গোপন সভায় আপনাদের তিনজনের উপর নির্বাচন ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।' আমরা একটু অবাক হলাম তিনি কেমন করে খবর পেলেন—হতে পারে পার্টির কেউ কাউকে বিশ্বাস করে বলে ফেলেছে যে, আমাদের তিনজনকেই তাঁরা ক্ষমতা দিয়েছে সে খবরটা খাজা সাহেবকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই এমনকি সে হয়ত আমাদের পেছনে সরকারি ইন্টেলিজেন্স লাগিয়েছে। কারণ তিনি মন্ত্রী শুধু না—প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ভাই ও একমাত্র বুদ্ধিদাতা। আমি বললাম যে, 'আমাদের পার্টির বাইরের লোকই বেশির ভাগ কাউন্সিল সদস্য।' তিনি সে কথায় কান দিলেন না।

রাত দশটা বাজে—অথচ তাঁর মনের কথা বেরুচ্ছে না। আর খাবারের কথাও যেন ভুলে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'আপনি কাদের জেলা লীগের কর্মকর্তা করতে ইচ্ছা করেন। এবারে তিনি আর এক-দফা ভূমিকা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, 'আপনি গতকাল পার্টি অফিসে বক্তৃতায় তো জমিদার ও নবাবদের বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হবার জন্যে বলেছেন—সেখানে নবাববাড়ির কারো নাম বলতে দ্বিধাবোধ করছি—তবে

আপনারা যদি রাজী হন তবে আমার প্রস্তাব যে সৈয়দ আবদুস সেলিমকে সভাপতি করা যায়—সে যদিও আমার খালাত ভাই এবং তাঁর মা নবাব আহ্‌সানউল্লাহ্‌র মেয়ে, কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন খাঁটি বাঙালী—মানিকগঞ্জের সৈয়দ আবিজুল্লাহ্‌ সাহেব। তাঁর বড় ভাই মরহুম সৈয়দ আবদুল হাফিজও ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির ভক্ত। সুতরাং তিনি যেমন আপনাদের তেমনি আমাদের দলের লোক এবং দু'দলের একমাত্র গ্রহণযোগ্য লোক বলে আমি মনে করি।' আমি বললাম, 'কিন্তু তিনিও তো আজকাল বেশির ভাগই কলকাতা থাকেন—সুতরাং জেলার কাজে তিনি কি কোন সাহায্য করতে পারবেন ? এত যে হাজার হাজার লোক মারা গেল বিগত কয়েক মাস অনাহারে, গুটি-বসন্তে, আপনারা ঢাকায় থাকলে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক লোক ত বাঁচাবার চেষ্টা করা যেত—মৃত্যুর হার এখনো কি গ্রামে কম ? এখনো লঙ্গরখানায়, অকজিলিয়ারী হাসপাতালে, ভ্যাগর‍্যাণ্টস হোমে লোক অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের পাশে যদি আজ মুসলিম লীগ না দাঁড়ায় তবে কি আগামী নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারব ?' তিনি বললেন, 'দেখুন আমার নিজের ধারণা—নারায়ণগঞ্জ থেকে যাঁরা কাউন্সিল সদস্য হয়ে এসেছে তাঁরা বেশির ভাগ রহিমাবাদ, রায়পুরা, মনোহরদীর চালাকচরের কমিউনিষ্ট।' এই বলে দেরাজ থেকে সেলিমের লেখা একখানা রিপোর্ট বের করে পড়তে থাকলেন। লম্বা রিপোর্ট আমাদের সবাইকে কমিউনিস্ট ও বে-ইমান বলা হয়েছে। খাজা সাহেব বললেন যে, এ ছাড়াও মুন্সিগঞ্জ-মানিকগঞ্জ সব জায়গা থেকেই রিপোর্ট এসেছে যে, কোথাও কোন আইনানুগ নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়নি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাকে আগামীকালের নির্বাচন বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই।' এর পর আর কথা চলে না। বললাম, 'ঠিক আছে সেলিম সাহেবকে সভাপতি করলেই যদি আপনি খুশী হন—তবে সেলিম সাহেবকে আমরা গ্রহণ করতে রাজী আছি।' তাঁর প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্টের নাম তিনি প্রস্তাব করলেন ফজলুর রহমান সাহেবের নাম,—যুক্তি দিলেন 'একসময় আপনারা তাঁর সঙ্গেই কাজ করেছেন—তাঁর সংগঠন শক্তি সম্বন্ধে আপনারা ওয়াকেবহাল—তিনি নিজের চেষ্টায় আজ চীফ্‌-হুইপ হয়েছেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'সে তো আবার আপনার আত্মীয়।'

এবার আমি বললাম যে, 'আমাদের একজনের অন্ততঃ অফিসে যাওয়া দরকার কারণ আমরা রাত এগারোটা পর্যন্ত ফিরছি না দেখে পার্টি-অফিসের লোকজন নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে—তারা জানে আমরা রেজাই করিম সাহেবের ওখানে খেতে গেছি—ওখানে গিয়ে যখন দেখেছে আমরা ওখানে নেই এবং তাঁর বাসারও কেউ হদিশ দিতে পারে না—তখন ভয় পেয়ে হয়ত থানা পুলিশ করবে—ভাববে আমাদের হয়তবা খুন করে ফেলা হয়েছে। কে জানে। একজন অন্ততঃ গিয়ে বলুক যে, আমরা আগামীকাল নির্বাচনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি এবং আলোচনা অনেকক্ষণ চলবে। আমরা কর্মকর্তাদের একটা সকলের গ্রহণযোগ্য তালিকা তৈরি করতে পারলেই অফিসে চলে আসব।' খাজা সাহেব যেন কি ভাবলেন। আমি আবার বললাম, 'আপনার যে দু'জনকে খুশী রাখতে পারেন।' অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন—আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন যে, আমরা কোন

চাতুরী খেলছি কি না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আচ্ছা শামসুদ্দীন যেতে পারে।' তিনি কেবল বললেন যে, তাঁকে বলে দিন তিনি যেন আমাদের আলোচনা সম্বন্ধে সেখানে কোন কথা না বলে। আমরা তাঁকে তাই বললাম। শামসুদ্দীন রাজী হয়ে চলে গেল এবার রইলাম আমি ও শামসুল হক। শামসুল হকের শরীরের উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছিল, মাথাব্যথা করছিল—তবু আমি তাঁর নাম বললাম না পাছে শাহাবুদ্দীন সাহেব কোন সন্দেহ করেন।

তারপর আবার আলোচনা শুরু হল। আমি বললাম, 'আমরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধাও আছে—অসুবিধা দুটো প্রথমতঃ তিনি চীফ্-হুইপ, দ্বিতীয়তঃ তিনি বক্তাও নন এবং জনগণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কোনদিনই ছিল না—কিন্তু এ বিপদের দিনে জনগণই দু'টো কথা শুনতে চায়—নেতাদের মুখ থেকে।' খাজা সাহেব বললেন যে, 'আপনারা তাঁর মারফৎ যে সাহায্য আনতে পারবেন তা নিজেরা চেষ্টা করে পাবেন না এমন কি সেলিম সাহেবের মারফতও না।' নানা বিতর্কের পর তাঁর নাম গৃহীত হলো—এমনি করে ডাক্তার মইজুদ্দীন, সুলতানউদ্দীন, খানবাহাদুর আওলাদ হুসেন, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী প্রত্যেকের ব্যাপারেই আমরা আপত্তি করি পরে তাঁর যুক্তি মেনে নি। সম্পাদক হিসেবে আসাদুল্লাহ্‌র নামটা নিয়ে আমরা কোন আপত্তি করিনি। তারপর এল কমিটি সদস্যদের নাম—সেখানেও আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি—যখন তাঁদের নাম শেষ হলো অর্থাৎ খাজা সাহেবের লিস্টই আমাদের মেনে নিতে হলো তখন ভোর হয়েছে। পাখীর ডাক শুনতে পেয়ে আমি বললাম, 'শামসুল হকের ভীষণ জ্বর উঠেছে',—সত্যি শামসুল হক ভীষণভাবে কাঁপছিল—মনে হচ্ছিল ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। খাজা সাহেব নিজে হাত দিয়ে দেখে বললেন, 'তাইতো আমার গাড়ি না হয় আপনাদের দিয়ে আসবে।' আমি বললাম, 'সভায় সভাপতিত্ব কে করবে তাতো কিছু বললেন না'—তিনি কিছু না ভেবেই বললেন,—'কেন রেজাই করিম।' অথচ কর্মকর্তাদের যে তালিকা প্রণীত হলো তার মধ্যে রেজাই করিমের নাম নেই। 'সভাপতিত্ব করবেন অথচ ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর নামটাও থাকবে না এটা কি বিসদৃশ দেখাবে না ?' একথা বলাতে তার উত্তরে তিনি বললেন যে, 'না তাঁকে আমরা প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য করে নেব এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে নিয়ে নেয়া হবে। রেজাই করিম সাহেব ইতিমধ্যেই কলকাতাকে তাঁর কর্মক্ষেত্র করার জন্য কলকাতা বৃটিশ-ইণ্ডিয়া রোডে একখানা বাড়ি ভাড়া করেছেন।'

আমরা উঠব এমন সময় তিনি বললেন, 'আপনারা দু'জনে এই 'প্যানেলটি' সই করে দিয়ে যান।' আমরা বললাম, 'কাউন্সিলরদের না বুঝিয়ে 'প্যানেলে' সই করলে হয়ত তাঁরা প্যানেল মানবে না',—তিনি বললেন, 'আপনারা যদি সই না করেন তবে আমি আগামীকালের নির্বাচন বন্ধ করে দেব।' কি আর করি, সই করলাম দু'জনেই। তারপর যখন পার্টি হাউসে এলাম তখন শামসুল হকের খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকা হলো। তাঁকে আহ্‌সান মঞ্জিলে দু'টার সময় নিতে হবে। পার্টির লোকদের বলে দিলাম যে,

শামসুদ্দীন যে প্যানেল প্রস্তাব করবে সেইটে আমাদের। শামসুল হক যে প্যানেল প্রস্তাব করবে সেটা খাজা সাহেবের প্যানেল। এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হবে না নির্বাচনের পূর্বে। পরে সবাইকে সব জানান হবে।

বেলা পৌণে দু'টার সময় শামসুল হককে বহু কষ্টে গাড়িতে তোলা হলো। আমরা সবাই আহ্সান মঞ্জিলে উপস্থিত হলাম। কোরান-তেলাওতের পর দু'টার সময় সভা আরম্ভ হলো।

এর পূর্বে সকালবেলা অফিসে ফিরেই আমি প্রথম গেলাম কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে। তাঁকে অনুরোধ করলাম,—'আপনি আজকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন—কারণ আমরা রেজাই করিম সাহেবের উপর আর আস্থা রাখতে পারি না'—তিনি বললেন, 'আপনারা যখন রেজাই করিমের নাম স্বীকার করে এসেছেন তখন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি না—বিশেষ করে সে আমার বহুদিনের বন্ধু।' আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ল এ. টি. মোজহারুল হকের নাম। তিনি এডভোকেট—একসময় রেজাই করিম সাহেবের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন—কিন্তু ইদানিং বার্মা ইভাকুইজের টাকার ভাগ-বাটাওরা নিয়ে মনোমালিন্য চলছে। তাই তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। শামসুদ্দীনকে সেটা জানিয়ে দেয়া হলো।

খাজা শাহাবুদ্দীন সেলিম সাহেবকে তাঁর লিখিত সেক্রেটারী রিপোর্ট পাঠ করার জন্যে সাইক্লোস্টাইল রিপোর্ট সবাইকে দেয়া হলো। তার মধ্যে বিশেষ করে আমাদের পার্টি হাউসের এবং খাস করে আমাদের তিনজনের প্রশংসা করা হয়েছিল সংগঠনের কাজে। তারপর খাজা শাহাবুদ্দীনের বক্তৃতাও পড়া হলো। তাঁর বক্তৃতাও সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করা হলো। তিনিও আমাদের ধৈর্য, সহ্য, পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি উঠে গেলেন আসন ছেড়ে নতুন সভাপতির জন্য। রেজাই করিম সাহেবের নামটাও বললেন। শামসুল হক দাঁড়িয়ে রেজাই করিম সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন তৎক্ষণাৎ শামসুদ্দীন এ. টি. মোজহারুল হকের নাম প্রস্তাব করেন। শামসুল হকের প্রস্তাবের উপর পঁয়ত্রিশ ভোট—আর শামসুদ্দীনের প্রস্তাবের উপর পড়ল দেড়শ'র উপরে ভোট। ফজলুর রহমান আমার সম্মুখে এসে চীৎকার করে শাহাবুদ্দীনকে বললেন,—"We are betrayed". শাহাবুদ্দীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্যানেলের প্রস্তাবে অবস্থা একই রকম হলো শামসুল হকের প্রস্তাবের প্যানেল হেরে গেল। আর শামসুদ্দীনের প্রস্তাব বিপুল ভোটে গৃহীত হলো। 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' করে আমরা মিছিল করে বেরিয়ে এলাম। আহ্সান মঞ্জিলের ঘর থেকে রাজনীতির বিদায় সমাপ্ত হলো ১৯৪৪ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর।

রাত্রে নতুন সভাপতি খানবাহাদুর আওলাদ হুসেনের বাসা থেকে আবুল হাসিম সাহেবকে খবরটি দেয়া মাত্র তিনি বললেন, 'খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ।' আমাদের তিনজনকে কলকাতা যাবার জন্যে বললেন যত সত্বর সম্ভব। এরপর যে আমার উপর একটা বিপদ নেমে আসতে পারে তাই মনে করে আমি ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মারফৎ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর-এর নিকট চাকুরীতে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দিলাম। কারণ তা নইলে সরকারি চাকুরী করে কেন রাজনীতি করি তার জন্যে আমার বিরুদ্ধে

অভিযোগ (চার্জশীট) তৈরি হবে এবং হয়ত আমাকে বরখাস্ত করবে। যদিও মুসলিম লীগ সরকার জানতেন যে, সরকারী চাকুরেরা শতকরা পচানব্বই জন পেছন থেকে লীগের কাজকর্ম করেন—যেমন করতেন বেশির ভাগ হিন্দু কর্মচারীরা কংগ্রেসের।

কলকাতায় দিন দুই পরেই পৌঁছলাম। আমার স্ত্রী, দু'টো সন্তান তাদের কি হবে সেটা আমার মনে একবারও আসেনি। কি একটা নেশায় যেন পেয়ে বসেছিল। খাজা সাহেবদের এতদিনের নেতৃত্বের সমাধিস্থ করতে পেরে আনন্দের সঙ্গে বিগত জীবনের অনেক কথাই মনে এল। আমার রাজনীতি আদর্শে যিনি প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছিলেন সেই সৈয়দ আবুল হোসেন এম. এ., এম. এল. সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ, কাজী আবদুল অদূদের জামাতা আমার বন্ধু শামসুল হুদা সাহেবের উপর অত্যাচার ও দৈহিক নির্যাতন, শহীদ নজীরের মাথা ফাটানো, ছাত্রদের উপর গুণ্ডাদের হামলা, সুলতানউদ্দীন সাহেবকে উচ্চ-পরিষদ মুসলিম লীগের টিকিট দিয়ে তা বাতিল করার পূর্বে খাজা শাহবুদ্দীনের গালিগালাজ, নির্বাচনের পূর্বে আমাদের সমস্ত রাত্তির আটকিয়ে রাখা। মনে হলো আর ঢাকার মধ্যবিত্তের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব চলবে না। উপরের রাজনীতিও যাতে না করতে পারে তারই প্রচেষ্টা চালানোও যেন আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। কলকাতা গিয়ে দেখলাম অমৃতবাজারে বিরাট হেডলাইন "খাজা নাজিমুদ্দীনের পরাজয়"—অন্যান্য কাগজে দেখলাম আহ্সান মঞ্জিলের নেতৃত্বের অবসান। শিয়ালদহ স্টেশনে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ভীড় করে আছে—আমাদের আসার কথা শুনে। তাঁদের বললাম যে, আবুল হাসিম সাহেব প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের যা বলার তা বলবেন আমরা এসেছি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলতে। তবে আমরা দেশবন্ধু, শেরেবাংলা বা নেতাজীর মত দল ছাড়ব না যদি আমরা আগামী নভেম্বরে প্রাদেশিক নির্বাচনে হেরেও যাই। এ সংগঠন একদিন জনসাধারণের আয়ত্তে আসবে—তার সঙ্গে আসবে পরিষদ। কেন্দ্রীয় সংগঠন অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করবে তাঁরা কতটা প্রগতির পথে চলবে।

কলকাতার প্রগতিবাদী যুবক নেতাদের সঙ্গে দেখা হলো—তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, জহীরুদ্দীন, নূরুদ্দীন, আবদুল জলিল, মোয়াজ্জেম, শাহ্ আবদুল বারী, মাহবুব আনোয়ার, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল হাকিম, শফিকুল ইসলাম, সালেহ্ আহ্মদ, রাজশাহীর আতোয়ার রহমান, শাহ্ আবদুল বারী, দবীরুল ইসলাম, আবদুল হাই, মাহবুবুল হক আরো অনেকে—সবার কথা এখন আর মনে নেই। বায়রনের কথা মনে পড়ল, "I woke up one morning and found myself famous."

৩ নং ওয়েলেসলীতে মুসলিম লীগ অফিসে একদিন ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি অন্যদিকে চলে যেতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু তিনি আমাকে ডেকে বলে দিলেন যে, তিনি ঢাকায় নতুন ছাত্রনেতা তৈরি করে আমাদের কোণঠাঁসা করবেনই। এর কিছুদিন পরেই ঢাকায় এসে দেখলাম চারজন নেতা কমিউনিস্টদের গুহা বলে ঢাকায় বক্তৃতা করছেন—বিশেষ করে মিলাদ মাহফিলে। তাঁরা হলেন শাহ্ আজিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্দকার মোশতাক সাহেবের সহপাঠি, আবদুস সালেক, ইব্রাহিম, আলাউদ্দীন। শাহ্ আজিজুর রহমান সাহেবের পিতা আমার শিক্ষক

ছিলেন। ইব্রাহিমের বাড়ি নোয়াখালি, কিন্তু তাঁর মা আমাদের দেশের এবং ওয়াসেক সাহেবের আত্মীয় আবদুস সালেকের বাড়ি চট্টগ্রাম আর আলাউদ্দীন আমাদের ঢাকা শহরেরই ছেলে। আমার যে কোন সভায় তারা গোলমাল করার জন্যে প্রস্তুত থাকত। মুন্সিগঞ্জে মোক্তার-বারেক এক সভায় গোলমাল করার জন্যে উপস্থিত হলে একটি যুবক তখন ছাত্র কি না জানি না—সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। পরিচয় হলো সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে কোরবান আলী সাহেবের সঙ্গে। ফজলুল কাদের চৌধুরীকে আগে থেকেই চিনতাম আমার ছোট ভাই-এর সহপাঠি। বরিশালে তারা একত্র পড়ত।

দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্মীদের নিয়ে আবুল হাসিম সাহেব বেরিয়ে পড়লেন লম্বা "টুরে"। নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগের মধ্যে আক্রাম খাঁ ও স্যার নাজিমুদ্দীনের দলে দক্ষিণপন্থীদের ভীড়। আর বিরুদ্ধে আবুল হাসিম সাহেবের দল প্রতিযোগিতার জন্যে দেশময় অভিযান চালিয়েছে। শহীদ সাহেব নিজেকে দুটো দলের ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আবুল হাসিম সাহেবের বিরুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা হচ্ছেন সর্বজনাব ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা), আবদুস সবুর খান, ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব মালিক, মওলানা আবদুল্লা-হিল-বাকি, খাজা শাহাবুদ্দীন প্রভৃতি। আর আবুল হাসিম সাহেবের দলে থাকলেন কেবল নাম-না-জানা কর্মীবৃন্দ। খাজা নাজিমুদ্দীন অতঃপর সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দলে টানার চেষ্টা করলেন। তাঁরা শহীদ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করলেন যে, আবুল হাসিম কমিউনিস্ট, তাঁর ভাগ্নেরা সবই কমিউনিস্ট সুতরাং গতবারে আমাদের ভুল হয়েছে তাঁকে জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচন করে। ঢাকা পার্টি হাউস সর্বক্ষণ-কর্মী দ্বারা ভর্তি। মুসলিম লীগের কাজ আবুল হাসিম করান তাঁদের দিয়ে—তাঁরা তাঁদের মতবাদ স্বাধীনভাবে প্রচার করে, প্রদেশিক মুসলিম লীগের নেতাদের বিরোধিতা করে করে গাঁয়ে-গ্রামে "সেল" গঠন, এসব থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, সে কাদের স্বার্থে কাজ করছে। ইসলামকে সে ব্যবহার করছে মুসলিম লীগ "প্ল্যাটফরম"কে নিজেদের জন্যে ব্যবহার করতে। তাঁর ইসলামের ব্যাখ্যা কার্ল-মারকস্-এর থেকে ধার করা। ইব্‌নে খালদুন ছাড়া অন্য কোন মুসলমানের লেখা তার কর্মীরা পড়ে না। তাঁরা বললেন, ডাক্তার মালিক একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা—সে বহুদিন মেহনতি শ্রমিকের জন্যে কাজ করছে, তাঁর নাম প্রস্তাব কররে যুবকবৃন্দ সকল কাউন্সিল সদস্যদের নিকটই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে। ১৯৩৮ সনে আফতাব আলীকে শ্রমিক আন্দোলনে কোণঠাঁসা করার জন্যে শহীদ সাহেব ডাক্তার মালিককে নিযুক্ত করেছিলেন তাই শহীদ সাহেবের নিকট তিনি বিশ্বস্ত লোক। শহীদ সাহেব জালে পড়লেন এবং নেতাদের মধ্যে একটা আপোস নিষ্পত্তি হয়ে গেল। নভেম্বরের ১৬ তারিখে এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কর্মীরা যদিও আবুল হাসিম সাহেব শহীদ সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সবাই যদি সে মত হয় তবে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন কর্মীরা বিক্ষোভ আরম্ভ করলেন। আন্দোলনে বিশেষ করে নেতৃত্ব দেয় ফজলুল কাদের চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং নূরুদ্দীন।

সেদিনই আমি প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনি যদিও আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—আরো দু'মাস পূর্বে। এ বিক্ষোভের ফলে পূর্ব রাতের ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে যায় এবং আবুল হাসিম সাহেব আবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নবীন নেতাদের পক্ষে এটা একটা মস্তবড় বিজয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ আঘাত খেলেন বটে, কিন্তু পর্যুদস্ত হলো না। কারণ প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটিতে স্যার নাজিমুদ্দীন ও আক্রাম খাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে গেল—তার কারণ নতুন নেতা কোন কোন জেলায় তাঁদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে থাকলেও প্রাদেশিক নেতৃত্ব দাবী করার মত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। যাই হোক আমরা খুশী মনে ঢাকায় ফিরলাম।

ডিসেম্বর মাসে আবুল হাসিম সাহেব একটি ম্যানিফেস্টোর খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৯৪৪ সনের মার্চ মাসে সেটা পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল দলের পক্ষে এটি একটি হাতিয়ার হলো। তাঁরা এবার আরো একটি স্পষ্ট প্রমাণ পেল যে, আবুল হাসিম সাহেব কমিউনিস্ট। সত্যি কথা বলতে এ ধরনের ম্যানিফেস্টো পার্টিরই আবিষ্কার। ম্যানিফেস্টো শব্দটির মধ্যেও কমিউনিজমের গন্ধ পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ঢাকায় পার্টির সদস্যদের জন্যে আমার "The way out" স্বনামে প্রকাশিত হলো। বইখানা পড়ে আর কারো সন্দেহ রইল না যে, আমাদের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে তৈরি। প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি সেই খসড়া ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করল না।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত করা হলো এবং জেলা লীগের সম্পাদক শামসুদ্দীনের উপর ভার দেয়া হলো স্থান মনোনয়ন করার জন্য। শামসুদ্দীনের মত হচ্ছে সৈয়দ আবদুস সেলিমের প্রভাব যেখানে বেশি সেখানেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। দু'টো স্থানের কথা শামসুদ্দীন উল্লেখ করল, একটি রায়পুরা থানায় রহিমাবাদ অন্যটি মনোহরদী থানায় চালাকচর। দু'টোই কৃষক সমিতির ঘাঁটি। সেলিম সাহেব তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বেশ শক্তিশালী—সুতরাং শামসুদ্দীন কৃষক সমিতির সাহায্য নিয়ে সেলিমের বিরুদ্ধে "জয়েন্ট ফ্রন্ট" করার পক্ষপাতি। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো যে, চালাকচরেই অধিবেশন হবে। আবুল হাসিম সাহেব প্রধান বক্তা।

চালাকচরের কৃষক সমিতির নেতা ছিলেন কমরেড অন্নদা পাল। একসময়ে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী দলে। ধনী ও তালুকদার বংশের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন। পাকিস্তান হবার পর সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কৃষক সমিতির নেতা হয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সেলিম সাহেবও পাণ্ডাদের নিয়ে কনফারেন্স ভাংবার ব্যবস্থা করতে মনস্থ করলেন। শামসুদ্দীন এবং অন্নদা পালও তাঁদের লোকজনদের প্রস্তুত রাখলেন। ফলে কনফারেন্স-এ তুমুল মারামারি হবে এটা আমরা সবাই আশা করেছিলাম। আবুল হাসিম সাহেব চালাকচরে পৌঁছার পূর্বেই বেশ মারামারি হয়ে গেছে—সেলিমের দল অন্নদা পাল ও শামসুদ্দীনের দলের সঙ্গে মারা-মারিতে এঁটে উঠতে না পেরে সেলিম সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে চালাকচর ছেড়ে গেছেন। অন্নদাবাবু ও শামসুদ্দীন আরো অনেকে আহত হয়েছিলেন। অধিবেশন চলাকালীন আর গোলমাল হয়নি।

১৯৪৪ সনের বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের যে দুর্বলতার দিক দেখা গেল সেটা হলো দলে যথেষ্ট অভিজ্ঞ পুরাতন রাজনীতিবিদের অভাব। এ দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে

স্থির হলো যে, সব পুরাতন মুসলমান নেতারা বহুদিন ধরে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মুসলিম লীগের সদস্য করতে পারলে আমাদের সে দুর্বলতা আর থাকবে না। তাই মাওলানা আবদুল্লা-হিল-বাকী, আশ্রাফউদ্দীন চৌধুরী, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, শামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন—আবুল মনসুর আহমদ, মাওলানা আবদুল্লা-হিল-বাকী, শামসুদ্দীন আহমদ, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী। হুমায়ুন কবীর, আশ্রাফউদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের নিকট থেকে যে আশা করেছিলাম তা হয়নি। নেতারা নেতাদের সঙ্গেই মিলে গেলেন—কেউ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দলে, কেউ আক্রাম খাঁর দলে ভীড়ে গেলেন।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল ইউরোপে। জার্মানী পরাজয় মেনে নিল। হিটলার আত্মহত্যা করল। আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ইংলিশ চ্যানেলের মহাদেশের উপকূলে যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়েছিল জার্মানী তাদের ঠেকাতে পারল না। পূর্বদিকে রুশ সৈন্যও এগিয়ে আসতে লাগল। স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধের পর সমস্ত যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল—জার্মান সৈন্যরা বরফে বাঁধা পড়ল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে যে কারণে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল হিটলারের অদৃষ্টেও তা ঘটল। তার বিখ্যাত প্যাঞ্জার ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একই সময়ে পশ্চিমা শক্তিসমূহ ও রুশবাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করে শহরটাকে ভাগ করে নিল—পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন। নাৎসিবাদের অবসান হলো। অর্ধযুগের যুদ্ধে ১৯৪৫ সনের মে মাসে কেবল জার্মানীই পরাজিত হলো তাই নয়, ইউরোপের যেসব শক্তি বিজয়ী হলো তারা এমন গুরুতরভাবে আহত হলো যে, তাদের কারো পক্ষে আর তাদের কলোনী বা সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হলো না। ইউরোপের এতদিনের নেতৃত্ব গেল মার্কিন মুল্লুকের নিকট।

জাপান কিন্তু অত সহজে পরাজয় স্বীকার করলে না। আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছিলাম যে, জার্মানী এক ভীষণ মারণাস্ত্র তৈরি করছে—কেউ বললে জার্মানীর নতুন আবিষ্কার "Death Ray". "ডেথ্‌রে" থেকে আলো যেখানে বিচ্ছুরিত হবে সেখানকার সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে অস্ত্র হিটলারের বৈজ্ঞানিকরা তৈরি করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। এটা কি ইহুদী বিতাড়নের ফল ? কে জানে। আমাদের অবাক করে দিয়ে প্রকাশ হলো যে, মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা "এটম বোমা" আবিষ্কার করেছেন। সত্যিই জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকী শহরে ১৯৪৫ সনের ৫ই আগস্ট ও ৯ই আগস্ট "এটম বোমা" বহু উঁচু হতে বিমান থেকে ফেলা হলো—দুটি শহর ছারখার হয়ে গেল—কি নিষ্ঠুর যে সে মৃত্যু। ঐ বোমা তো জার্মানীর উপর ফেলা হয়নি—কারণ বোধহয় শত অপরাধ করলেও তারা শ্বেতাঙ্গ। ধ্বংসলীলা এমন ভয়ঙ্কর হয়েছিল যে, যে মার্কিনী পাইলট ঐ বোমা ফেলেছিল সে নিজের কৃতকর্ম ও ধ্বংসলীলা দেখে নিজেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। এর পর জাপানের পরাজয় স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল—১৯৪৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসর্ম্পণ করল মিত্রশক্তির নিকট। পার্ল-হারবারের প্রতিশোধ ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবেই আমেরিকা গ্রহণ করল। এবং জাপানকে মোটামুটিভাবে আমেরিকা তার কলোনীতে পরিণত করল।

১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে যুক্তরাজ্যে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে চার্চিল ব্যক্তিগতভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিকে হারিয়ে দিলেও শ্রমিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করে এবং ক্লেমেন্ট এট্‌লী বৃটেনে সরকার গঠন করেন। এটা মুসলিম লীগের জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বৃটিশ শ্রমিক দলের বহু সদস্য বহুকাল যাবত ভারত ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের বন্ধু ছিল—জওহরলাল নেহেরু, কৃষ্ণমেনন প্রভৃতি অনেক রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন তাঁরা। গান্ধাজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার সর্বপল্লী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং ভারতের অন্যান্য মনীষীদের প্রতি তাঁদের বেশ শ্রদ্ধা ছিল, যে-সুবিধাটা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ছিল না।

ঢাকায় প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃববৃন্দের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর জেলার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ যেমন ইউসুফ আলী চৌধুরী, ওয়াহিদুজ্জামান, আবদুস সালাম খান তাঁদের নেতৃত্বের অবসান ঘটাবার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফরিদপুরে তাঁর নিজস্ব থানা গোপালগঞ্জে এক কনফারেন্স ডাকে এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। গোপালগঞ্জ থানার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই খুব সাহসী। এমনকি, অন্যান্য জেলার জমিদাররাও চর দখল, ডিক্রিজারী দখল ইত্যাদি ব্যাপারে গোপালগঞ্জ থেকে নমশুদ্র সর্দার ভাড়া করে আনত। আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেকে জমি জোর-দখলের জন্য সেখান থেকে ঐসব সর্দারদের সাহায্য চাইত। এমতাবস্থায় দুই দলই অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মিছিল করে আসা স্বাভাবিক ছিল এবং যথেষ্ট পুলিশের প্রয়োজন হয়ে পড়ত এদেশ শান্ত রাখার জন্যে। সে সভায়ও তার ব্যাত্যয় ঘটেনি। সে সভায় এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, আবদুস সালাম খানের চেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জে বেশি শক্তিশালী।

গোড়াতে আমরা ভেবেছিলাম যে, প্রদেশের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য কাউন্সিলরদের ভোটেই হবে, কিন্তু জিন্নাহ্‌ এবং লিয়াকত আলী খান এমন ব্যবস্থা করতে চাইলেন যাতে খাজা নাজিমুদ্দীন ও অবাঙালী ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব বাংলাদেশে বজায় থাকে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো যে, মুসলিম লীগের সভাপতি এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা পদাধিকারবলে বোর্ডের সদস্য হবেন। অর্থাৎ মাওলানা আক্রাম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দীন নির্বাচনের সম্মুখীন না হয়েই বোর্ডে এসে গেলেন। তারপর স্থির হলো যে, মুসলিম লীগের সদস্যের নিম্ন পরিষদ ও উচ্চ পরিষদ থেকে ঐ দুই পরিষদের সদস্যরা দু'জন নির্বাচন করবেন। অর্থাৎ ঐ দু'জনও হবে খাজা নাজিমুদ্দীনের মনোনীত ব্যক্তি। নেতা হিসাবে মনোনয়ন দেবার ক্ষমতা তাঁরই আর তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিলে বা কেউ তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করলে পরিষদ নেতার উপরে অনাস্থা প্রকাশ পাবে তাই এ ব্যবস্থায়ও সে দলের লোকেরই বোর্ডে আনার ব্যবস্থা হলো। উচ্চ পরিষদে প্রার্থী হলেন খানবাহাদুর আবদুল মোমেন ও খানবাহাদুর নূরুল আমীন আর নিম্ন পরিষদের প্রার্থী হলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান। খাজা সাহেব মনোনীত করলেন নূরুল আমীন ও ফজলুর রহমানকে—ফলে খানবাহাদুর মোমেন ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম

লীগ সদস্যদের পার্টি মিটিং-এ যাঁর যাঁর বিবৃতি দিয়ে বের হয়ে এলেন। সাকুল্যে নয়জন বোর্ড সদস্য হবেন, তন্মধ্যে বোর্ডে প্রতিক্রিয়াশীল দল কেন্দ্রীয় ফয়সলায় চারজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে এল। তাঁদের প্রয়োজন ছিল মোটে একটি আসন জেতা।

এ অপমান ও পরাজয় শহীদ সাহেবকে সত্যি খুব বিপদাপন্ন অবস্থায় ফেলল—কারণ দক্ষিণ ও বামপন্থীদের এ সংগ্রামে তিনি নিজেকে না জড়াবার চেষ্টা করেছেন। ফলে আবুল হাসিম যে তাঁকে পাঁচজনের মধ্যে স্থান দিবেন—আর দিলেও যে আবুল হাসিমের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে অন্তর দিয়ে তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। এখন খাজা নাজিমুদ্দীন, যাঁকে পটুয়াখালীতে শেরেবাংলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যুদস্ত হবার পর নিজের আসনই কেবল ছেড়ে দেননি, শেরেবাংলা যেন আবার যাতে তাঁর বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় তার জন্য সে নির্বাচন কেন্দ্রকে প্রস্তুত রেখেছিলেন, সে নাজিমুদ্দীনই যখন তাঁকে মনোনীত করলেন না তখন তাঁর আর আবুল হাসিমের দলে যোগ দেয়া ছাড়া পথ ছিল না। অনেক কথার পর আবুল হাসিমের দলের মনোনীত ব্যক্তির নাম ঘোষিত হলো। দলের প্রার্থীরা ছিলেন—১. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, ২. আহমদ হুসেন, ৩. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিঞা), ৪. আল্লামা রাগিব আহ্‌সান ও ৫. আবুল হাসিম। প্রার্থীদের নাম ঘোষিত হবার পর নাজিমুদ্দীন সাহেবরাও পাঁচজনের নাম ঘোষণা করলেন—তার মধ্যে শহীদ সাহেব একজন। এ নিয়ে আবুল হাসিমের দলের মধ্যে সন্দেহ জাগল। শহীদ সাহেব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আবুল হাসিমের মনোনীত প্রার্থী—নাজিমুদ্দীন দলের নন।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো খুব গোলমালের মধ্যে। আজমীরি মফিজুদ্দীন সাহেবকে মেরে বসলেন, মোহন মিঞা ঢাকার শামসুদ্দীনকে ঘুষী মেরে ফেলে দিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)-র গলা টিপে ধরল এবং ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের উপর ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত জনাব তমিজউদ্দীন খানকে 'পোলিং অফিসার' করে দু'দলের ভোট গণনা হলো। আবুল হাসিম সাহেবের দলের পাঁচজনই বিজয়ী—অর্থাৎ পার্লামেন্টারী বোর্ডে সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করেন। এর পূর্বে সিন্ধুতে জিন্নাহ্‌র মনমত পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত না হওয়ায় সে বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে জিন্নাহ্ নিজেই বোর্ড মনোনীত করেন। একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার আবুল হাসিম সাহেবকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি উত্তরে বললেন, "বাংলাদেশ সিন্ধুদেশ না"। যা হোক, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সাক্ষাতভাবে কোন হস্তক্ষেপ করেনি যদিও পরবর্তীকালে পরোক্ষভাবে করেছিল।

পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি আবুল মনসুর আহমদ সাহেবকে পাবলিসিটি সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। এটা ছিল শহীদ সাহেবের মহানুভবতা। অন্য কোন নেতাই "ফুড কনফারেন্সের" ব্যাঙ্গ রচনার পর তাঁকে পাবলিসিটি সেক্রেটারী নিযুক্ত করার কথা চিন্তাও করত কি না সন্দেহ। আবুল মনসুর সাহেবও তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করেছিলেন।

নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলায় সর্বভারতীয় কৃষক সমিতির অধিবেশন ডাকা হয়। কমরেড মুজাফফর আহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। আমাদের ঢাকা পার্টি হাউস থেকে "ফ্রাটারনেল ডেলিগেট" হিসেবে আমি, শামসুল হক ও শামুসুদ্দীন তিন জনে ঐ অধিবেশনে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকি। কমরেড মুজাফফর আহমদ স্বল্পভাষী লোক ছিলেন, যদিও সাহিত্যিক-সাংবাদিক এবং বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে নির্যাতিত ব্যক্তি। সাম্যবাদ পূর্ববঙ্গে কেন এগিয়ে যাচ্ছে না কতগুলো বিশেষ স্থান ছাড়া সে প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম,—কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কারা আছেন দেখতে হবে। একজন ঐ জেলার মহারাজকুমার, আর একজন রাজা না হলেও সামন্তবাদী ঘরের সন্তান—কথায় কথায় বললাম—মহারাজকুমার, মনি সিংহ, আমাদের ঢাকায় অন্নদা পাল—এদের নেতৃত্বে দরিদ্র মুসলমান কি প্রেরণা পেতে পারে ? ফলে এদের প্রভাব সাওতাল, হাজং, গারোদের অথবা নীচ স্তরের তবশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যতটা এতটা নয় মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের উপর। যদিও কিছুসংখ্যক স্কুল বা পাঠশালার মুসলমান শিক্ষক এদের সঙ্গে কাজ করেন। মুসলমান নিম্ন মধ্যবিত্তরা মনে করে এরা পাকিস্তান-বিরোধী এবং বাংলাকে ভারতের সঙ্গে রাখতে চায়। গ্রাম্য মুসলমান সমাজে এখনো ধর্মের প্রতি একটা টান আছে—এবং সেটা জাগিয়ে রাখে জুম্মার নামাজ, ঈদের উৎসব—ছুত-অচ্ছুতের প্রভাব। কমরেড কোন উত্তর দিলেন না। আমি বললাম, ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে কবি নজরুল ইসলাম ও কলকাতায় খাজা নাজিমুদ্দীনের উপনির্বাচনে কবি জসিম উদ্‌দীন নির্বাচনে দাঁড়িয়েও কি মুসলমানদের ভোট পেয়েছে—তাঁদের যে সম্মান সে তো গুটিকয়েক লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই কবি নজরুল ইসলাম পারেননি। কারণ নজরুল মৌলভীদের মতে কাফের—হিন্দু মেয়ে তাঁর স্ত্রী। হুমায়ুন কবীর দাঁড়ালেও সে অবস্থা হবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, জনমতকে অগ্রাহ্য করে ভোটাররা ভোট একজনকে দিতে সাহস পায় না। কমরেড নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন সেদিন যে আমি মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

নভেম্বরের ১৬ তারিখে আবুল হাসিম সাহেব সাপ্তাহিক "মিল্লাত" বের করে। তিনি নিজে যদিও সম্পাদক কাগজের পৃষ্ঠায় কিন্তু সত্যিকার সম্পাদক ছিলেন ভার-প্রাপ্ত সম্পাদক কাজী ইদ্রিস। ঐ রকম একখানা বাংলা সাপ্তাহিক এর পূর্বে মুসলমান সমাজ থেকে বেরোয়নি এ কথা যাঁরা "মিল্লাত" পড়েছেন সে যুগে তাঁরা স্বীকার করবেন। মিল্লাতের গ্রাহক বেড়ে যাচ্ছিল দিন দিন। এবার মাওলানা আক্রাম খাঁ বুঝলেন আহ্‌সান মঞ্জিলের নিকট থেকে যেমন নেতৃত্বের "মরগেজ" ছাড়িয়েছেন তিনি, সেভাবেই এবার "প্রচারের" যে একচেটিয়া অধিকার তাঁর ছিল তার সমাপ্তি ঘটাতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এর ফলে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

নভেম্বরের ১৫ থেকে ২০ তারিখে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সম্পাদক আলোচনা করে স্থির করলেন যে, প্রতিটি জেলায় একটি করে নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং একজন করে বিশ্বস্ত

লোককে ভার-প্রাপ্ত সম্পাদক করা হবে। আমি কলকাতা থাকা পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জন্যে যে নামগুলো আলোচনা হলো তা হলো শেখ মুজিবুর রহমান—ফরিদপুর, আমি—ঢাকা, শামসুল হক—ময়মনসিংহ, খন্দকার মোশতাক আহমদ—কুমিল্লা, আবদুর রহমান চৌধুরী—বরিশাল। তখনকার ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহের নির্বাচন অফিসের সম্পাদক নিযুক্তির পরই আমি ঢাকা ফিরে আসি।

ডিসেম্বর মাসের ১০ ও ১২ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন। বাংলাদেশে পাঁচটি আসন মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত। মনোনয়ন পেলেন সর্বজনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী, স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী, তমিজুদ্দীন খান, রফিউদ্দীন সিদ্দিকী, আবদুল হামিদ শাহ্‌। ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্বাচনী কেন্দ্রে মনোনীত হলেন মৌলভী তমিজুদ্দীন খান। তমিজুদ্দীন সাহেব তাঁর জেলায় পরিচিত খুবই—কলকাতায় পরিচিত হয়েছেন ১৯৩৭ সনের পর থেকে; কিন্তু ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলায় তাঁকে তখন কেউ চেনে না। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফজলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন আমাদের ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টি অফিসে। সেটার দোতলাটি তখন সাময়িকভাবে ঢাকা জেলার নির্বাচন অফিসে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে পার্টি হাউস এতদিন যেভাবে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল—তাও অনেকটা নির্বাচন অফিসের উপর এসে চাপল। দুঃখের বিষয়, বরিশালে নির্বাচন অফিসে গোলমাল দেখা দেয়ায় আবদুর রহমান চৌধুরীর স্থলে শামসের আলীকে নিযুক্ত করা হলো। কুমিল্লায় খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের পক্ষে খানবাহাদুর আবেদুর রেজা ও খান সাহেব ফরিদুদ্দীন এবং অন্যান্য কয়েকজন উকিলের জন্য সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। কয়েকটি স্থানে পুরাতন মুসলিম লীগ এ সুযোগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল।

তমিজুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন ময়মনসিংহের দেলদুয়ারের জমিদার—এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের একজন পুরাতন নেতা স্যার আবদুল হালিম গজনভী। তার উপর তাঁর পক্ষে রয়েছেন শেরেবাংলা ও ঢাকার নবাব বাহাদুর। তাঁরা তিনজনে এক সঙ্গে দু'জেলায় নির্বাচনী অভিযান চালিয়েছেন। তমিজুদ্দীন সাহেব স্বাভাবিকভাবেই খুব ঘাবড়িয়ে গেছেন। আমি ফজলুর রহমান সাহেবকে বললাম যে, স্যার আবদুল হালিমের বাড়ি ময়মনসিংহ সুতরাং তমিজুদ্দীন সাহেব বা স্যার আবদুল হালিম কারোই বাড়ি নয়, সুতরাং এখানে মুসলিম লীগের নামে ভোট হবে। তমিজুদ্দীন সাহেব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না—আমি তাঁকে বললাম যে, "ময়মনসিংহে যে আপনার নির্বাচনের কাজে থাকবে তার উপর আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। শামসুল হকের কর্ম-ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি ততটা না জানলেও ফজলুর রহমান সাহেব জানেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর উপর আস্থা রেখে কাজ করে যাবেন। সময় পেলে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে দু'চার দিনের জন্যে একবার আসবেন।"

সেদিন ফজলুর রহমান সাহেব অনেক রাতে আমার সঙ্গে আমার বাসায় এলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন,—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আপনি কি মতামত পার্লামেন্টারী বোর্ডকে জানাবেন।" এর পূর্বেই বদরুদ্দীন সিদ্দিকী, তখন

কলকাতা ওকালতি শুরু করেছেন, এডভোকেট নূরুল হুদা সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন নূরুল হুদা সাহেবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তাঁকে মনোনয়নের জন্যে হাসিম সাহেব ও শহীদ সাহেবকে বলতে। আমি সিদ্দিকীকে বলেছিলাম,—"ফজলুর রহমান সাহেব বোর্ডের সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যদি অন্য কাউকে মনোনীত করে তবে সবাই বলবে যে, তাঁর উপর আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণতা দেখিয়েছি। শহীদ সাহেব এবং হাসিম সাহেবেরও বদনাম হবে। সুতরাং আমার রিপোর্টে এতটুকু বলতে পারি যে, যেহেতু ওটা বিশেষ নির্বাচনী কেন্দ্র সুতরাং ওখানে মুসলিম লীগের কোন মনোনয়ন দেয়া উচিত নয়।" নূরুল হুদা সাহেব খুব খুশী হননি—তবু এছাড়া আমার অন্য কোন পথ ছিল না।

ফজলুর রহমান সাহেব যখন সে কথাটা তুললেন তখন আমি বললাম, 'ওটা তো আপনাদের ব্যাপার তবে আমার ধারণা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে সেহেতু মুসলিম লীগের সেখানে কোন প্রার্থী দেয়া উচিত নয়।' ফজলুর রহমান সাহেব আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, যেহেতু ঐ নির্বাচন কেন্দ্রে হারার প্রশ্ন নেই, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও না হতে পারে সে অবস্থায় মুসলিম লীগের সাফল্যের গণনায় কেন এটাকে যোগ দেয়া হবে না সেটাই ভাববার বিষয়। আমি আর কথা বাড়ালাম না। অনেক রাতে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

এর পরেই খবর এল যে, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, শেরেবাংলা ও ঢাকার নবাব সমভিব্যাহারে ঢাকা আসছেন কলকাতা থেকে। নারায়ণগঞ্জে এমন বিক্ষোভের ব্যবস্থা করল আউয়াল, আলমাছ ও শামসুজ্জোহা যার ফলে শেরেবাংলা ঢাকায় আমার অফিসে টেলিফোন করলেন তাঁকে সসম্মানে জাহাজ হতে অবতরণ করার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে। আমি তক্ষুণি লোক পাঠালাম—বহু কষ্টে তাঁদের নামিয়ে আনা হলো। কিন্তু তার ফলে তাঁরা ঢাকায় তিন নেতার অভিযান বন্ধ করলেন। লোক লাগিয়ে টাকা দিয়ে এদিকে-ওদিকে কিছু ভোট সংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা করতে থাকলেন। আমি একবার ময়মনসিংহ গিয়ে শামসুল হকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম, ময়মনসিংহে আমাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। তমিজুদ্দীন সাহেব গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা করছেন জমিদারদের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তৃতায় একটি কথার উপরই সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট হয়েছিল—সে তাঁর আত্মজীবনী। কত কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে—খেলাফত আন্দোলনে পুলিশের ব্যাটনচার্জ সহ্য করতে হয়েছে—তারপর আজীবন জমিদারী উৎখাতের চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং নির্বাচিত হলে জমিদারী অত্যাচার থেকে প্রজাদের কেবল রেহাই দেবার চেষ্টা করবেন না—প্রজারাই যাতে জমির মালিক হয় তারও চেষ্টা করবেন। বক্তৃতা করতেন সহজ-সরলভাবে—সাধারণ লোকের বোধগম্য করে।

কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব এ নির্বাচন কেন্দ্র সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতেন। বিশেষ করে এটা তাঁর আত্মসম্মানেরও প্রশ্ন। স্যার আবদুল হালিমের বিজয় তাঁর যেন নিজস্ব পরাজয় যখন তাঁর নির্বাচনের অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন—শেরেবাংলা ও ঢাকার নবাব—যে

দু'জনকে তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি কলকাতা এসেছেন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে। হঠাৎ রাতে আমি টেলিফোন পেলাম হাসান ইস্পাহানীর কাছ থেকে তিনি অনেক সময়ে খবর নিতেন নির্বাচনের, সম্ভবতঃ জিন্নাহ্ সাহেবকে জানাবার জন্যে। আমি টেলিফোন ধরতেই বললেন, 'কায়েদে আজম কথা বলবেন।' তাঁর কথায় বুঝলাম—তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না—একটা অস্থিরতা। আমি তাঁকে বললাম যে, "স্যার আবদুল হালিমের জয়ের প্রশ্ন নেই—প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাবে কি না। তিনি কেবল—"Don't be so sure and don't be complecent and don't spare yourself." তারপর টেলিফোন কেটে দিলেন।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় জয়কার। বাংলাদেশে শতকরা একশটি আসনই মুসলিম লীগ দখল করেছে। ২৭শে ডিসেম্বর "শুকরিয়া দিবস" পালন হবে কলকাতা অক্টারলনী মনুমেন্টের পাদদেশে। আমি ২৪ তারিখে কলকাতা গিয়ে দেখি হৈ-হুল্লুর কাণ্ড। আমাদের ঢাকার শামসুদ্দীন শ্লোগান দিচ্ছে মিছিলের পুরোভাগে থেকে। সব শ্লোগান উর্দুতে। কয়েকটি এখনো মনে পড়ছে,—"লড়কে লেয়েংগে পাকিস্তান", "ছিনকে লেয়েংগে পাকিস্তান", "সিনামে গুলী লেয়েংগে পাকিস্তান বানায়েংগে" আর রাস্তার ছোকড়ারা বলছে,—"কানমে বিড়ি, মুমে পান লড়কে লেয়েংগে পাকিস্তান"। সমস্ত সমাজটা যেন পাগল হয়ে গেছে।

২৭ তারিখ দুপুর থেকেই মানুষ আসছে কত লোক আর কত নিশান। কলকাতায় যে এত মুসলমান বাস করত তা আমার ধারণার অতীত ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। বেলা চারটায় নেতারা এলেন—সর্বপ্রথম এলেন মাওলানা আক্রাম খাঁ তারপর খাজা নাজিমুদ্দীন, আবুল হাসিম এলেন—কিন্তু শহীদ সাহেবের দেখা নেই। সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। খবর আসল কে বা কারা তাঁর গাড়ি বারান্দা থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাই তিনি আসতে পারছেন না। সবাই গাড়ি পাঠাতে চায়—কিন্তু তিনি পরের গাড়িতে উঠবেন না। কি করা যায় ? এতবড় সভা অথচ তিনি এমনি ছেলেমি করছেন। পরে শোনা গেল যে, তাঁর পিতা জাহেদ সাহেবের প্যাকার্ড গাড়ি না হলে তিনি সভায় যাবেন না। সবাই মিলে তখন অসুস্থ জাহেদ সাহেবকে অনুরোধ করলেন। জাহেদ সাহেব বললেন, "ওকে গাড়ি দিলে তা কোনদিন ফেরত দেবে না—ও জীবনে যখন যা নেয় তা আর কোনদিন আমাকে ফিরিয়ে দেয় না।" তবু সবার অনুরোধে তিনি রাজী হলেন—এবং সে গাড়িতে চড়ে এলেন সভায়। এ ধরনের আব্দার বৃদ্ধবয়সেও তাঁর পিতার সঙ্গে চলত। আবুল হাসিম সাহেব বিপ্লবী বক্তৃতা করলেন বাংলায়, শহীদ সাহেব উর্দুতে। শহীদ সাহেব খুব ভাল বক্তৃতা করছিলেন আর কলকাতাবাসীদের কাছ থেকে খুব হাততালি পাচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে যে, তাঁর ২০০০ নম্বরের সোফেদ গাড়ি খোয়া গেছে—কলকাতার লোকদের সে গাড়ি খুঁজে বার করে দিতে হবে। আমি অবাক হলাম—বাবার সঙ্গে না হয় আব্দার করা চলে, কিন্তু জনগণের কাছে এটা কোন ধরনের আব্দার যে, তারা খুঁজে দেবে তাঁর গাড়ি। গাড়ি অবশ্যই পরদিন পাওয়া গেল ডায়মণ্ড হারবারের কাছে—মাতাল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা কয়েকজন গাড়ি চুরী করে ওখানে ফেলে গেছে।

এর পর এক সপ্তাহ ধরে আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা, 'মিল্লাতে'র সম্বন্ধে আলোচনা—এবং শহীদ সাহেবকে কিভাবে চাপ দিয়ে একটি দৈনিক কাগজ বের করানো যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি তাও বিবেচিত হলো।

আবুল হাসিম সাহেব আমাদের বললেন একটা কথা নিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব শহীদ সাহেবকে চাপ দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে, যেসব পরিষদ সদস্য "শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরে সরকারী দলে যোগ না দিয়ে মুসলিম লীগের প্রতি অনুরক্ত ছিল তাঁদের মনোনয়ন দেয়া উচিত। আর যেহেতু নাজিমুদ্দীন সাহেব নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না—তাই আগামী পাঁচ বছরে নেতৃত্ব নিয়ে শহীদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না, সুতরাং তারা তাঁর দলের বলেই তাদের শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। তারা নাজিমুদ্দীন সাহেবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যেহেতু তিনি নেতা নির্বাচিত হয়েছিলাম এখন যখন শহীদ সাহেব নেতা নির্বাচিত হবেন তখন তারা তাঁরই অনুরক্ত থাকবে। শহীদ সাহেব খাজা সাহেবের যুক্তি গ্রহণ করতে খুবই ইচ্ছুক, কিন্তু আবুল হাসিম সাহেবের মন সায় দিচ্ছে না কারণ ঐ চল্লিশ জনের যেসব প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমরা প্রস্তুত করেছিলেন দাঁড়া করাবার জন্যে তারা নিরাশ হবেন পার্টির কাজ করেও। এটা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে দু'জনার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা যায় না।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারির মাঝামাঝির দিকে একদিন বেগম সুলতানউদ্দীন আমাকে সকালে নাশ্‌তা খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। আমি সে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে তাঁর বাসায় যাই—এবং খাওয়া-দাওয়া করি। বেগম সাহেবা আমার আত্মীয়াও। তাই তাঁকে আমি খোলাখুলি বললাম যে, তাঁর বিরুদ্ধে যারা প্রার্থী হয়েছে তার মধ্যে আনোয়ারা খাতুনকে বোর্ডের সদস্য লাল মিঞা সাহেব কথা দিয়েছেন। বেগম সুলতানউদ্দীনকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, তবু আমার মনে হয় না যে, কোন অসুবিধা হবে।

আনোয়ারা খাতুনের বিগত জীবন ছিল বৈচিত্রময়। সে যখন ময়মনসিংহে নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখন একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে পণ্ডিতপাড়ার কতগুলো দুষ্টু ছোকরা তাকে "কিড্‌ন্যাপ" করে এবং পরের দিন তাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে যায়। এ ঘটনায় যারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতি ছিল তারা সবাই খুব দুঃখিত হয় কারণ ঐ ধরনের ঘটনা ঘটলে মুসলমান ভদ্রলোকরা মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ঘটনাটাকে হাল্কা করে দেয়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলী আমজাদ খান তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সুলতানউদ্দীন সাহেব সে বিয়েতে কেবল উপস্থিত ছিলেন না আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য বন্ধুদের মত, তিনি "মেয়ের উকিলবাপ" হয়েছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস আজ সেই আনোয়ারা খাতুনই বেগম সুলতানউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুলতানউদ্দিন সাহেবের বাসা থেকে বের হয়ে আমি আমার বাসায় পৌঁছেছি—বাথরুমে ঢুকছি এমন সময় খবর এল যে, আমার অফিসের সম্মুখে লোকজন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এবং চেয়ার-টেবিল ভাংছে। অফিসে তখন শওকাত আলী ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। যেহেতু সবাই মনোনয়ন দানের অপেক্ষা করছে সুতরাং নির্বাচন

অফিসে তেমন কাজকর্ম ছিল না। আমি অফিসে এসে শুনলাম যে, বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুলতানউদ্দীন সাহেব, আতাউর রহমান খান সাহেব, আবদুল ওয়াসেক সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। চেয়ার-টেবিল ভেংগে ফেলেছে, টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলেছে—পোস্টার দেয়াল থেকে তুলে ফেলেছে। হিসাবের কাগজ-পত্র সব বাইরে ফেলে দিয়েছে। আমি খানবাহাদুর আওলাদ হোসেন সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁকে সব কথা বললাম এবং তাঁর মত নিয়ে টেলিফোনে আবুল হাসিম সাহেবকে সব কথা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন যে, "এটা ঠিক যে, শহীদ সাহেবের সঙ্গে ঐ ৪০ জনের সম্বন্ধে একটা আপোষ রফা হয়েছে এবং ৩৫ জনকে শহীদ সাহেব মনোনীত করতে রাজী হয়েছেন, তবে তার মধ্যে বেগম সুলতানউদ্দীন বা আবদুল ওয়াসেক ও আতাউর রহমান সাহেবদের কোন ক্ষতি হত না। আমি লাল মিঞা সাহেবকে বেগম সুলতানউদ্দীনের সম্বন্ধে আপনার কথা বলেছিলাম এবং তিনি অনেকটা রাজী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারের পরে অবস্থা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করলেন আবদুল ওয়াসেকের ওখানে আপনি কাকে মনোনয়নের জন্যে অনুরোধ করবেন। আমি বিনা দ্বিধায় বলে দিলাম খান বাহাদুর আবদুল খালিক সাহেবের নাম যিনি সবেমাত্র "ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্" পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এবং আরো আলাপ করব।" হাসিম সাহেব আমাকে জানালেন ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের "লিস্ট" তৈরি হয়ে যাবে তার পূর্বেই যেন একবার দেখা করি।

ইতিমধ্যে চান্দিনা (কুমিল্লা) থেকে আমার স্ত্রীর তার টেলিগ্রাম এল আমাকে শীঘ্রই সেখানে যেতে। আমার স্ত্রী তখন তাঁর মামা মোশাররফ হুসেন সাহেবের ওখানে বেড়াতে গেছেন। তিনি চান্দিনার মহকুমা হাকিম। পর দিনই সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, আমার স্ত্রী টেলিগ্রাম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টেলিগ্রাম করেছে তাঁর এক মামাত ভাই। আমাকে নিয়ে গেছেন মফিজুদ্দীন সাহেবের "নমিনেশন"-এর কথা বলার জন্য। আমার মামা শ্বশুর ও মফিজুদ্দীন সাহেব একত্রে খেতে বসলাম। মামা বললেন, মফিজুদ্দীন সাহেব তাঁর আত্মীয় ও ভায়রাভাই।

শুধু ঐ কারণে আমাকে চান্দিনা থেকে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ওখান থেকে ফিরে এসে কলকাতায় গেলাম। ইতিমধ্যে কে যেন খানবাহাদুর শহীদুল হকের পক্ষে এক বিরাট চিঠি লিখেছে আবুল হাসিম সাহেবের নিকট। তার মধ্যে তোফাজ্জল আলী (টি. আলী) সাহেবের বিরুদ্ধেও অনেক কিছু বলা হয়েছে। ইংরেজী বেশ ভাল, নির্বাচন কেন্দ্র সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল বিশ্লেষণ। অথচ চিঠিটা বেনামী। তোফাজ্জল আলী সাহেব আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, আমি কিছুদিন আগেই কুমিল্লা গিয়েছিলাম—এবং আমিই ঐ চিঠি লিখেছি। অদ্ভুত যুক্তি। হাসিম সাহেবের সঙ্গে বা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে আমার রাজনীতির ভেতর দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে বেনামী চিঠি তাদের কাছে আমার যে পাঠানোর প্রয়োজন নেই তা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। এমনি সব ভুল বোঝাবুঝি তখন নানা জায়গায় সৃষ্টি হয়েছিল।

আবুল হাসিম সাহেবকে ঘটনার মোটামুটি বিবরণ দিলাম। কুমিল্লা সম্বন্ধে আলোচনা হলো, বিশেষ করে আমাদের নির্বাচন-অফিস নিয়ে। খন্দকার মোশতাক সাহেবের অসুবিধাসমূহের কথা। কুমিল্লায় আমাদের ভিত্ শক্ত নয়—এবং এখনো খাজাদের এজেন্টদের প্রভাব বিস্তর। আমি সে মাসেই খন্দকার মোশতাক সাহেবের দশপাড়া বাড়ি যাই এবং তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সুন্দর চেহারা, সোফেদ দাড়ী, পীরমানুষ। মোশতাক সাহেবের ভাইদের মধ্যে তখন নাসীম আহ্মদ সাহেবকে সবাই জানতো খুব ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে—তারপরে আরও জানল লোকে যখন তাঁর স্ত্রীর আত্মহত্যার কথা খবরের কাগজে বেরুল। তাঁর বড় ভাই ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জনাব মোসলেহ্উদ্দীন সাহেব। মোশতাক সাহেব যেমন ছাত্র রাজনীতি করার সময় থেকে সাধারণ লোকের সাথে মিশতে পারতো মোসলেহউদ্দীন সাহেব তা পারতেন না—যদিও তাঁরও রাজনীতি করার বাসনা ছিল। খান্দানী মনোভাবের রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে যে একটা দেশময় জনমত গড়ে উঠেছে বলতে গেলে ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরের পর থেকেই সেটা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। তিনি পরে ঢাকা জেলার আবদুল করিম পেশকার সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা আলতাফুন্নেছাকে বিয়ে করেন। আলতাফুন্নেছা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুব সম্ভব ১৯৩৬ সনে ইংরেজীতে এম. এ. পাস করে স্কুল ইন্সপেক্ট্রস্ হয়েছিলেন। তাঁর ছোট বোন আখতার ইমাম পরবর্তীকালে ঢাকা মেয়েদের হলের প্রভোস্ট হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ড তাঁদের ১১৯টি আসনের মনোনয়ন সম্পন্ন করেন—কিন্তু অনেকেই ঐ মনোনয়নের বিরুদ্ধে আপীল করলেন এই বলে—খাজা সাহেবদের দলের লোক বলে অনেককে বাদ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের পক্ষ থেকে চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও হাসান ইমাম সাহেব আপীল শুনলেন। তাঁরা ২২ জনের আপীল গ্রহণ করলেন—ফলে দাঁড়াল যে, পরিষদে খাজা সাহেবদের একটি ভাল ব্লক তৈরি হলো। প্রথম ৩৫ জন শহীদ সাহেবের সঙ্গে নাজিমুদ্দীন সাহেবের চুক্তির ফলে, আরো ২২ জন আপীলের ফলে। অর্থাৎ ১১৯ জনের মধ্যে ৫৭ জন রইলেন খাজা ব্লকের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে কোন মনোনয়ন দেয়া হলো না। সর্বজনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল হামিদ এম.এস.সি'র মনোনয়ন বাতিল করে আপীল বোর্ড হাবিবুল্লাহ্ বাহার, আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং সৈয়দ আবদুস সেলিমকে মনোনয়ন দিলেন। ৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাস হয়ে গেল।

সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঠিক হলো ১৯ হতে ২২ শে মার্চ পর্যন্ত। ঢাকার নির্বাচনের আলোচনা করার পূর্বে বাংলার সাধারণ নির্বাচনের পটভূমি যা দেয়া হলো তা হচ্ছে সোহ্রাওয়ার্দী, আবুল হাসিম সাহেবদ্বয়ের জিন্নাহ্র প্রতি বিরূপ মনোভাব। পার্লামেন্টারী বোর্ডের পক্ষ থেকে জিন্নাহ্ সাহেবকে মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচন অভিযানে অংশগ্রহণ করতে বলা হলো না যদিও হাসান ইস্পাহানী ব্যক্তিগত একটা চিঠিতে জিন্নাহ্কে লিখেছিলেন সে যেন বাংলাদেশটাকে একেবারেই ভুলে না যায়। এটা

বোধহয় সিন্ধুদেশে জিন্নাহ্ নির্বাচিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের উপর হস্তক্ষেপের ফলে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনে কেবলমাত্র নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের নির্বাচন কেন্দ্রে এক পক্ষকাল কাটিয়ে অন্য সব প্রদেশকে অবহেলা করার জন্যে। জিন্নাহ্র পক্ষে বলে যায় যে, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কাজেমী সাহেব যে শরিয়ত বিল এনেছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং জিন্নাহ্ সে বিলের বিরোধীতা করেছিলেন। পরে আপোষ হয়েছিল এই বলে যে, শরিয়ত আইন বোম্বেতে বা ইসমাইলি, মেমন, কাচ্চি মেমন প্রভৃতির উপর প্রযোজ্য হবে না। যে মুসলিম লীগ শরিয়তের আইনের বিরোধিতা করে তাদের ইসলামের নামে নির্বাচনের অধিকার যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য সহজে হয়নি। জিন্নাহ্ সাহেব তাই আলীগড়ের সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে এবং বিশিষ্ট আলেমদের যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাফর আহমদ ওসমানী সাহেব প্রভৃতিদের নিয়ে অভিযান চালিয়েও মোট আট শত ভোটের তফাতে লিয়াকত আলীকে পাস করানো সম্ভব হয়েছিল। যে কারণেই হোক, জিন্নাহ্ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। আক্রাম খাঁ অসুস্থতার ভান করে মধুপুরে—স্বাস্থ্য পরিবর্তন করার জন্যে চলে গেলেন। আর জিন্নাহ্ সাহেব খাজা নাজিমুদ্দীনকে লণ্ডন পাঠালেন বৃটিশ সরকারের মনোভাব লক্ষ্য করতে—তাঁকে পাঠানো হলো কারণ বাংলার প্রাক্তন গভর্ণর এবং নাজিমুদ্দীন সাহেবের পরম বন্ধু স্যার জন এণ্ডারসন তখন বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী। ঐ দলের বাকি দুই নেতা ফজলুর রহমান সাহেব ও নূরুল আমীন তাঁদের নিজেদের নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যস্ত থাকতে হলো। ফজলুর রহমান মুসলিম লীগের নমিনেশন পাননি, সুতরাং তিনি কোন রকম অবহেলা করতে পারেন না তাঁর ভোটারদের—নূরুল হুদা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং বদরুদ্দীন সিদ্দিকী ও মোহাম্মদ হোসেন (ঠাণ্ডা) তার অভিযান পরিচালনা করছে। ঠাণ্ডা মিঞা ছিলেন ফজলুর রহমান সাহেবের ভাগ্নে। অন্য দিকে নূরুল আমীন সাহেব ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে পাঠশালার শিক্ষক কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরীর নিকট যেভাবে পরাজয় বরণ করেছিলেন—তারপর তিনিও নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে শহীদ সাহেব ও আবুল হাসিম সাহেবের উপরই ভার পড়েছিল বাংলাদেশে কর্মীবৃন্দকে নিয়ে অভিযান চালনা করার। আলীগড় থেকে এ. টি. এম. মোস্তফা একদল ছাত্র নিয়ে কলকাতা এলেন নির্বাচন অভিযানে সাহায্য করার জন্য। আবুল হাসিম সাহেবের ঘরে আমার সঙ্গে তাঁদের দেখা—আমি বললাম, আলীগড়ের ছাত্ররা যেহেতু বাংলায় বক্তৃতা করতে পারেন না তাই এখানে তাদের প্রয়োজন নেই। কলকাতার দক্ষিণ থেকে খাজা নূরুদ্দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাস করেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব চব্বিশপরগণা কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং কলকাতা উত্তর থেকেও বিশেষ কেউ তাঁর বিরদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। ঢাকা শহরের নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ প্রার্থী নন, সুতরাং যেসব জায়গায় উর্দু বলতে পারে বা বুঝতে পারে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। তারা বরঞ্চ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বিশেষ করে পাঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কাজ করলে ভাল হবে।

এদিকে সিলেট থেকে আবদুর মতিন চৌধুরী ও মনোয়ার আলী সাহেব জিন্নাহ্‌কে নিমন্ত্রণ করলেন—জিন্নাহ্ সে আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে কলকাতা এলেন। তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হলো। বাংলার কোন জেলায় তাঁর জন্যে কোন সভা-অনুষ্ঠান করা হয়নি। তাই স্থির হলো যে, কলকাতা থেকে ট্রেনে সিলেট যাবেন। আমাকে আর শামসুল হককে বলা হলো তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যে যদি পথিমধ্যে কোথায়ও তাঁর বক্তৃতা বাংলা করার প্রয়োজন হয় তার জন্যে। হাসান ইস্পাহানী, খাজা নূরুদ্দীন অন্যান্য কয়েকজন কলকাতার নেতৃবৃন্দও সঙ্গে চললেন। জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে এটাই আমার দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী দেখা। আমাদের সিলেট পৌঁছতে প্রায় একটানা ২৬ ঘণ্টা লেগেছিল। অনেক স্টেশনে তাঁকে দেখার জন্য প্রচণ্ড ভীড় করে আছে লোকজন—জিন্নাহ্ সাহেবকে দেখার জন্যে। অথচ জিন্নাহ্ সাহেব কিছুতেই তাঁর সেলুনের দরজা খুলবেন না। স্যুট পরে আছেন, শুধু ট্রেনে উঠে জ্যাকেটটা খুলে ব্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা ভাবলাম যে, তিনি আমাদের উপস্থিতির জন্যে শোবার পাজামা পরতে পারছেন না। তাই আমরা এক স্টেশনে নেবে কয়েক স্টেশন পার হয়ে যখন আবার উঠলাম, দেখলাম আমাদের ভুল—তিনি কাপড় ছাড়েননি, এমনকি সার্টের ভাঁজ (ক্রীজ) ভাংতে পারে—তাই সহজভাবে দেহটাকে এলিয়ে দেননি। আমরা বললাম যে, তিনি কিছু খাবেন কিনা জানার জন্যে ইস্পাহানী সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'না আমি বিস্কিট কফি খেয়ে নিয়েছি।' বুঝলাম খাবেন না কারণ মিটারগেজের ট্রেনের সেলুনে যে ল্যাভেটরী তিনি তা ব্যবহার করতে চান না সেজন্যে ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দিতে চান না। শামসুল হক তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে ফোল্ডিং চেয়ারটাকে একটু পিছে টেনে বসতে গেলে তিনি অমনি বলে উঠলেন, 'যেখানে চেয়ার আছে সেখানে রাখ।' তাঁর নিজের সাজানো ঘরে যেন কোথাও পান থেকে চুন খসারও উপায় নেই। এর সঙ্গে কোন আলোচনা করা যায় না, শুধু নীরবে নেতাকে অবলোকন করা যায়। আমাদের বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে কত তফাৎ। আমাদের নেতারা কি শেরেবাংলা, কি শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কি আবুল হাসিম একা থাকতে পারেন না—সর্বদাই লোকজন দ্বারা ব্যাপ্তিত থাকতে চান এমনকি খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বৈঠকখানায়ও লোকের ভীড় থাকত। শহীদ সাহেব ও ফজলুল হক সাহেবের এমনকি আবুল হাসিম সাহেবেরও 'প্রাইভেসী' বেশি ছিল না লোকজন যে কোন সময় তাঁদের বসার ঘরে ঢুকে পড়তেন, কিন্তু নাজিমুদ্দীনের বৈঠকখানা ভর্তি হলে চাকর গিয়ে খবর দিত—তখন তিনি নেমে আসতেন তাঁর চুরীদার-পায়জামা ও আংগারাখা পরে। তারপর সবাইকে একে একে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করতেন—কারো কারো সঙ্গে আলাপ করতেন। তারপর যাবার সময় সবার নিকট বিদায় নিয়ে চলে যেতেন ঝুঁকে আদাব-আরজ করে। এর ফলে সবার সঙ্গে দেখা হতো—সবাই খুশী হতো—কিন্তু মনের কথা কেউ বলতে পারত না। ফজলুল হক সাহেব ও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব কানকথা শুনতেন—এবং সে ভিত্তিতে অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিতেন, খাজা নাজিমুদ্দীনের সেটা ছিল না—তিনি কান দু'টো রেখেছিলেন কেবল খাজা শাহাবুদ্দীন ও ফজলুর রহমানের জন্য। মাঝে মাঝে হামিদুল

হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, নূরুল আমীন প্রভৃতি কয়েকজন ভাবতেন যে, তাঁদের কথা নাজিমুদ্দীন শুনতেন—কিন্তু আমার ধারণা তাঁদের কথা শোনার পরে খাজা শাহাবুদ্দীন বা ফজলুর রহমানের সঙ্গে তিনি ঐসব বিষয়ে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব কখনো কখনো খুব কঠোর হতে পারতেন। যেমন ১৯৪৩ সনে সুলতানউদ্দীন সাহেবকে উচ্চ পরিষদে লীগের মনোনয়নের পর যখন সেটা কেটে দেয়া হলো তখন আমরা কয়েকজন তাঁকে ধরলাম তাঁর মনোনয়ন বহাল রাখতে, প্রথমে তো কিছুতেই রাজী নন পরে যখন বললাম যে, "নমিনেশন ফাইল" করার সময় পেড়িয়ে গেছে—সুতরাং ঐ কাটার অর্থ দাঁড়াবে—ফজলুল হক সাহেবের মনোনীত প্রার্থী ইব্রাহীম সাহেবের নিশ্চিত জয়—তাতে পাকিস্তান দাবীর ক্ষতি। তখন তিনি রাজী হলেন এই শর্তে যে, তাঁকে নির্বাচনের পূর্বেই তারিখবিহীন পদত্যাগপত্র তাঁর তাতে দিতে হবে। এটা যে অপমানজনক প্রস্তাব তা তাঁকে আর বোঝাতে পারলাম না অগত্যা পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হলো তাঁর কাছে। অন্যদিকে ফজলুল হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যেও অনেক ব্যাপারে পার্থক্য দেখা যেত। শহীদ সাহেব কারো নাম সহজে মনে রাখতে পারতেন না। আমার বিশ্বাস সারা বাংলায় শহীদ সাহেব দু'শতের বেশি লোকের নাম ঠিকমত মনে রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে ফজলুল হক সাহেব অনেকদিন পরে দেখা হলেও নাম ধরে ডাকতে ভুল করতেন না। যারাই তাঁর সাহচর্যে এসেছিলেন তারাই দেখেছেন নাম মনে রাখার স্মরণশক্তি তাঁর অপূর্ব। আমি নিজেই অনেক সময় বিস্মিত হতাম। ফলে সবার নিকট তিনি খুব আপন হয়ে উঠতেন। আমার আজো ধারণা যে, পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক নেতা শেরেবাংলার সে গুণ পায়নি। অপরদিকে শহীদ সাহেব যদি সরলভাবে তাঁর ঐ দুর্বলতার কথা স্বীকার করতেন তাহলে এত ক্ষতি হত না তার যা হয়েছে সে দুর্বলতা ঢেকে রাখতে গিয়ে। তার ফলে কোন পরিচিত কর্মী তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখলেই তিনি চক্ষু বন্ধ করে—ভাবতে থাকতেন "লোকটি কে, কি নাম" যদিও খুব চেনা মনে হচ্ছে। বেশির ভাগ সময়ই তিনি চোখ বন্ধ অবস্থায় "বাথরুমে" গিয়ে চোখ খুলে চিন্তা করতেন যদি তারপরও মনে হতো না তখন তিনি নাটকীয় ব্যবহার করতেন। খুব জোড়ে চীৎকার করে বলে উঠতেন একটা কিছু, ফল দাঁড়াত যে সে লোক তাকে রূঢ় প্রকৃতির লোক বলে তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। মনে করতেন তিনি তার ভক্তদেরও সম্মান রাখতে জানেন না। অনেক সময় নামগুলো বিকৃত করে উচ্চারণ করে নাটকীয় ভঙ্গীতে চেয়ে দেখতেন তার ফল কি হয়। যেমন আতাউর রহমান সাহেবকে—কখনো খান মোহাম্মদ আতা, আতা মোহাম্মদ খান। এসব করতেন মনের ভেতরে নামের একটি ছাপ ফেলাবার জন্যে। যাতে ধীরে ধীরে নামটি তাঁর অন্তরে গেঁথে যায়। মামলা পরিচালনার সময় আসামী ও সাক্ষীদের নাম ছোট খাতায় বার বার লিখতেন এবং এ ব্যাপারে জুনিয়র এডভোকেটের উপর খুব নির্ভর করতেন অন্যদিকে ফজলুল হক মামলার ঘটনা অনেক সময় উলট-পালট করে ফেলতেন—সে আসামী পক্ষে না বাদী পক্ষে তা ভুল করে বসতেন, কিন্তু কোন

মামলায় কার পক্ষ সমর্থন করছেন এটা ঠিক হয়ে গেলে সে মামলায় জড়িত লোকদের নিয়ে কোন অসুবিধা হত না। তিনি নথিপত্র পড়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর জুনিয়রের কাছে ছেড়ে দিতেন কিন্তু একটি গুণ দেখেছি তাঁর মধ্যে সে হচ্ছে মামলার ঠিক আসল বস্তুকে নথি একবার পড়লেই ধরে ফেলতেন। তাঁর জুনিয়র হিসেবে কাজ করার খুব বেশি সুবিধা আমার হয়নি, তবে নারায়ণগঞ্জের "কোল কন্ট্রোলার" ভূতপূর্ব মুনসেফ আবদুল ওয়াহাব সাহেবের মামলায় গোয়ালন্দ থেকে আসার সময় আতাউর রহমান খানও আমার সঙ্গে নথি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মামলার যেখানে আমাদের দুর্বলতা সেটা ঠিক ধরে ফেললেন এবং মামলা পরিচালনার সময় দেখা গেল আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আর একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, যদিও দু'নেতাই ভোজন-বিলাসী ছিলেন কিন্তু ফজলুল হক যেমন অবলীলাক্রমে খাবার জিনিস চেয়ে নিতেন শহীদ সাহেবের আভিজাত্যে তা বাজত। যেমন কেউ ভাল পিঠা তৈরি করেন তার কাছে সহজভাবে তিনি বলতেন, 'তোমার পিঠা কিন্তু এবার শীতে খাওয়া হয়নি।' মুন্সিগঞ্জে পৌঁছলে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, 'মুন্সিগঞ্জের অমৃতসাগর নিয়ে এস'—বা 'মূলা নিয়ে এস।' নৈড়া স্টেশনে এলে বলতেন, 'সন্দেশ আনো।' প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ইংরেজ সাহেব থাকলেও অবলীলাক্রমে তাকে দেশী পিঠে খেতে বলতে দ্বিধা করতেন না। কুমিল্লার ভূতপূর্ব মন্ত্রী আবদুল করিম সাহেব ছাড়া আর কাউকে কয়েক টিফিনক্যারিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে চলতে দেখিনি। শহীদ সাহেব এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাহেবী বজায় রাখতেন।

যাক যা বলছিলাম—জিন্নাহ্ সাহেবকে নিয়ে যখন ময়মনসিংহ সিংজানী স্টেশনে পৌঁছলাম তখন লক্ষ লক্ষ লোক দু'দিন আগে থেকে চিড়া-মুড়ি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে জিন্নাহ্ সাহেবকে একনজর দেখার জন্যে। রেললাইনের উপর কলাগাছ ফেলে রেখেছে। যেহেতু এটা শামসুল হকের জেলা। সুতরাং সে জেদ করতে শুরু করল যে, জিন্নাহ্কে একবার বাইরে এসে "ওভারহেড ব্রীজের" উপর দাঁড়াতে হবে দর্শন দেবার জন্যে। জিন্নাহ্ও বেকিয়ে বসলেন তিনি কিছুতেই সেলুন থেকে বেরুবেন না। অগত্যা আমি বললাম, "আপনি একটু গেটের কাছে দাঁড়ান বা জানালাটা খুলে দিন।" তিনি বললেন, "না"—কারণ তাঁর যুক্তি যে, জনসমুদ্র তাঁকে দেখার জন্যে সবাই ট্রেনের দিকে চলে আসবে ফলে "স্ট্যাম্পিডে" বহু লোক পিষে মারা যাবে—হয়তবা ট্রেনটাই উল্টে যাবে—এবং সবাই আমরা প্রাণ হারাব। শামসুল হক জোর দিয়ে বললেন যে, সে ব্যবস্থা তাঁর লোকেরা করবে। তারা লাইন করে হেঁটে যাবে এবং যাবার সময় একটা করে ছালাম দিয়ে যাবে। জিন্নাহ্ যত বড় জননেতাই হোক, তাঁর মন কখনো জনতাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে পারত না। যাক শেষ পর্যন্ত উনি রাজী হলেন শামসুল হকের কথায় এবং তাঁকে সেভাবে লোকদের বুঝিয়ে দিতে বললেন। শামসুল হক 'মাইক' যোগে কিভাবে জনতা দেখতে পারবে তা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বুঝিয়ে দিয়ে পুলিশ এবং ভলান্টিয়ারদের দাঁড় করিয়ে সেলুনে এসে জানালা খুলে দেবার অনুমতি চাইলেন। জানাল খুলে জিন্নাহ্ হাত নাড়িয়ে বললেন, "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" সঙ্গে সঙ্গে কেবল

জিন্দাবাদ ধ্বনি হলো না—মানুষ যারা সম্মুখে ছিল আবার তাদের ঠেলে যারা পেছনে ছিল তারা সবাই এগিয়ে আসতে লাগল কামরায় দিকে ভলান্টিয়ার ও পুলিশের চেষ্টা, শামসুল হকের মাইকে বক্তৃতা-অনুরোধ কোন কাজ হলো না। জিন্নাহ্ সাহেব জানালা বন্ধ করে দিলেন—পুলিশ লাঠিচার্জ ও ফাঁকা আওয়াজ করল তারপর কলাগাছ সরিয়ে দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। জিন্নাহ্ সাহেব বললেন,—

> "Young men, you have still lots of things to learn about mob. you have shown an indisciplined Bengali mob let me expect in future disciplined people here."

শামসুল হক খুব বিচলিত হলেন। এর পর বাকি পথে আর তাঁকে অমনি অনুরোধ করা হয়নি যদিও ভৈরবে একটি বৃদ্ধ এক ঘটি দুধ জিন্নাহ্কে নিজ হাতে দেবার জন্যে অনেক অনুনয় করল। হাসান ইস্পাহানী তাঁর পক্ষ থেকে দুধটা গ্রহণ করলেন। এভাবেই তিনি বাংলার উপর দিয়ে আসামে গেলেন। আমরা যদি বিশেষ কয়েকটি স্থানে জিন্নাহ্ বক্তৃতা করবেন বলে পূর্বেই ঘোষণা করে দিতাম—এবং মিটিং-এর সেভাবে ব্যবস্থা থাকত এবং লোকেরা জানতে পারত কোথায় তারা দাঁড়াবে তাহলে এ অবস্থাটা হতো না। আসল ব্যাপার আমরা তাঁকে মওকা দিতে চাইনি।

দিল্লীতে ফিরে গিয়ে তিনি লিয়াকত আলী খানকে পাঠালেন বাংলার নির্বাচন তদারক করতে। আবুল হাসিম সাহেব বুদ্ধি করে তাঁর জন্যে সবচেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহে মুসলিম লীগ কনফারেন্স করে তাঁকে সেখানে সভাপতিত্ব করতে বললেন। আবুর মনসুর আহমদ সাহেবের উপর ভার পড়ল গফরগাঁয়ে কনফারেন্সের আয়োজন করতে। ১৯৩৭ সনের নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়েছিলেন জিন্নাহ্ সাহেব, কিন্তু তিনি তাঁর মাথা থেকে সোনার হ্যাটটি পর্যন্ত নামাতে অস্বীকার করলেন—ফলে ইব্রাহিম সাহেব ভোট পেলেন না। এবারও ময়মনসিংহে এক গিয়াসউদ্দীন পাঠান ছাড়া আর কেউ নবাবজাদাকে নিমন্ত্রণ করতে চাইলেন না। শামসুল হক ও আবুল মনসুর সাহেব তাঁদের ভলান্টিয়ারদের নিয়ে গফরগাঁও গেলেন। কিন্তু তাঁরা খুব বেশি এগুতে পারলেন না। আমাকে তার করলেন ঢাকা থেকে খুব জাঁদরেল সাহসী যারা খুনাখুনীতে ওস্তাদ এবং কাউকে ভয় করে না—এমনি কয়েক শত লোক নিয়ে গফরগাঁ যেতে। আমি ঢাকা শহরের মুসলিম লীগের নতুন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনায় বসি। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শহর সভাপতি কাজী মোহাম্মদ বশীর। সেক্রেটারী, কলতাবাজারের হাবিবুর রহমান এবং ট্রেজারার ইয়ার মোহাম্মদ খান, শওকাত আলী, ডাক্তার মেছবাহ্উদ্দীন প্রভৃতি। তাঁদের পছন্দ করা দেড় শত টাকার ডাক্সাইটের লোক নিয়ে আমি এবং তাজুদ্দীন রওনা হলাম। স্টেশনে এসে যা দেখলাম—তাকে আমার অন্তর কেঁপে উঠল। মস্ত বড় বড় রামদাও নিয়ে হাজার হাজার লোকের মিছিল। আমাদের ক্যাম্পে যাবার পথে, আমাদের দু'পাশে তারা রামদাও, বর্শা উঁচু করে লাফাচ্ছে, আর চীৎকার করছে "এমারত পার্টি জিন্দাবাদ, মাওলানা শামসুল হুদা জিন্দাবাদ"। আমি কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না হঠাৎ দেখলাম তাজুদ্দীন সমানভাবে শ্লোগান দিচ্ছে "লাঙল যার জমি তার", "জমিদার নিপাত যাও", "জমিদারী

প্রথা উচ্ছেদ কর" একবারও বলছে না "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ" এ শ্লোগান শুনে তারা যেন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে প্রথম দেখা পেলাম বাহাউদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে—সে কোন রকম প্রাণে বেঁচে মসাখালী থেকে এসেছে। তার খবর অনুযায়ী শামসুল হককে মাওলানা ধরে নিয়ে গেছে। 'আজাদে'র রিপোর্টার আবু জাফর শামসুদ্দীনকে মেরেছে তার সাইকেল পানিতে ফেলে দিয়েছে—ইত্যাদি নানা রকমের খবর। আমার ঢাকার সাহসী বীর পুরুষরা সেখানে থাকতে রাজী নয়। তারা ছুরিমেরে অনেক মানুষ মেরেছে তাদের জীবনে, কিন্তু অতবড় রামদাওর সঙ্গে ছুরি চালানো অসম্ভব ব্যাপার। পরের দিন তাদের ট্রেনে তুলে দিতেই হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নূরন্নবী চৌধুরী—ময়মনসিংহের পুলিশবাহিনী পর্যাপ্ত নয় বলে ঢাকা তার করেছেন—আরো বন্দুকধারী পুলিশের জন্যে। কারণ তার ধারণা যে, নেতারা যেদিন আসবেন সেদিন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যাবে।

নেতারা এলেন। নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আজাদ সোহবানী, আবুল হাসিম। আমরা স্টেশনে গেছি বন্দুকধারী পুলিশ সমভিব্যাহারে তাঁদের আনতে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নূরুন্নবী সাহেব ও পুলিশ সুপার নিজেরা উপস্থিত। দূরে দেখা গেল যে, রামদার মিছিল আসছে—পুলিশ কর্ডন ভেদ করে কিছুসংখ্যক লোক প্ল্যাটফরমে চলে এসেছে। লিয়াকত আলী খানের "ভেলে" (দেখাশুনা করার লোক) যেই মাত্র দরজা খুলছে অমনি এক পাথর এসে লাগল তার মুখে একটা দাঁত ভেংগে রক্ত পড়তে লাগল। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে তারা দূরে সরে গেল বন্দুকধারী পুলিশরা পজিশন নিয়ে রাইফেল তাক্ করে ফেলল। শহীদ সাহেব নেমে এলেন প্রথম, তারপর আবুল হাসিম সাহেব এর পর নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দেখা গেল বেটে-খাট মোটা মানুষটির আচকানের নীচে টাইট চুরীদার পাজামা। তাঁর দু'হাঁটু এমনভাবে কাঁপছে যে, তিনি আর কিছুতেই নামতে পারছেন না। নূরন্নবী সাহেব তাঁকে হাত ধরে নামালেন। তারপর নামল নবাবজাদা। মুখ ভয়ে ফেকাসে হয়ে গেছে। সভার প্যাণ্ডেল পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের পৌঁছে দিয়ে গেল। প্যাণ্ডেলের চারপাশে বন্দুকধারী পুলিশ। ছেলেরা, ভলান্টিয়াররা খড়ের উপর শুয়ে আছে। তাদের খাবার-দাবারের তেমন ব্যবস্থা নেই। বক্তৃতা করলেন মিনিট দশেক খাজা নাজিমুদ্দীন, শহীদ সাহেব আধ ঘণ্টা। শহীদ সাহেব একটা কথা বললেন যে, শামসুল হক বা অন্য কারো যদি কোন ক্ষতি হয় তবে তার প্রতিশোধ মাওলানার উপর উঠবেই—যখন তিনি পরিষদ সদস্য হয়ে কলকাতা যাবেন। আবুল হাসিম সাহেব তাঁর বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন যে, "আমি মাওলানা শামসুল হুদাকে তুলনা করব না মিরজাফরের সঙ্গে আমি তাকে তুলনা করব মোহাম্মদী বেগের সঙ্গে যে সেজদারত সিরাজ-উদ-দৌলাহ্‌কে হত্যা করেছিল। তারপর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন আবুল মনসুর আহমদ সাহেব। অনেক প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করলেন, "বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ"। ঐ পরিস্থিতি ওখানে কেউ "বিনা খেসারত" কথাটা নিয়ে কোন তর্ক উপস্থিত করেনি কারণ ওটা প্রজা-আন্দোলনের পুরনো শক্ত ঘাঁটি। নবাবজাদা বোধহয় কিছু বোঝেননি। তাড়াতাড়ি সভা শেষ করে শেষের ট্রেনে তাঁরা নবাবজাদা ও খাজা সাহেব ময়মনসিংহ

চলে যাবেন এ ছিল ব্যবস্থা। তাঁরা খাস উর্দুতে বক্তৃতা করেছিলেন—যা মুসলিম লীগের লোকেরও কারো বোধগম্য হয়নি। ইংরেজীতে বললে হয়ত অন্ততঃ ছাত্ররা বুঝত।

আমাদের অধিবেশন শেষ হলো। এখানে গিয়াসউদ্দীন পাঠানের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা হয়েছিল যদিও তা হয়নি। অধিবেশনের রাতেই শামসুল হক সুস্থ শরীরে ফিরে এলেন শুনলাম যে, তিনি মাওলানার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বাহাস্ (ধর্মীয় বিতর্ক) করতে গিয়েছিলেন।

মাওলানা শামসুল হুদার সংগঠনশক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁর নিজস্ব একটি প্রেস ছিল। সেই "সেতারা প্রেস" থেকে ট্রেডেল মেশিনে যে ছোট ছোট ছাপানো বিজ্ঞপ্তি বেরোত তাই লোকে বিশ্বাস করে ফেলত। ধর্ম এবং প্রজা-আন্দোলনের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য এনে মানুষগুলোকে সংগঠন করেছে যারা মরতে ভয় পায় না। আমি শরিয়তুল্লাহ্ বা দুদু মিঞার ফরায়েজী আন্দোলন চোখে দেখিনি—কিন্তু এমারত পার্টির আমীর মাওলানা শামসুল হুদার ক্ষমতা দেখে মনে হলো—সে গফরগাঁয়ে যেটা করতে পেরেছে সেটাই একটু বৃহৎ আকারে তিতুমির বা হাজী শরিয়তুল্লাহ্ এবং তাঁর ছেলে দুদু মিঞা করেছিলেন।

ঢাকায় ফিরে এসে শুনলাম যে শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)-র নির্বাচন কেন্দ্রে কোন ভলাণ্টিয়ার বা ছাত্র পাঠাননি—কোন সাইকেল বা মাইক বা কোন পোস্টার বা বিজ্ঞপ্তি দেয়নি—তাই আমাকে চিঠি লিখেছে ঢাকা থেকে তাকে ওসব পাঠাতে। আমি সে চিঠি কলকাতা পাঠিয়ে দি—কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান বুঝিবা তাঁর জেলার সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়াশীল নেতার নেতৃত্ব খতমের ব্যবস্থা নিয়েছেন। শেখ সাহেবকে কলকাতা থেকে যখন এ ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে জানাতে বলা হলো তখন সে জবাব দিয়ে দিল—"মোহন মিঞা জমিদার, জেলা বোর্ড ও স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান তাঁর টাকার অভাব নেই তাঁর জন্য ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু শেখ সাহেবের বদনাম করার জন্যে ঐসব চিঠি"। শেষে যখন নির্বাচনের ফল বেরুল তখন বাংলাদেশে আমরা সর্বমোট ৬টি আসন হারিয়েছিলাম—তার মধ্যে মোহন মিঞার আসন একটি।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলেই আমি ঢাকা জেলার নির্বাচনের কথায় আসব। নির্বাচনের দিনসাতেক আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থী আলী আহ্মদ মোক্তার সাহেবের ছেলে সারওয়ার মোর্শেদ এসে আমাকে বললে যে, তার বাবার পুলিং বুথের জন্য দু'হাজার টাকা 'স্যাংশন' করা ছিল তা এ যাবত আসেনি। এখুনি টাকাটা না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমি জানতাম যে, তার জন্যে টাকা 'স্যাংশন' আছে, কিন্তু টেলিফোন করে অর্থ কমিটির তিনজন সদস্যের মধ্যে কাউকে পেলাম না। সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দীন হুসেন চৌধুরী সাহেব বেরিয়েছেন সকল অফিসের হিসেব পরীক্ষা করতে। তিনি পূর্ববঙ্গে জেলাসমূহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজ্জাক সাহেব উত্তরবঙ্গে ও আহ্মদ ইস্পাহানী সাহেব গেছেন দিল্লী। কি করা যায় প্রার্থীর ছেলেকে বসিয়ে রাখা যায় না—তাই আমার অফিস থেকেই দু'হাজার টাকা দিয়ে দিলাম। পরের দিনই সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দীন হুসেন সাহেব ঢাকা এলেন—তাঁকে আমি কথাটা

বললাম। তিনি বললেন যে, কালই ত আলী আহ্‌মদ সাহেব আমার সঙ্গে কুমিল্লা দেখা করে দু'হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। পরে কলকাতা গিয়ে শুনলাম যে, শহীদ সাহেবও দু'হাজার টাকা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আলী আহ্‌মদ সাহেব কোন সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি নিতে চাননি। সবদিকেই খবর দিয়েছেন—ফলে দু'হাজার টাকার স্থলে ছ'হাজার টাকা পেয়ে গেলেন। এমনি অনেক ঘটনা হয়েছে। আমার মনে হয় চেষ্টা করলেও সাধারণ নির্বাচনে এসব সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

ঢাকা জেলায় দু'টো নির্বাচন কেন্দ্র নিয়েই বিপদ হলো। অন্যগুলো তেমন শক্ত হবে বলে মনে হলো না। আবদুল খালেক সাহেব কোনদিন রাজনীতি করেননি তাই সেখানে কিছু ভাল কর্মী পাঠানো হলো। আমি একবার গিয়ে দেখলাম বিপদ তেমন নেই। বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের আশ্রাফ আলী বেগম—তাঁর সঙ্গে দেশের কারো তেমন সম্বন্ধ নেই। মুসলমানরা তখন কংগ্রেসকে চোখে দেখেছে। আপীলে আবদুস সেলিম উত্তর নারায়ণগঞ্জ থেকে মনোনয়ন পেয়েছে। তাঁর জমিদারী—কাজেই ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ টেলিগ্রাম এল "Please send badges". ভাবলাম নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ব্যাজটার জন্যও নির্বাচন অফিসের উপর নির্ভর করতে হবে এটা কেমন কথা। যাক আমি হাজারখানেক ব্যাজ তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম। পরে তার লোক এসে বলল যে, তাঁর ভলান্টিয়ার নেই, কোন ছাত্র-কর্মী নেই। সে তাই চেয়েছে। আমি টেলিগ্রাম তাঁকে দেখালাম। পরে বুঝলাম, সে বলতে চেয়েছিল "ব্যাচেজ" হয়ে গেছে "ব্যাজেজ" শওকাত মিঞা বললেন শেখ মুজিবুর রহমান যে কারণে মোহন মিঞাকে একঘরে করেছে আমাদেরও সেলিম সম্বন্ধে তাই করা উচিত। আমি তাঁর কথা শুনিনি কারণ সেলিম সাহেব শাহাবুদ্দীন নন আর খাজা নসরুল্লাহ ও নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ নন। নসরুল্লাহ নবাবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করে—সর্দারদের হাতে মার খেয়েছে তাই ঢাকা শহরে তাঁকে আমরা মনোনয়ন দিয়েছি। সেলিম সাহেবের ওখানেও কর্মী পাঠানো হলো। যে দু'টো নির্বাচন কেন্দ্রে আমাদের অবস্থা গুরুত্বর হলো প্রথম দিকটায়—সেগুলো হলো যে, দু'টো আসনে নবাব সাহেব প্রার্থী হয়েছেন। একটা নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ আর একটা ঢাকা উত্তর। আমাদের প্রার্থী যথাক্রমে খান সাহেব ওসমান আলী আর এ. টি. মাজহারুল হক। এদিকে আমার ধারণা ছিল গোড়াতে যে তিনি দাঁড়াবেন ঢাকা শহরে। ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের সর্দারগণ তার লোক তাই বহু পরিশ্রমে প্রতিটি মহল্লায় ঢাকার নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিয়ে ক্লাব গঠন করতে থাকি, তারপর সকল ক্লাবগুলোকে একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় ক্লাব কমিটি। সভাপতি ডাক্তার নূরুর রহমান আর সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বংশালের শামসুল হুদা। এরা বাইশপঞ্চায়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী—এদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে তারা আহ্‌সান মঞ্জিলকে তাদের বাপ-দাদার মত মানতে চাইল না। আমার সে পরিশ্রম ব্যর্থ হলো।

খান সাহেব ওসমান আলী নারায়ণগঞ্জের লোক নন, এমনকি ঢাকা জেলায়ও তাঁর বাড়ি নয়। তাঁর দেশ কুমিল্লা। নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসায়ী তাই চাষাড়ায় বাড়িঘর করেছে। গাঁয়ের লোক তখনো নবাবের বিরুদ্ধে এসব মধ্যবিত্ত লোকের কথা ভাবতে

পারছে না। আবার ঢাকার উত্তরে উত্তরখান, বাড্ডা প্রভৃতি স্থানে ঢাকার নবাবের খুব প্রতাপ। নিজেদের জমিদারী। আর. এ. টি. মাজহারুল হক নবীন উকিল—তার উপর আবার "বার্মা ইভাকুইজ" ব্যাপারে জড়িত। নবাবপুত্র খাজা হাসান আসকারীও এ কেন্দ্রে প্রার্থী। নবাব সাহেব ভেবেছিলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তাঁর অবস্থা ভাল হবে—ঢাকা উত্তরটা তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দেবেন। আমাদের ছেলেরা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের যে নবাব সাহেব "ক্ষেতুয়া" বলে "দেহাতী" বলে ঘৃণা করে এটা গ্রামময় ছড়িয়ে দেয়া হলো ঢাকা শহরের গুণ্ডারা কিভাবে গ্রামের ছেলেদের মেরেছে—মাথা ফাটিয়েছে তার ফিরিস্তি। তবু তিন সপ্তাহ পরেই কেবলমাত্র আমরা দু'টো কেন্দ্রেই শক্তিশালী কয়েকটি ঘাঁটি তৈরি করতে পেরেছিলাম—বিশেষ করে বৈদ্যেরবাজারে এবং রূপগঞ্জে। চতুর্থ সপ্তাহে একদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে দেখি খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেব আমার অফিসে বসে আছেন। আমাকে বললেন, 'আমি আজই এসেছি—নারায়ণগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্র ছিল আমার জেলা বোর্ডের কেন্দ্র। আমার নিজের তৈরি লোকজন রয়েছে। আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আসুন, আমরা একত্রে কাজ করি।' তিনি দু'তিন দিন ঘুরে এসে রিপোর্ট দিলেন, মানচিত্রে আমাদের কোথায় কি অবস্থা দেখান হয়েছে। নীল পেন্সিলে আমাদের ঘাঁটি আর লাল পেন্সিলে আমাদের বিপদ। দেখলাম আমার কর্মীদের খবরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুঝলাম, সত্যি তাঁর বিশ্বস্ত লোক রয়েছে ঐ এলাকায়।

এর কিছুদিন পরে এক সভায় আমরা দু'জনই বক্তা। একটি বৃদ্ধ লোক আমার বক্তৃতার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, "আমরা বিপদে পড়লে কার কাছে যাব ?" আমি উত্তরে বললাম, "প্রথমে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবেন, তারপর গাঁয়ের লোক মিলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কি করা যায় তারই বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করবেন—তাও যদি না হয় ঢাকায় মুসলিম লীগ অফিসে যাবেন—তারা ব্যবস্থা করবে।" সভার পর যখন গাড়িতে ঢাকা আসছিলাম তখন খাজা সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনার জবাবটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আজ যদি ওদের বলেন নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে তবে আপনার নেতৃত্ব বেশিদিন চলবে না। ওরা একজনের উপর নির্ভর করতে চায়—আর সেখানেই আমাদের স্থান।' আমি তর্ক করলাম না—কিন্তু ভাবলাম এ করেই এরা এতকাল নেতৃত্ব বজায় রেখেছে। খাজা নাজিমুদ্দীন ও খাজা হাবিবুল্লাহ্‌র মধ্যে ঝগড়ার তাঁদের কথা হচ্ছে—"আপনারা আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।"

ঢাকার উত্তরে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলাম কাদের সর্দার সাহেবের। কাদের সর্দারের এখনকার ধানমণ্ডী, গুলশান, বাড্ডায়, উত্তরখানে অনেক সম্পত্তি ছিল। তার বিচার সবাই মেনে নিত। তিনি হঠাৎ নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এমনকি আমি নিজে ও খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর বাড়িতে গিয়ে মাজহারুল হককে কিভাবে পাস করানো যায় তার পরামর্শ করতাম। পরে বুঝলাম—নবাব সাহেব তাঁর পুত্রকে ওখানে দাঁড়া করাতে তিনি যে আশা করেছিলেন যে, নবাব যদি দু'জায়গা

থেকেই পাস করেন তবে নবাব সাহেব নারায়ণগঞ্জ আসন রেখে ঢাকা উত্তর তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু এখন বুঝলেন নবাবরা খান্দানের বাইরে যেতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন শেষ হলো। ঢাকার সব ক'টি আসনই মুসলিম লীগ দখল করেছে। চারদিক থেকে কেবল বিজয়ের খবর।

কেবল বরিশালে আমরা তিনটি আসন হারালাম। শেরেবাংলা ও তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ের কেন্দ্র দু'টো। একটায় পাস করেছেন হাতেম আলী জমাদার আর একজন মোহাম্মদ আফজল মোক্তার সাহেব। তাছাড়াও শেরেবাংলা খুলনার একটি আসন দখল করেছেন, ফরিদপুরে একটি আর মুর্শিদাবাদে একটি। ফজলুল হক খুলনার আসন ছেড়ে দিলেন উপ-নির্বাচনে অবশ্যই আমরা জয়ী হলাম। অর্থাৎ ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৪টি তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রমিকদের জন্যে বিশেষ আসনে আমরা পেলাম ফজলুর রহমান সাহেব ও ডাক্তার আবদুল মোত্তালেব মালিককে।

এপ্রিল মাসের দুই তারিখে পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নেতা নির্বাচন করার সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণর তাঁকে মন্ত্রিত্ব গঠন করার জন্য 'কমিশন' দিলেন। ইতিমধ্যে জিন্নাহ্ সাহেব ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে নির্বাচিত সকল সদস্যদের একটি 'কনভেনশন' ডাকলেন।

"কনভেনশনে" লাহোর প্রস্তাবের কোন সংশোধন হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে—বিভিন্ন পুস্তকে (আমার A Socio-Political History of Bengal দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন ছিল—এবং সেটা তখন করাও হয়েছে, আমি তাই এখানে সে আলোচনা নতুন করে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, শুধু এটুকু বলতে চাই যে, জিন্নাহ্ সাহেবের লাহোর প্রস্তাবকে কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে পাকিস্তান নাম দেয়া, মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের সংশোধন এনে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের নেতাদের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশের নেতৃত্বের অধীনে আনা এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে লাগামহীন ক্ষমতা দেয়া এবং "কনভেনশন" করে দু'টো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে একটি দেশে পরিণত করার অপচেষ্টা শুধু ইসমাইলি, মেমন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্যেই তিনি করেছিলেন বলে আমার মনে হয়। প্রথম জীবনে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ও পরে পারিবারিক জীবনে নিষ্ফলতা এবং শেষ জীবনে শারীরিক অসুস্থতা সব মিলে তার দূরদৃষ্টির অভাব ঘটিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে সে ছিল নিঃসঙ্গ। স্ত্রী রতন বাঈর সঙ্গে চার বছরের বেশি বন্ধন থাকেনি। তারপর একমাত্র কন্যা "ডিনাকে" পরিত্যাগ করতে হলো কেবল এই কারণে যে, ডিনা একজন পারসিকে বিয়ে করেছিল। ১৯৩৭-৩৮ সন পর্যন্ত ইন্দিরা যেমন নেহেরুকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন তেমনি করেছেন ডিনা জিন্নাহ্কে। কিন্তু যে কারণে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহুরু ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহে আশীর্বাদ করলেন সে একই কারণে জিন্নাহ্ ডিনাকে ত্যাজ্য কন্যা করলেন এবং মৃত্যুর সময় তার মুখদর্শন করেননি। অথচ ডিনার মা রতন বাঈ পার্সী আর ইন্দিরার মা ব্রাহ্মণ। ১৯৫৩ সনে যখন ডিনার সঙ্গে আমার লণ্ডনে দেখা তখন কথায় কথায় বললেন

যে, পিতার জন্য তার খুব দুঃখ হয়—জীবনে সে যে কত নিঃসঙ্গ। অথচ ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষবারের মত যখন পিতা লণ্ডনে এসেছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ডাকে—তখন পিতার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সে জন্যে ডিনা প্যারিস চলে গিয়েছিল। ডিনা জানত তার পিতার কাছে ডিনার ক্ষমা নেই। যদিও সে একমাত্র মেয়ে তাঁর। "কনভেনশন" থেকে ফেরার পরে আবুল হাসিম সাহেব তাঁর স্বগ্রামে প্রদেশের সকল কর্মীদের এক সভা আহ্বান করেন। তাঁর গ্রাম কাশীয়ারায়। বর্ধমান থেকে আমরা সকালে জীপে করে কাশীয়ারায় গেলাম। প্রথমদিন ছিল পান্তার ব্যবস্থা। আগের দিন থেকেই তাঁর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, শুকনো ডাল, ভাজা মাছ, নানা ধরনের মাংসের রান্না আরো কত কি। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী শামসুদ্দীন সাহেবই কেবল বড়দের মধ্যে এসেছিলেন সে উপলক্ষে। আবুল হাসিম সাহেব রাতের সভায় বললেন যে, কেউ যেন কোন মন্ত্রীকে কোন ব্যক্তিগত অনুরোধ না করে। কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যে যা করা প্রয়োজন তাই যেন করে তারা মুসলিম লীগের মারফত। তিনি আরো বললেন যে, সমাজের জন্য আমাদের ত্যাগী-কর্মী প্রয়োজন আর সংগঠনের জন্যে তো বটেই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সে সভায় এবং আলোচনায় যত কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তার কোনটাই কর্মীরা যারা তখন নেতা হয়েছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সেটা গ্রহণ করেনি। কলকাতা ফিরে এসে আর তারা যার যার জেলায় গেল না। কিছুদিন পরে ঢাকায় খবর এল যে, আমাদের শামসুল হকও "ইসলামিক সিণ্ডিকেট" বলে এক পকেট ফার্ম খুলেছে "পারমিটের" ব্যবসার জন্যে। অন্যদের কথা নাই বললাম—আর দুঃখ এখানে সবাই একই কথা বলছে যে, তারা ওটা করছেন পার্টির অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে। কোথায় গেল আদর্শ, দেশসেবা ও পরোপকার।

বাংলার মুসলমান পরিশ্রম করে ভাগ্য পরিবর্তন করতে শিখল না। ইতিপূর্বে শহীদ সাহেব বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী থাকাকালীন একদল পরিষদ সদস্য "পারমিট", "লাইসেন্স"-এর ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছিল—আমাদের দল সে কথা বলেই মুসলিম লীগ সংগঠন দখল করেছিল—আজ দেখা গেল মানুষ "লোভের দাস"। সুযোগ পেলে প্রলোভনকে চরিতার্থ করার জন্যে সচেষ্ট হন না এমন লোকের অভাব দেখলাম যথেষ্ট। তারপর যা হবার তাই হলো—সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বেসরকারী সরবরাহ মন্ত্রী গোফরান সাহেবের বাসায় ও অফিসে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। আবুল মনসুর আহমদ সাহেব তাঁর এক বইতে লিখেছিলেন যে, "বাঙালীর চরিত্র এমন যে, তারা বেহেস্তে গিয়েও পাচার ব্যবসা না করে পারবেন না"—তাই বাঙালী যেখানে জন্মাচ্ছে সেখানে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে। অবশ্যই তিনি যারা ঐ "পারমিট-লাইসেন্সের" ব্যবসা করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য করেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। বাঙালী একবার ক্ষমতায় এলে টাকা করা ছাড়া আর কোন আদর্শ থাকে না। এর কারণ বোধহয় শহীদ সাহেবের সময়ই মুসলমানদের জন্যে এ সহজ টাকা করার ব্যবস্থা পেয়ে কেউ কষ্ট করে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি হয়ে উঠল না। কোন কাজেই

বোধহয় বাঙালী ধরে রাখতে পারে না—নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে দীর্ঘপথ না বেছে সবচেয়ে সহজ উপায় খুঁজতে থাকে এবং সেটাকে সমর্থনীয় বলে প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট যুক্তির আশ্রয় নিতে পারেন।

পরের মাসে শহীদ সাহেব ঢাকায় এলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই তাঁর প্রথম ঢাকা ভ্রমণ। তাঁর প্রথম কাজ হলো আজীবন সাজা পাওয়া আন্দামানের আসামীদের মুক্তি দেয়া ঢাকা জেল থেকে। সঙ্গে ছিলাম। অনেক নামকরা সন্ত্রাসবাদী বেরিয়ে এল প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। সবার মুখেই হাসি অবশ্যই আমার পরিচিত তার মধ্যে কেউ ছিলেন না।

৬ই জুন মুসলিম লীগ মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করল অর্থাৎ ভারত বিভাগ ছাড়া কিছু মানব না, সেখানে থেকে কনফেডারেশনের প্রস্তাব গ্রহণ করল মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সনের জুন মাসে। কিন্তু কংগ্রেস কনফেডারেশনের বিরোধী—তারা চায় ফেডারেশনের নামে মোটামুটিভাবে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। এর বড় কারণ মাওলানা আজাদের স্থলে নেহেরুর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজির জিন্নাহ্‌কে সন্দেহ। এটা জিন্নাহ্ ও গান্ধী দু'জনার মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এ মনোবৃত্তি আমার ওকালতি জীবনে দেখেছি অনেক জজের মধ্যে, ভাল উকিল দেখলেই সন্দেহ হয় যে, তাঁকে বুঝি ভ্রান্তপথে নিয়ে যাবে—ফলে গোড়াতেই কঠিন মন নিয়ে বসেন—এবং সহজ ব্যাপারটাও গ্রহণ করতে ভয় পান। গান্ধী-জিন্নাহ্‌র মধ্যে ছিল সে ভাব। জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ-দফা সম্বন্ধে গান্ধীর যে মনোভাব ছিল—মিশন প্ল্যান গ্রহণের মধ্যেও সে মনোভাব দেখা দিল। তাকে ঠেকাতে হবে। তাই আসামের প্রধানমন্ত্রী বরদলইকে দিয়ে এক বিবৃতি দেওয়ালেন যে, গ্রুপের মধ্যে যদি কেউ না থাকতে চায় তবে তাকে জোর করে রাখা চলবে না—গান্ধীজি অমনি সে বিবৃতি সমর্থন করে বসলেন। এদিকে পণ্ডিত নেহেরু বোম্বেতে বলে ফেললেন যে, কংগ্রেস গণ-পরিষদে যাবে মুক্ত স্বাধীন সদস্য হিসেবে কোন পরিকল্পনা দ্বারা তারা বাধ্য থাকবে না। ১৫ই ডিসেম্বর বেনারসে আবার বললেন,—

> "Whatever form of constitution we may decide in the Constituent Assembly will become the constitution of free India whether Britain accepts it or not. The British Government are thinking that the Constituent Assembly decisions are not binding on her. But we have not entered the Constituent Assembly in order to place our decisions on a silver plate and dance attendance on the British Government for their acceptance. We have now altogether stopped looking towards London ..... we cannot and will not tolerate any outside interference."

কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্য তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না—এবং তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ডেকে ঐ ঘোষণাকে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত মত বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু

মুসলিম লীগ নেতারা ভয় পেয়ে গেলেন এবং জিন্নাহ্ ২৮শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভা ডাকলেন নেহেরুর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্যে।

এ সময় বার্মা ইভাকুইজ ক্যাম্পের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং পুলিশ উপস্থিত কর্মচারীদের গ্রেফতার করে। খানবাহাদুর ফজলুল করিম সাহেব ও তাঁর প্রায় সব ছেলেরাই কম-বেশি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন বিশেষ করে রেজাই করিম সাহেব। অথচ এর কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদ (Council of State)-এ মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী নূরুল হক চৌধুরী সাহেবকে বসিয়ে দিয়ে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য হন। সদস্য হয়েই তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং তাঁর গ্রেফতারকে রাজনৈতিক কারণ বলে বিবৃতি দেন কোর্টে যখন জামিনের জন্যে আবেদন করেন।

২৮ তারিখে মুসলিম লীগের অধিবেশন আরম্ভ হয়—সারাদিন আলোচনা চলে। এও প্রস্তাব হয় যে, বৃটিশ সরকারের দেয়া খেতাব ও উপাধি সবাই ত্যাগ করবেন। স্যার আজিজুল হক কি করে তাঁর "নাইটহুড্" ছাড়বেন—বিশেষ করে তিনি যখন "এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর" তাই তিনি রাত্তিরে পালিয়ে দিল্লী চলে গেলেন, বোধহয়—ভাইসরয়ের মত জানার জন্যে। পরের দিন এসে তিনি প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে তাঁর "নাইটহুড্" পরিত্যাগ করলেন। প্রথম প্রস্তাব ছিল "মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান" এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল খেতাব বর্জন। এক একজন মাইকের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং খেতাব বর্জন করতে থাকেন দেখা গেল শতকরা পঞ্চাশজন কাউন্সিল সদস্যদের খেতাব ছিল। বাংলাদেশে যেহেতু খেতাবী লোক সংখ্যায় কম তাই আমাদের ভয়ানক সংখ্যালঘু বলে মনে হলো মঞ্চে মাইকের সম্মুখে। বোধহয় তার জন্যে নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ্ মঞ্চে গিয়ে তাঁর "নবাবজাদা" উপাধী বর্জন করলেন বলে ঘোষণা করে নীচে নেবে এসে বসতেই আবুল হাসিম সাহেব বললেন, "হারামজাদা" নসরুল্লাহ্। নসরুল্লাহ্ ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। হাসিম সাহেব বললেন, "চট কেন"। নবাবজাদা তোমার বৃটিশের দেয়া খেতাব নয়, তোমার পিতা মরহুম নবাব সলিমুল্লাহ্র ছেলে বলেই তুমি "নবাবজাদা"—সেই "নবাবজাদা" যদি তুমি অস্বীকার কর—তবে তুমি পিতাকে অস্বীকার করলে ফলে তুমি হলে "হারামজাদা" সবাই হেসে উঠলেন। আনোয়ারা খাতুন ও খয়রাত হুসেন সমুদ্র পারে গিয়ে পানিতে ঢেউ তুলে বললেন যে, "হে ঢেউ ওপারে আরবদেশের উপকূলে গিয়ে আমাদের ছোঁয়াছ সেখানে পৌঁছে দিও।".

৮ই আগস্ট নেহেরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলেন মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে। ১১ই আগস্ট ও ১২ই আগস্ট খাজা নূরুদ্দীন, খাজ নাজিমুদ্দীন ও পাঞ্জাবের রাজা গজনফর আলী বক্তৃতা করলেন যে, তাদের সংগ্রাম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দিল্লী সরকারের বিরুদ্ধে। ১৩ তারিখে আবুল হাসিম পরিষ্কার ভাষায় বিবৃতি দিলেন মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ দিবস" বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা দু'টো সম্প্রদায়কে বিভক্ত রেখে তাদের রাজত্ব আবার কায়েম করতে চায়।

ঢাকা শহরে আমি আর শামসুদ্দীন ঘোড়ার গাড়ি করে ঐ কথাই বললাম এবং কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের সহযোগিতা চাইলাম। কলকাতা ১৬ তারিখে দাঙ্গা বেঁধে

গেল—অথচ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পীঠস্থান ঢাকায় কোন দাঙ্গা সংগঠিত হলো না। কমিউনিস্ট পার্টির জ্ঞান চক্রবর্তী ও কংগ্রেস সম্পাদক বীরেন পোদ্দার আমাকে আগেই বলেছিল যে, গোলমাল করতে পারে শহরের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডরা কারণ ন্যাশনাল গার্ডরা খাজা নূরুদ্দীনের ভাষায় কথা বলছে। আমি হাসিম সাহেবকে টেলিফোনে বললাম, নায়েবে সালারে সুবা জহীরুদ্দীন সাহেবকে ঢাকা পাঠাতে। জহীর সাহেব এলেন এবং আমরা দু'জনে মোটরযোগে মিছিলের অগ্রভাগে থাকলাম। চকবাজার থেকে বেরুবার সময় সৈয়দ আবদুর রহিম পরিচালিত খাকছার বাহিনী তাদের বেলচা নিয়ে সম্মুখের সারিতে দাঁড়াবে এটা মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডরা মেনে নিতে পারল না। যাকগে, কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আমরা তাদের বললাম যে, ন্যাশনাল গার্ড থাকবে আমাদের গাড়ির ডাইনে আর খাকছার থাকবে বাঁয়ে। দুই দলই মেনে নিলো। মিছিল ইসলামপুর ছেড়ে পটুয়াটুলী ঢুকেছে তখন জ্ঞানবাবু আমার গাড়ির কাছে এসে বললেন যে, কলকাতা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। আমি তখনই স্থির করলাম যে, সমস্ত শহর ঘোরা উচিত হবে না। সোজা সিরাজ-উদ-দৌলা পার্কে প্রসেশন নিয়ে গিয়ে ওখানেই সভা শেষ করে সবাইকে বাড়ি যেতে বলব। সভার সভাপতি আমি আর প্রধান বক্তা জহীরউদ্দীন। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরাও বক্তৃতা করলেন। ভালয়-ভালয় দিনটা কেটে গেল। অফিসে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যার পর, এসেই শুনি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে খুব উত্তেজনা চলছে কারণ সৈয়দ সাহেবে আলম গাড়িতে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছেন যে, শহীদ সাহেবের বাড়িতে বোমা মেরেছে—ইস্পাহানী ভয়ানকভাবে আহত হয়েছে। আমি অনেক কষ্টে কলকাতার লাইন পেলাম। শহীদ সাহেব বললেন, 'সব মিছে আমি ভালই আছি। হাসানও আমার ঘরে আছে। টেলিফোনে কথা শেষ করে আমি সলিমুল্লাহ্ হলে গেলাম এবং আমার সঙ্গে শহীদ সাহেবের কথাবার্তার কথা বললাম। কিছু দুষ্টু ছেলে যারা গোলমাল করতে চায়—তারা আমাকে মিথ্যেবাদী বলে উঠল ফলে গোলমালের সৃষ্টি হলো। যাকগে বেশির ভাগ ছেলেরাই আমার কথা বিশ্বাস করল, যার ফলে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলো। আশ্চর্য ১৯২৬ সনে দাঙ্গার ইন্ধন যোগাতে দেখেছিলাম খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল হাফিজকে আর ১৯৪৬ সনে দেখলাম তাঁর আপন ছোট ভাই একই কাজ করছে। এরা কাদের দালালি করছিল আজো বুঝলাম না। ১৭ ও ১৮ই আগস্ট ভালই কাটল তবে শহরে থম থম ভাব। হিন্দুরা মুসলমান অঞ্চল থেকে সরে যাচ্ছে, মুসলমানরাও তাই করছে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে দাঙ্গা বন্ধের জন্যে। ১৮ তারিখে সকাল বেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস ৩ নম্বর জনসন রোড (এখন লিয়াকত এভেনিও) থেকে টেলিফোন পেলাম যে, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা ওখানে বসেছেন এবং হিন্দু মহাসভার পঙ্কজবাবু ও গিরিশবাবুকে ডাকা হয়েছে। আমি যদি যেতে পারি ভাল হয় কারণ কোর্টের কাজ রয়েছে অনেকের পক্ষে তাই ১৫০ নং মোগলটুলী যাওয়া অসুবিধা। আসল কারণ হচ্ছে যে, কলকাতা থেকে এমন ভয়ানক খবর আসছে যে, এখন সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তাই হিন্দু নেতারা চকবাজারের কাছে আসতে চায় না।

আমি ৩ নম্বর জনসন রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সবাই উপস্থিত। বৃদ্ধ শ্রীশ চ্যাটার্জী, বীরেন পোদ্দার, জ্ঞান চক্রবর্তী, পঙ্কজ ঘোষ, গিরিশ দাশ, অনীল রায়, তার স্ত্রী লীলা রায়, জগন্নাথ কলেজের লেকচারার সমর গুহ শেষের তিনজন ফরওয়ার্ড ব্লক। অনীল রায় স্বল্পভাষী অন্যদিকে লীলা রায়ের (বিয়ের পূর্বে ছিলেন লীলা নাগ ঢাকার লোক তাকে সে নামেই বেশি জানত) ছিল বহির্মুখী চিন্তাধারা। আলোচনার শেষে আমার এ ধারণা জন্মাল যে, তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমরা হাজার চেষ্টা করেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে পারব না। লীলা রায় আমাকে বললেন,— "ধরুন, যদি দাঙ্গা লেগেই যায় তবে আমাদের কর্তব্য কি হবে সে সম্বন্ধে আপনি কোন চিন্তা করেছেন কি ?" আমি বললাম, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সবাই মিলে কাজ করলে প্রতিরোধ করা যাবে।' তবে আপনি বললেন, 'আমি চিন্তা করব। প্রথম কথা আমাদের দেখাশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। কেবল টেলিফোন মারফত শান্তি আলোচনা চালানো যাবে না।' লীলা রায় বললেন যে, 'আপনি সরকারি দলের লোক—সুতরাং আপনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে আমাদের মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন।' আমি বললাম, 'আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে দেখব।' আমি খুব নিরাশ হয়ে পার্টি অফিসে ফিরলাম। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম এবং কর্মীদের সাবধান দৃষ্টি রাখতে বলা হলো। ১৯ তারিখে সন্ধ্যাবেলা খবর এল যে, নবাবপুর রেলক্রসিং-এর উপর একজন গ্রামের লোক ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯ তারিখ রাত্রিতে বেশ কিছুসংখ্যক মৃত ও অর্ধমৃত লোক হাসপাতালে আনা হলো। মাঝরাত থেকে শুরু হলো "বন্দোমাতারম" ও "আল্লাহু আকবর" শহরের চারদিকে। দু'দলেরই ধারণা তারা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। ১৯ তারিখ রাত্রে বহু চেষ্টা করেও শহীদ সাহেবকে ফোনে পেলাম না।

বিশ তারিখ জেলা ম্যাজিস্টেট বেল সাহেবের ঘরে অতিরিক্ত জেলা মাজিস্ট্রেট মনজুর মোর্শেদ ও এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার। স্থির হলো যে, একটি শান্তি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। শ্রীশ চ্যাটার্জী সভাপতি, আমি সম্পাদক, বীরেনবাবু যুগ্ম-সম্পাদক আর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কমিটির সদস্য। আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের আলোচনার বৈঠক হলো কাদির সর্দার সাহেবের বাড়িতে। ওখানে কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেব, আতাউর রহমান সাহেব, আসাদুল্লাহ্ সাহেব এবং অন্যান্য সকলে একত্র হয়ে কি করা যায় তার পরিকল্পনা হতো এবং এ ব্যাপারে কাদের সর্দার সাহেব, জুম্মন বেপারী সাহেব, মতি সর্দার সাহেব এঁদের সাহায্য পাওয়া গেছিল যথেষ্ট। জুম্মন বেপারীর গাড়িখানা প্রায় আমাদের কাজেই ব্যবহৃত হতো। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হতে শুরু করল। শান্তি কমিটি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে লাগল। আমাদের জন্যে দু'টো বন্দুকধারী পাঠান পুলিশ দেয়া হলো তা সত্ত্বেও উর্দু রোডে আমরা গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। ভাগ্য ভাল, ঠিক তখনই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের উদ্ধার করল। আর একদিন জগন্নাথ সাহা রোডে আমরা সভা করছি এমন সময় একজন হিন্দু ভদ্রলোক দা' নিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়ল আমাকে খুন করার জন্যে। সমর গুহ তাকে ধরার চেষ্টা করে আহত হলো এবং শেষ পর্যন্ত লীলা রায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে

দা'খানা ধরে ফেলল। পরে বুঝলাম যে, কিছুক্ষণ আগেই সে খবর পেয়েছে যে, তার ছেলেকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে—তাই আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে এসেছে। আমার মনে হয় লীলা রায়ের সাহস এবং সুবুদ্ধির জন্যেই সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

সম্মুখ-লড়াই হতো ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়ে। কলতাবাজার, রায় সাহেবের বাজারের মুসলমান একদিকে অন্যদিকে শাঁখারীপট্টি, তাঁতীবাজার ও বাংলাবাজার এলাকার হিন্দুরা। দক্ষিণ মৈসণ্ডি, পুরানা মোগলটুলী, পটুয়াটুলী ও ইসলামপুরের সঙ্গমস্থলে, আরমানিটোলা ও বেচারাম দেউড়ী, মিটফোর্ড ও চক মোগলটুলী প্রভৃতি কতগুলো স্থানে প্রায়ই মুখোমুখি মারামারি চলত। সর্দার সাহেবের বাড়িতে অনেকদিন আলোচনার পর কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে ব্যবস্থা হলো। একটি, মিটফোর্ডের সকল ডাক্তারই হিন্দু সুতরাং মুসলমান আহতরা রক্তপাতের জন্যেই বেশির ভাগ মারা যাচ্ছে—তাই একজন মুসলমান সিভিল সার্জন চাই। বন্দুকধারী পুলিশ যেহেতু সবাই গাড়োয়ালী বা গুর্খা সুতরাং গরীব মুসলমানদের উপরই অত্যাচারটা বেশি চলছিল। তাই একজন মুসলমান পুলিশ সুপার চাই। "পিউনিটিভ্ ট্যাক্স" মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্সের অনুপাতে হতে হবে নইলে মুসলমানরা বাড়িঘর বিক্রি করেও ঐ ট্যাক্স দিতে পারবে না। সুতরাং ট্যাক্সের দায়ে তাদের জেল খাটতে হবে।

কলকাতা গিয়ে শহীদ সাহেবকে এসব কথা বলা হলো তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমাকে পরের দিন আবার দেখা করতে বললেন। পরের দিন তার দেখা পেলাম না। বাড়িতে খেতেও আসেনি—কেউ বললে লালবাজার, কেউ বললে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। কোন স্থানেই পেলাম না। তৃতীয় দিবসে সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি বললেন যে, "আই. জি. টেলরকে অনেক বোঝাতে হয়েছে—কারণ মুসলমান পুলিশ সুপার হবার মত কোন সিনিয়র অফিসার নেই। জাকির হোসেনের সিনিয়রিটি আছে তবে সে "কন্‌ডেম্‌ড্" হয়ে আছে তাঁর নীচের লোক প্রমোশন পেয়ে গেছে। তাঁকে কলকাতা বন্দরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টেইলর রাজী হয়েছে জাকিরকে ঢাকার পুলিশ সুপার করতে। ঢাকার পুলিশ সুপার ডি. আই. জি. হবে আর ডি. আই. জি. হডসনকে বদলী করে আনা হবে কলকাতায়। ঢাকার সিভিল সার্জনও চিরকালই ঢাকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার হয়ে আসছে এখানেও মুসলমান সিনিয়র ডাক্তার নেই দু'একজন যা আছে তাদেরও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নেই। মোহাম্মদ আলীকে (তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী) বলে দেখ রেফাতুল্লাহকে নিতে পার কি না। আমি মোহাম্মদ আলীকে বলেছি।" মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিশেষ কোন কাজ হলো না—আবার শহীদ সাহেবকে বললাম—তিনি ব্যবস্থা করলেন। "পিউনিটিভ্ ট্যাক্স" ব্যাপারেও তিনি ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন।

এ ক'দিন আমি ছিলাম আবুল হাসিম সাহেবের ওখানে অর্থাৎ ৩৭ নম্বর রিপন স্ট্রীটে, সাপ্তাহিক "মিল্লাত" অফিসে। মন্নুজান হোস্টেল থেকে উদ্ধার করা মুসলমান মেয়েদের এবং তাদের সুপারিনটেনডেন্ট নূরজাহান বেগও ওখানে আছেন। আমাদের

ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ তাঁদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের জীবনযাত্রা স্থির করে ফেলেছেন।

চব্বিশে আগস্ট লর্ড ওয়াভেল কলকাতা এসেছিলেন। তাঁকে আমাদের নেতারা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, এ দাঙ্গার জন্যে তিনিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কংগ্রেসকে একতরফাভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুদের মুসলমান-নিধনে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাকে বলা হলো, ওয়াভেল পূর্ববঙ্গের খবর নেবার জন্যে শীঘ্রই ঢাকা যেতে পারেন। বিশেষ করে ২৯শে আগস্ট নোয়াখালী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পরে তাঁর পক্ষে পূর্ববঙ্গে যাওয়া স্বাভাবিক। কি ধরনের কথা মুসলিম লীগ নেতারা বলেছেন তাও বলে দিলেন আমাদের বক্তব্যও যাতে সেদিকে লক্ষ্য করে উপস্থিত করা হয় তাও বলে দিলেন। কে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, 'সর্বজনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরী এবং আতাউর রহমান খানদের লওয়া উচিত—কারণ তাঁরা দাঙ্গায় খেটেছেন।' শহীদ সাহেব বললেন, 'তোমরা তিনজনই "দেহাতী", শহর থেকে শেফাউল-মূলক, হেকিম হাবিবুর রহমান সাহেবকে এবং সরকারী পক্ষ থেকে আমার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী খাজা নসরুল্লাহ্ থাকবেন। আমি সেভাবেই কমিশনার হল্যাণ্ডকে ইনস্ট্রাকশন দেব।' শহীদ সাহেব আরো বললেন যে, 'কিছুদিন আরো থেকে যাও। জাকিরকে ও রেফাতুল্লাহকে যদি সাথে না নিয়ে যাও তবে আবার ফাইল চাপা পড়বে। আমার সব দিকে তাকাবার সময় নেই।' আমার প্রায় সপ্তাহখানেক সময় নষ্ট হলো দপ্তরের খবর নিতে।

২৯শে আগস্ট নোয়াখালীতে দাঙ্গা আরম্ভ হলো। দাঙ্গায় খুনখারাবীর চেয়ে বেশি চলল মুসলমান মৌলভীদের বেহেস্তে স্থান করার চেষ্টা। হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা—তাদের পরে গো-মাংস খাইয়ে দেয়া। ক্ষমতাশালী কলকাতার হিন্দু মালিকানাধীন সংবাপত্রসমূহ নোয়াখালীকে ভীষণ আকারে ফুটিয়ে তুলল। তিন সপ্তাহ পরে যখন অবস্থা আয়ত্তে এসে গেছে তখন গান্ধীজি নোয়াখালীর পথে কলকাতা এসে পৌছলেন। তিনি কলকাতা এসে পৌছার তিন-চার দিন পূর্বে বিহারে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হলো। গান্ধীজিকে বলা হলো যে, তাঁর পাটনা যাওয়া উচিত। এও বলা হলো যে, তিনি নোয়াখালীতে যাচ্ছেন বিশ্বের দৃষ্টিকে বিহারের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকে ছোট করে দেখাতে। গান্ধীজি অটল। এক কথা তিনি যখন নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তখন বিহারে দাঙ্গা ছিল না—তিনি মাঝপথে তাঁর গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে নতুন জায়গায় যেতে পারেন না। নোয়াখালীতে যেমন তিনি সরকারকে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় দিয়েছেন তেমনি বিহার সরকারকেও দিতে চান।

এদিকে পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সনে শেরেবাংলা জিন্নাহ্‌কে এক চিঠি লেখেন তাঁর অতীতের দোষত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে—এবং অদ্ভুত ব্যাপার জিন্নাহ্‌ও এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমাপ্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে আবার মুসলিম লীগের সদস্য হবার অধিকার দিলেন। অনেকেই মনে করলেন, এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। ফজলুল হক মনে করেছেন এমনি বিপদের দিনে মুসলমানদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত হয়ত জিন্নাহ্‌ও তাই ভেবে এবার আর তাঁর সঙ্গে অপমানসূচক ব্যবহার

করেননি। অন্যদিকে কেউ কেউ ভাবলেন এটা খাজা সাহেবদের চাল। আবুল হাসিমকে শেষ আঘাত হানবার কৌশল মাত্র।

১৫ই অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালের কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন। জিন্নাহ্‌র মনোনীত মন্ত্রীদের নাম হলো নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, রাজা গজনফর আলী, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, আবদুর রব নিশ্‌তার ও বাংলা থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যোগেন মণ্ডলকে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কেন বেছে নিলেন তা কারো মাথায় যায়নি। কেউ বললে,—সংখ্যালুঘদের অভয় দিতে, কেউ বললে,—বিশ্বকে জানাতে যে, মুসলিম লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মনোবৃত্তি নেই।

লর্ড ওয়াভেল ২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা এসে পৌঁছলেন—এবং কমিশনারের নিকট থেকে আমাদের অফিসে চিঠি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দিলেন। অফিস থেকে সেফাউল-মুল্‌ক, হেমিক হাবিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান সাহেব, কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেব ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ্‌কে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হলো। দ্বিতীয় কাজ হলো "মেমোরেণ্ডাম" তৈরি করা। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মনজুর-মোর্শেদের শরণাপন্ন হলাম এবং তিনি খুব সুন্দর একটি খসড়া তৈরি করে দিলেন। আমরা সে মেমোরেণ্ডাম প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবেই সুন্দর কাগজে টাইপ করে তৈরি করে ফেললাম। আমরা কে কি বলব তাও ঠিক হলো মেমোরেন্ডামের পরিপ্রেক্ষিতে।

১৯শে ডিসেম্বর শহীদ সাহেব শেষ পর্যন্ত দৈনিক কাগজ "ইত্তেহাদ" বের করলেন। সম্পাদক হলেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। ম্যানেজার হলেন নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী এবং সুপারিনটেনডেন্ট হলেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা)।

প্রথম দু'জন বাংলার মুসলমানদের নিকট সুপরিচিত ছিলেন রাজনীতিবিদ হিসেবে। আবুল মনুসর সাহেব সাংবাদিক, সাহিত্যিক হিসেবে তো নাম ছিল খুব। সেদিক থেকে মানিক মিঞা তখন পর্যন্ত কি সাংবাদিকতায় কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন অপরিচিত। বি. এ. পাস করার পর পিরোজপুরে মুনসেফ কোর্টে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর ঐ চাকুরীর সময় তিনি শহীদ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। সে পরিচয়ের ফলে মুসলিম লীগ সরকার গঠন হবার পর বাংলাদেশে তথ্যমন্ত্রীর বিভাগীয় দফতরে তাঁর চাকুরী হয়। সে চাকুরীতে তিনি বহাল ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত। তারপর শহীদ সাহেব তাঁকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসের সহকারী দফতর সম্পাদক পদে বহাল করেন। তখন দফতর সম্পাদক ফরমুজুল হক সাহেব। ইহার পর "ইত্তেহাদ" বের হলে তাঁকে অফিস সুপারিনটেডেন্টের পদে বহাল করা হয়। পাকিস্তান হবার বৎসরাধিক কাল পর শহীদ পাকিস্তানে চলে আসেন দৈনিক ইত্তেহাদ-ও বন্ধ হয়ে যায় এবং মানিক মিঞাও ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টি অফিসে অবস্থান করতে থাকেন। আমাদের সেই পার্টি অফিসটি—কলকাতা থেকে আগত ছাত্রকর্মী সবারই প্রথম পান্থশালা হিসেবে পাকিস্তান হবার পরে ব্যবহার করা হয়েছে।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এট্‌লী ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষকে ১৯৪৮ সনের জুন মাসের আগেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।

"As a whole to some form of central Government for British India or in some areas to the existing provincial Governments, or in such other way as may seem most reasonable in the interest of Indian People."

ঐ স্বাধীনতা কার কাছে হস্তান্তর করা হবে তা বলতে গিয়ে এট্‌লী তিনটি সম্ভাব্য সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্ভব না হলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট অথবা যদি অন্য সরকার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তার কাছে। ঐ বিবৃতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল চার মাস পরে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন। স্যার স্ট্যাফর্ড ১৯৪২ সনে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন কিন্তু সেটা স্বাধীন বাংলা গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এট্‌লীর এ বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতেই লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রধান উপদেষ্টা জর্জ এবেলের সাহায্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন যেটাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন "Opperation Ebb Tide." পরিকল্পনার আসল কথা হলো—'যে প্রদেশের পক্ষে সম্ভব হবে সরকারের দায়িত্ব নেয়া তাদের স্বাধীনতা দিয়ে সৈন্যদের সেখান থেকে তুলে নেয়া হবে। এমনি করে সৈন্যদল বিভক্ত না করে শৃঙ্খলার সঙ্গে বৃটিশ-রাজ ভারত ত্যাগ করবে।' লর্ড এট্‌লী অবশ্যই ঐ পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল "এ যেন সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের এবং শেষ পর্যন্ত ঘাঁটি পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা।"

"The plan submitred by Lord Wavell for transferring power looked like a scheme of military retreat and evacuation."

লর্ড ওয়াভেলের ঐ পরিকল্পনার আভাষ পেয়ে যায় প্রথম শরৎ বোস—যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে বাদ দেয়া হয়েছিল ১৯৪৬ সনের অক্টোবর মাসে তবু ভাইসরয়ের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় ছিল। এ খবর ভি. পি. মেনন-এর মারফৎ কংগ্রেসও পেয়েছিল। বলদেও সিং এ খবরটা শিখ সম্প্রদায়-এর নিকট পৌঁছালে সেখানেই প্রথম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মাস্টার তারা সিং শিখদের জন্য পাঞ্জাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠান দাবী জানায় (a homeland for the Sikhs) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যতদিন রণজিৎ সিং জীবিতছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের আধিপত্য ছিল সমস্ত পাঞ্জাবের উপর। বৃটিশ শাসনামলে ধীরে ধীরে সে ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে যেতে থাকে এবং পাঞ্জাবের স্বাধীনতা অর্থে শিখরা মনে করল পাঞ্জাবী মুসলমানদের শাসন কায়েম। এটা তাদের নিকট একেবারেই গ্রহণীয় ছিল না, তাই ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসের দুই তারিখে শিখরা পাঞ্জাবকে ভাগ করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে।

এদিকে ১৯৪৭ সনের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি পদের জন্যে প্রার্থী হন—যদিও তখনো মাওলানা আক্রাম খাঁর পদত্যাগপত্র সরকারিভাবে মুসলিম লীগের সম্পাদকের নিকট এসে পৌঁছায়নি। এর পরেই মাওলানা সাহেবের পদত্যাগপত্র আবুল হাসিম সাহেবের নিকট

পৌঁছায় এবং আবুল হাসিম সাহেবও ঐ পদের জন্যে প্রার্থী হন। আবুল হাসিম সাহেব সভাপতির ইস্তফাপত্র বিবেচনা ও পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে সভাপতি নির্বাচনের জন্যে ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেন। ফজলুল হক সাহেব ছাত্রদের সমর্থন আদায় করার জন্যে কলকাতায় একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও মুসলমান ছাত্রদের জন্যে আরো ছাত্রাবাস তৈরি করার পরিকল্পনা ছাত্রদের সম্মুখে পেশ করলেন। তার জন্যে ইসলামিয়া কলেজের তৎকালীন উত্তরপ্রদেশবাসী অধ্যক্ষ জুবেরী সাহেব ফজলুল হক সাহেবের পক্ষে নির্বাচনী অভিযান চালাতে থাকেন। অপরপক্ষে আবুল হাসিম সাহেবের পক্ষে যারা ছাত্রনেতা ছিলেন তাদের ত বেশির ভাগ জুবেরী সাহেবের ছাত্র। ঢাকার কাউন্সিলরদের নিয়ে আমরা যখন কলকাতা পৌঁছলাম—তখনই আমার মনে হলো যে, যুব জনমত আমাদের বিপক্ষে। আমি আর শামসুল হক শহীদ সাহেবের বাসায় গেলাম রাত্রে, গিয়ে দেখি তাঁর ওখানে ফজলুর রহমান সাহেব রয়েছেন। আমরা শহীদ সাহেবকে বললাম যে, পরিস্থিতি এমন ঘোড়ালো হয়ে গেছে অথচ কলকাতার কাউন্সিলররা আমাদের বললেন যে, আপনি এ ব্যাপারে কোন পক্ষই সমর্থন করতে চান না—সুতরাং কলকাতা কাউন্সিলররা নিরপেক্ষ থাকবে। তিনি উত্তর দেবার পূর্বেই ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন,—

> "Prime Misister has taken a very laudable attitude and he should not mix himself up with this politics of the mother-organization. Any one who would be elected would be welcomed by him and members of his cabinet".

আমি একটু অবাক হলাম। বললাম যে, যদি ফজলুল হক আজ মুসলিম লীগের সভাপতি হন তবে আগামীকাল তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। শহীদ সাহেব কোন কথার মধ্যেই এলেন না। সুতরাং আমাদের আর কিছু করার থাকল না। ৯ তারিখে ছাত্ররা ভীষণ বিক্ষোভপ্রদর্শন করতে লাগল মুসলিম ইন্‌স্টিটিউটের সম্মুখে। রাস্তায় আবুল হাসিম সাহেবের উপর হামলার চেষ্টাও করল। মনে হলো যেন লোহার রেলিং এবং গেট ভেঙ্গে বিক্ষোভকারীরা হলে ঢুকে পড়বে। ঠিক এ সময় কোথা থেকে এসে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব একাই বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আমি অবাক হলাম তাঁর সাহস দেখে। অন্যান্য ছাত্রনেতারা দোতালার সিঁড়ি ঘরে বসে বিক্ষোভ দেখছে। আমার ভয় হলো যে, বিক্ষোভকারীরা শেষ পর্যন্ত গেট ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে এবং সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে মুজিবুর রহমানের উপর। যাক ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডস সালারে-সুবা আই. আই. মোহাজের ও নায়েবে সালারে-সুবা জহিরুদ্দীন সাহেব তাঁদের গার্ডদের নিয়ে ঢুকে পড়ে পজিসন নিয়ে নিল। ভেতরেও গোলমালের আশঙ্কা দেখা দিত যদি এরই মধ্যে খবর পাওয়া না যেত যে, মাওলানা আক্রাম খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। বোঝা গেল সবটাই ছিল অভিনয়। প্রতিক্রিয়াশীল দলের ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে খাজা শাহাবুদ্দীনের একটি চাল। এক গুলীতে দু'টো বাঘ শিকার। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ও আবুল হাসিম সাহেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভক্ত হলো বামপন্থী যুব-সম্প্রদায়। ফজলুল হক সাহেব

আবার বছর সাতেকের জন্যে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হলেন আর আবুল হাসিম সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যেহেতু তিনি মনে করলেন যে—শহীদ সাহেব প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রের কথা জ্ঞাত ছিলেন—এবং এ ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাই তিনি স্থির করলেন যে, তিনি আর মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। আমরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, রাজনীতিতে অভিমানের স্থান নেই—অভিমান করে দূরে সরে গেলে সবাই কালক্রমে তাঁকে ভুলে যাবে, এমনকি তাঁর বিগত তিন বছরের মুসলিম রাজনীতিতে যে দান তাও লোকে মনে রাখবে না। আমরা আরো বললাম যে, তাঁর ঐ অভিমানের ফলে যে কেবল তাঁরই ক্ষতি হবে তা নয়—শহীদ সাহেব হবেন খাজা পরিবারের পরবর্তী শিকার। আমরাও কতটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব তাও বলা যায় না। কিন্তু তিনি আমাদের কোন যুক্তিই মানলেন না এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারি আক্রাম খাঁর নিকট একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে বর্ধমান চলে গেলেন। আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম নিরাশ হয়ে।

২রা মার্চ শিখ-সম্প্রদায় তাদের একটি নিজস্ব আবাসভূমি দাবী করলেন।

একদিকে আসামে মাওলানা ভাসানী "লাইনপ্রথার" বিরুদ্ধে আসামে আন্দোলন আরম্ভ করে বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ৩রা মার্চ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্দেশে "আসাম দিবস" পালন করা হয়। ঢাকায় তখন ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে—তবু আমরা স্থির করলাম যে, আমরা ঐদিন সিরাজ-উদ্-দৌলাহ্ পার্কে এক সভা করে আসাম দিবস পালন করব। আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হলো। প্রস্তাব গৃহীত হলো আমি। অফিসে ফিরে এসেই শুনলাম যে, জেলা সরকার ১৪৪ ধারা ভাংবার অভিযোগে পরদিন আমাকে গ্রেফতার করবে। উপরে শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আমাকে তারই সরকার গ্রেফতার করবে যেহেতু আমি যে পার্টির হাতে শাসনভার তাঁরই নির্দেশ মানতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভাংবার অভিযোগে অভিযুক্ত। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তাই নিজের দায়িত্বে কিছু না করে ব্যাপারটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন। বেল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গ্রেফতার হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই গেলাম। আমাকে বসতে বলে স্বরাষ্ট্র সচিব মার্কিন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে 'ট্রাঙ্ককল' "বুক" করলেন কলকাতায়। মার্টিন সাহেব ধরল বেল সাহেব আমার সম্মুখেই সব খুলে বললেন, মার্টিন সাহেব সিদ্ধান্ত ঘণ্টাখানেক পরে জানাবেন বলে টেলিফোন কেটে দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে সিদ্ধান্ত এলো যে, মার্চ মাসের প্রথম তারিখ থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা বলবৎ নেই।

৮ই এপ্রিল তারিখে রংপুরের সালারে জেলা খয়রাত হুসেন প্রায় ৪০ জন ন্যাশনাল গার্ডসহ আসাম সরকারের পুলিশের হাতে বন্দী হলেন।

১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের এক প্রস্তাবে হিন্দুরা যারা স্বাধীন বাংলায় থাকতে চায় না এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদের ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের সে সুবিধা দিতে হবে। প্রস্তাবটি ছিল,—

"If His Majesty's Government contemplate handing over its power to the existing Government of Bengal which is determined

on the formation of Bengal into a separate soveregn state such portions of Bengal as desirous of remaining within the Union of India should be allowed to remain so and be formed into a separate province within the Union of India."

কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করার পরই ১৭ই এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার এক সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলাদেশ বিভক্ত করার জন্যে অভিযান আরম্ভ করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে। শরৎ বসু এবং কিরণ শঙ্কর রায় বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার বিরোধিতা করতে থাকেন। কিন্তু উত্তর ভারতের দাঙ্গা ভীষণ রূপ ধারণ করে। গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৪ই এপ্রিল তারিখে গান্ধী ও জিন্নাহ্‌র সহিযুক্ত শান্তির জন্য লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্র ছেপে বিমান থেকে ফেলতে লাগলেন। ২৩শে এপ্রিল জিন্নাহ্ ও মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলো। মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করলেন যে, বাংলা যদিও ভাগ বন্ধ হতে পারে, কিন্তু পাঞ্জাবে শিখ ও মুসলমানরা আলোচনা করতেও রাজী নয়। বাংলায় এটা সম্ভব হতে পারে একটি শর্তে যে বাংলা পাকিস্তান বা ভারতে যোগ দেবে না। সে কথার উত্তরে জিন্নাহ্ মাউন্ট ব্যাটেনকে বলেছিলেন যে, তিনি স্বাধীন অবিভক্ত বাংলাকে স্বাগতম জানাবেন কারণ কলকাতা না পেলে বাংলাদেশের বাকি অংশ নিয়ে কি লাভ হবে। তাঁর ভাষায়,—

"I should be delighted, what is the use of Bengal without Calcutta. They had much better remain united and independent. I am sure they would be on friendly terms with Pakistan."

২৭শে এপ্রিল শরৎ বসু ও কিরণ শঙ্করের সঙ্গে আলফাজ সাহেবের আলোচনা হয় এবং সে সভায় স্থির হয় যে, আবুল হাসিম সাহেবের জন্যে বর্ধমানে শরৎবাবু লোক পাঠালে হয়ত তিনি আসবেন এবং তাঁর কর্মীদের আবার একত্র করে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। শরৎবাবু সেদিনই বর্ধমানে লোক পাঠালেন আবুল হাসিম সাহেবকে আনার জন্যে। শহীদ সাহেবও সেদিন স্বাধীন বাংলার পক্ষে এক বিবৃতি প্রদান করেন। আবুল হাসিম সাহেব ২৮শে এপ্রিল কলকাতা এসে এক বিবৃতি দেন এবং আমরা তার পাই তাঁর কাছ থেকে এবং টাকা পাই কলকাতা যাবার জন্যে। আমি, শামসুল হক ও শামসুদ্দীন সেদিনই কলকাতা রওনা হয়ে যাই। আবুল হাসিম সাহেবের বিবৃতি ২৯ তারিখে অমৃতবাজার ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত হয়।

শরৎ বোস ও আবুল হাসিমের মধ্যে স্বাধীন বাংলার একটা নীল নক্‌সা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আবুল হাসিম সাহেব একা চলতে পারতেন না তাঁকে ধরে নেবার জন্যে শামসুদ্দীনকে নিয়ে শরৎবাবুর উড্‌বার্ণ পার্কের বাড়ি যান। আবুল হাসিম সাহেব শামসুদ্দীনকে খুব বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর জানা ছিল না যে, শামসুদ্দীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এ আলোচনার একদিন পরে কমিউনিস্টদের মুখপত্র "স্বাধীনতায়" স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার নীল নক্‌সা সম্বন্ধে

আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম লীগের কর্ণধারদের মধ্যে এক আশঙ্কা জেগে উঠে। তারা ধরে নেয় যে, বাংলা অবিভক্ত থাকলে আবার আবুল হাসিম ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজত্ব কায়েম হবে। এদিকে শরৎবাবুর ইচ্ছা শহীদ সাহেবকে একটু পেছনে রেখে আবুল হাসিম সাহেবকে সম্মুখে রাখা—কারণ শহীদ সাহেবের প্রতি হিন্দুদের চরম বিরূপ মনোভাব ছিল।

১২ই তারিখে শহীদ সাহেব গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৪ই মে জিন্নাহ্‌ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার সকল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও ইহার সংবাদপত্র সবাই স্বাধীন বাংলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন শহীদ সাহেবকে শেষ কথা বলে দিলেন যে, বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে তবে স্বাধীন বাংলার জন্যে একটি ভিন্ন গণ-পরিষদ গঠন করা হবে।

১৭ই মে তারিখে ভাইসরয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখদের নেতাদের সঙ্গে এক আলোচনায় বসেন—এবং ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করেন। মাউন্টব্যাটে বলেন যে, যদিও প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ১৯৪৮ সনের জুনের পূর্বে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু ১৯৪৭ সনেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার সে পক্ষপাতি কারণ গৃহযুদ্ধ অফিসে-আদালতে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে, সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হবে না আরো দেরী হলে। ১৮ই মে তারিখে শহীদ সাহেব ও কিরণ শঙ্কর রায় আবার ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভি. পি. মেনন কিরণবাবুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে এবং মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন যাচ্ছেন পরের দিন সে পরিকল্পনা নিয়ে এর পরেই দেখা গেল কিরণবাবুর বাসস্থানের সম্মুখে মেয়েদের এক বিক্ষোভ আর সে বিক্ষোভকারীদের নিকট তিনি কথা দেন যে, তিনি আর অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার জন্যে কোন কাজ করবেন না।

আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হলো যে, কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিম্পোজিয়াম-এর আয়োজন করবেন—সেখানে আবুল হাসিম নিজে বক্তৃতা করবেন। শামসুদ্দীন সেটার ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে মফঃস্বলেও একটি সভার আয়োজন করবে শামসুল হক আমি সে সভায় সভাপতিত্ব করব। শামসুল হক নেত্রকোণায় সভার আয়োজন করলেন। শামসুল হক ঐ সভা উদ্বোধন করবে, আমি সভাপতিত্ব করব আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে লুলু বিলকিস বানু প্রধান অতিথি হবে।

কলকাতার সিম্পোজিয়ামে আবুল হাসিম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, মোগল সম্রাটগণ যখন ভারতীয় উপমহাদেশে বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রসমূহ একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনার জন্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল তখন মোগলদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছিল—যারা ভারতের অখণ্ডতা মেনে নেয়নি যেমন প্রতাপ

সিংহ, শিবাজী, চাঁদসুলতানা, রাণী অহল্যাবাই, ঈশাখান বা কেদার রায়, তাঁরাই ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আর যারা মোগল বাদশাহদের সাহায্য করেছেন তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে তাদের দেশের শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছিল। তেমনি বৃটিশ-রাজ যখন ভারতে রাজ্য বিস্তার করছিল তখন যারা বাধা দিয়েছিলেন যেমন হায়দার আলী, টিপু সুলতান, নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহ্, রণজিৎ সিং তাঁরাই ইতিহাসে বরেণ্য হয়ে আছেন। সেদিন অখণ্ড ভারতের পক্ষে যারা ছিলেন আমরা তাদের বিরোধী ছিলাম—আর আজ আমরা সে সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করছি। যে সমর্থনের ফলে আজ পর্যন্ত যারা দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত তাদেরই আমরা দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করব। "অখণ্ড ভারত" সাম্রাজ্যবাদী মোগল সম্রাট আকবর এবং আওরঙ্গজেব—ও পরবর্তীকালে বৃটিশ-রাজের সৃষ্টি।

নেত্রকোণায় আমরা তিনজনই একই সুরে বক্তৃতা করি। লুলু বিলকিস বানু বক্তৃতা করতে উঠলে কয়েকজন মৌলভী সাহেব আপত্তি করেন। ফলে স্থির হয় যে, "ডেইস" থেকে বক্তৃতা না করে স্কুলঘরের ভেতরে মাইক নিয়ে বক্তৃতা করবেন। তাঁর মা সারাতাইফুর তাঁর পাশেই বসেছিলেন। আমি এর পূর্বে লুলু বিলকিস বানুর বক্তৃতা শুনিনি, বক্তৃতায় ফারসি বয়েৎ ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন। একবারও তাঁর স্বর কাঁপেনি। আমি আশ্চর্য হলাম মুসলমানদের মধ্যেও সেযুগে এমনি মেয়ের আবির্ভাবে। সেই থেকে আমি তাঁকে প্রশংসার চোখে দেখে এসেছি। দুঃখের বিষয়, কলকাতা পরের দিন গিয়ে দেখলাম—দৈনিক 'ইত্তেহাদে' আমার বক্তৃতা দু'টো কলাম আর—তাঁর বক্তৃতা যেটা আমার বক্তৃতার চেয়ে ভাল হয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখই করা হয়নি। সাংবাদিকরা মনে হয় মানুষের মুখ দেখে বক্তৃতা ছাপে অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যার নেতৃত্ব আছে তার বক্তৃতা যেসব ভাল কথা বলেনি তাও তার মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে। আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রায়ই বলতেন যে, জিন্নাহ্ সাহেব যত বাজে কথা ভুল ভাষায় বলবেন আর আমার কাজ হচ্ছে তাই শুদ্ধ করে দেয়া এবং তাঁকে মহান নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা। এসব কথা বলার জন্যে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন—কিন্তু তবু তাঁর মুখ বন্ধ হয়নি। কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচনের পর আলিগড়ের ছাত্ররা স্থির করল যে, নতুন মুসলিম লীগ নির্বাচিত সদস্যরা সবাই জিন্নাহ্ টুপি ও ছোট একটি মুসলিম লীগের নিশান নিয়ে পরিষদে একত্রে প্রবেশ করবেন, কিন্তু আবদুর রহমান সিদ্দিকীকে যখন তাঁর ফেজ রেখে জিন্নাহ্ টুপি পরতে বলা হলো তখন তিনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, আমার ফেজ জিন্নাহ্র সোলার হ্যাট থেকেও পুরাতন—তাঁর টুপি তো সে হ্যাটেরই বাচ্চা। তিনি মুসলিম লীগের সব কাউন্সিল সভায় প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব উপস্থাপন করতেন—সাধারণতঃ প্রস্তাবটি একটু দীর্ঘ করে লেখা হত, ফলে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠতেন আর গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেত, তিনি বিরক্তির সুরে বলতেন,—"ভাই সব এটা আপনাদের "আল্লাহু আকবরী" প্রস্তাব নয়।" এটা ছিল জিন্নাহ্র প্রতি কটাক্ষ। কারণ জিন্নাহ্ যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতেন সেটাই সবাই "আল্লাহ্ আকবর" বলে পাস করে দিতেন। আলোচনা হতো না তার উপর।

মে মাসের ১৯ তারিখে মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন চলে গেলেন ভারত বিভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ১৭ই মে তারিখে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ভারতের দুই প্রান্তে দুটো দেশ কি করে তিনি এক রাষ্ট্র করবেন ? জিন্নাহ্‌র মনে হলো এটা মাউন্টব্যাটেন যেমন অসম্ভব মনে করছে তেমনি হয়ত বৃটিশ সরকারও মনে করবেন। তাই ২১শে মে যেদিন মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন পৌঁছাল সেদিনই জিন্নাহ্ ভারতের মধ্যদিয়ে একটা "করিডোরের" দাবী উপস্থিত করলেন।

এরপর থেকেই বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্র স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন এবং আবুল হাসিমের মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার যে কোন অধিকার নেই তাই সবাই বলতে আরম্ভ করলেন। চুনুপুটিরাও বিবৃতি দিতে আরম্ভ করলেন। হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেব যিনি হাসেম সাহেবের স্থলে সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ডাকলেন ৩১শে মে তারিখে অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেনের ফিরে আসার দিন পর্যন্ত। সে সভায় "স্বাধীন বাংলার" মৃত্যুর বিজ্ঞাপন মুসলিম লীগ রচনা করল। জুন মাসেও শরৎ বসু, আবদুল হাসিম সাহেব ও শহীদ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা অব্যাহত রেখে ছিলেন কিছুদিন—কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রচেষ্টা বন্ধ করল।

জুন মাসের ২ তারিখে মাউন্টব্যাটেন সকল দলের নেতাদের সঙ্গেই আলাপ করলেন এবং বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা তাঁদের গ্রহণ করতে বললেন। নেহেরু, জিন্নাহ্ ও সর্দার বলদেও সিং মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেডিও থেকে বক্তৃতা করেন। স্থির হলো যে, ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হবে।

স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের হাতে সময় ছিল না। মাউন্টব্যাটেন অত্যন্ত দ্রুতভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন। শহীদ সাহেবের উপর হিন্দুদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ঘৃণা, আবুল হাসিম সাহেবের অভিমান করে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ—যার ফলে তাঁর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো আর বাহার সাহেব তাঁর কথায় গুরুত্ব না দিতে দেশবাসীর নিকট আবেদন করতে পারলেন। তাছাড়া আবুল হাসিম সাহেবের স্বাধীন বাংলার নীল নক্‌সাটি তাঁর বিরুদ্ধে খাজা সাহেবদের জনমত সৃষ্টি করতে সাহায্য করল। কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি বহু কারণে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন মুছে গেল।

৫ই জুন তারিখে মুসলিম লীগ কাউন্সিল মাউন্টব্যাটেনের দান দু'হাত পেতে গ্রহণ করল। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ দু'টো প্রতিষ্ঠানই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল—তাদের উপকারের জন্যই বাংলাকে বিভাগ করার প্রয়োজন হয়েছিল—পশ্চিমবাংলার প্রয়োজন ছিল বিড়লা ডালমিয়াদের। আর পূর্ব বাংলার বাজার আদমজী, ইস্পাহানীদের জন্যে দরকার ছিল।

জুন মাসের মুসলিম লীগ অধিবেশনে জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আবুল হাসিম সাহেব হসরাত মোহানী বক্তৃতা করতে চাইলে জিন্নাহ্ সাহেব তাঁদের বক্তৃতা করতে

দিতে অস্বীকার করলেন। ভোটে দিলেন তিনি তাঁর প্রস্তাব—পক্ষে সব আল্লাহু আকবর—বিপক্ষে আবুল হাসিমের সঙ্গে মিঞা ইফ্‌তেখারউদ্দীন ও হসরাত মোহানীকে বাদ দিলে ৯টি ভোট বাংলা থেকে। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।

জুন মাসের প্রথম দিকে গান্ধীজি শরৎ বাবুকে বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা করতে নিষেধ করলেন। জুলাই মাসে আবুল হাসিম সাহেবও পূর্ববাংলার কর্মীদের নিকট বিদায় নেবার জন্যে কলকাতা ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে, বাংলায় কে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হবেন সেটাও পাকিস্তান হবার আগেই ঠিক হয়ে যাবে। শহীদ সাহেব আমাদের বললেন যে,—তিনি ঐ গুজবে বিশ্বাস করেন না। তবু আমরা হাসিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম,—'লিডার' নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয় তবে আমাদের করণীয় কি ?' তিনি বললেন, 'আমাদের কিছু করার নেই। আমার নির্বাচনে শহীদ সাহেব যেমন নিরপেক্ষ ছিলেন তাঁর নির্বাচনেও আমরা নিরপেক্ষতা বজায় রাখব।' আমার মনে হয় আবুল হাসিম সাহেবের ঐ সিদ্ধান্ত শেখ মুজিবুর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) মেনে নেননি—আর সেদিন থেকেই তাঁদের সঙ্গে আবুল হাসিম সাহেবের সকল সম্পর্কই কেবল ছিন্ন হয়নি—শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় পৌঁছেছিল।

৫ই আগস্ট নেতা নির্বাচন-পর্ব শেষ হলো। সিলেটে ১৭ জন পরিষদ সদস্যই খাজা নাজিমুদ্দীনের দলে গেল—এমনকি ভূতপূর্ব প্রজানেতা শামসুদ্দীন সাহেবও খাজাদের সঙ্গে ভিড়লেন। নাজিমুদ্দীন সিলেট থেকে তিনজন ও শামসুদ্দীনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শহীদ সাহেব অনেক ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেন।

অথচ এর কিছুদিন পূর্বে ফজলুর রহমান সাহেব ঢাকায় এলে কফিলুদ্দীন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে এক ঘরোয়া চায়ের পার্টিতে আমাদের বললেন যে, খাজা নাজিমুদ্দীন ও শহীদ সাহেব দু'জনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিবেন। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রার্থী হবেন তিনি নিজে। নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী।

১৩ই আগস্ট পশ্চিমবাংলার চার্জ প্রফুল্ল ঘোষকে ও পূর্ববাংলার চার্জ খাজা নাজিমুদ্দীনকে বুঝিয়ে দিয়ে শহীদ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আর তিনি হিন্দুস্তানেই থেকে যাবেন। সেজন্যে তিনি পশ্চিমবাংলার মুসলিম লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে—পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে বিরোধীদলের জন্যে আসনে বসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তিনি তখনো পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য থাকলেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# পাকিস্তান ও বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ

পাকিস্তান জন্ম হলো রক্তস্নান করে। গান্ধীজি বলেছিলেন,—

> "I have not asked the British to handover India to the Congress or to the Hindus, let them entrust India to God in modern parlance to anarchy. Then all parties will fight one another like dogs, or will, when real responsibility faces them, come to a reasonable agreement."

বৃটিশ সরকার গান্ধীজির কথাই যতদূর সম্ভব রেখেছে—ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষ করে আর্যাবর্তে যে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, ব্যভিচার, ধর্ষণ হয়েছে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। মৃত্যুর সংখ্যা কেউ নির্ণয় করেনি—ধ্বংসযজ্ঞের, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কেউ সঠিকভাবে হিসেব করেনি। পুরো একটা বছর এই উপমহাদেশের মানুষগুলো সব পশু হয়ে গিয়েছিল। যারা অন্তরে মানুষ ছিল—তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, হাতে গোণা যেত। প্রায় এক কোটি লোক বাস্তুহারা হয়েছিল তারা সবাই আজো পুনর্বাসিত হয়েছে কি না জানি না।

ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় ও পাকিস্তানে মুসলমান সম্প্রদায় 'জিন্দাবাদ' করছে। একদিকে "জয় হিন্দ" আর এক দিকে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"—কিন্তু কাদের এ "ভিক্টরী", "কিসের ভিক্টরী"। যদি মানুষের জয় হতো তবে তাকে সবাই মিলে স্বাগতম জানাত। কিন্তু সীমানার দু'পারে সংখ্যালঘুদের পক্ষে কি স্বাধীনতা এসেছিল ?—এসেছিল জীবনের নিরাপত্তা ?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বললেন,—

> "Long years ago we made tryst with destiny, and now the same comes when we shall redeem our pledge. The service of India means the service of the millions who suffer. It means ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye."

এ বোধহয় জিন্নাহ্‌রও মনে ছিল যদিও কোনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মহাবিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে না পৌঁছতে পারায় কাব্য করে বলতে পারেননি। কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে নেহেরুর সে স্বপ্ন, সে সাধ কি ভারতে পূরণ হয়েছে ? আর পাকিস্তানের স্রষ্টা বলেছিলেন,—

"The first observation that I would like to make is this, you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain in law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the State."

১৯৭১ সনে তাঁর সে স্বপ্নের প্রতিফলন আমরা দেখেছি—যার বলে পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'খণ্ড হয়ে গেল।

"ক্ষমতা বস্তুটাই এক অদ্ভুত নেশা। লাগাম বা শাসন না থাকলে এ নেশা ভয়াবহ হয়ে উঠে। তখন কোন যুক্তির ধার ধারে না তারা, তোয়াক্কা করে না ইতিহাসের পাতার লেখা। ক্ষমতার মনোভাব হলো—আমি যা ভাল মনে করি তাই একমাত্র ভালো, অদ্বিতীয় ভালো জনসাধারণ তা মেনে নিতে বাধ্য।" বলেছেন আমাদের দেশের এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। মোটে ২৫ বছর আগে যে রক্তস্নান আমরা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করেছি তা ভুলে গেলাম। পাকিস্তান বাংলায় ইতিহাসের আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজন করার পর স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল পাকিস্তানের রক্তপিপাসা কমেছে—কিন্তু যেসব খবরের ছিঁটেফোঁটা বাংলায় এসে পৌঁছেছে তাতে মনে হয় পাকিস্তানের রক্তের তৃষ্ণা এখনো মেটেনি।

১৩ই আগস্ট ১৯৪৭ সনে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে স্বাগতম জানাবার জন্যে ঢাকার নবাববাহাদুরকে সভাপতি করে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। স্যার সুলিমুল্লাহ্ ১৯০৫ সনে ঢাকাকে পূর্ববঙ্গের রাজধানী করার জন্যে সবকিছুই করেছিলেন। বৃটিশকে খুশী করার জন্যে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুদের আন্দোলনের ফলে তাঁর স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি—আর ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট তাঁরই বোনের ছেলে খাজা নাজিমুদ্দীন মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুর সাহায্যে ঢাকাকে পূর্ববঙ্গের রাজধানী করার জন্যে আগমন করছেন—সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, স্যার সলিমুল্লাহ্‌র পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহ্ তাঁকে ফুলচন্দন দিয়ে বরণ করবেন। কিন্তু আমরা অবাক হয়েছিলাম দু'টো নাম সে অভ্যর্থনা কমিটিতে দেখে। সে দু'জন হলেন সর্বজনাব কফিলুদ্দীন চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান। অবশ্যই ঢাকা রেলস্টেশনের দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করার পরে আর কোন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক পড়েনি, এমনকি সে রাতে আহ্‌সান মঞ্জিলের নৈশ-ভোজেও নয়।

নবাব আবদুল গণির পিতা—খাজা আলিমুল্লাহ্ এসেছিলেন ঢাকায় আসামে কার্পেট ব্যবসায় সুবিধা না করতে পেরে চামড়ার ব্যবসা করার জন্যে। তাঁর পুত্র নবাব আবদুল গণি পূর্বপুরুষের ব্যবসায়ী প্রতিভা না থাকার জন্যেই হোক বা জমিদারীর মালিক হাওয়া (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশে) বেশি লাভজনক বলে মনে হওয়ার জন্যেই হোক—নিলামে তিনি জমিদারী খরিদ করতে থাকেন। এবং ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটিয়ে ধীরে ধীরে বাংলার বড় জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হন। তারপর ভাগ্যগুণে ঢাকায় লালবাগে এবং নদীর অপর পারে জিঞ্জিরায় "কালো-গোড়ার লড়াই" শুরু হয়—সর্বভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। বুদ্ধিমান নবাব সাহেব, পাশা খেলার মতই ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকলেও, এক বড় ঝুঁকি নিলেন। কালো সৈন্যদের অস্ত্র জমা দেয়ালেন—তাদের

ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলালেন। সিপাহী বিদ্রোহ বৎসারাধিককালের মধ্যেই দমন হলো—আর যারা গোড়াদের সাহায্য করেছিল বিপদের দিনে তারা মহামান্যা ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নাইট, নবাব, রাজা, রাজাধি-রাজ খেতাবে ভূষিত হলেন। খাজা আবদুল গণি নাইট ও নবাব দু'টোই হলেন। সুতরাং তাঁর একটা প্রাসাদ তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল—সে প্রাসাদই তাঁর পুত্রের নামানুসারে "আহ্সান মঞ্জিল" নামে খ্যাতিলাভ করল—যে আহ্সান মঞ্জিলে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের ভাইসরয় লর্ড কার্জন রাত কাটিয়েছেন। বৃটিশের দেয়া চৌদ্দ লক্ষ টাকার জৌলুসও লর্ড কার্জন দেখেছেন আর দেখেছে ঢাকার রইছ, কুট্টী, শাঁখারী, তাঁতী আর বসাকরা।

আহ্সান মঞ্জিলের ছেলেরা ঢাকার আদিবাসীদের মতই পড়াশুনার ধার-ধারতেন না। ঐ পরিবারে শহর বানুর বড় ছেলে খাজা সালাহ্উদ্দীন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন। খাজা হাবিবুল্লাহ্কেও পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহ্র পুত্র ভবিষ্যৎ নবাব—পড়ার কথা চিন্তা করতে পারেনি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল, আর তাঁর ভাগ্যেও চাকুরী জুটে গেল। বড় ভাই খাজা সালাহ্উদ্দীন বিলেতে বিয়ে করে থেকে গেলেন—আর কোনদিন ঢাকায় আসেননি। আর তাঁর ঢাকার সম্পত্তি এবং ওয়াকফের বৃত্তির মালিকানা খাজা শাহাবুদ্দীনকে লিখে দিলেন। খাজা শাহাবুদ্দীন পিতার মৃত্যুর ন'মাস পরে জন্মগ্রহণ করে বলে পিতার কাছ থেকে কিছু পায়নি। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার যে, নবাব সলিমুল্লাহ্র সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীনের চেহারার অপূর্ব মিল। একজন এক চক্ষু কানা আর একজনের বাঁ চোখ টেঁরা। অবশ্যই খাজা শাহাবুদ্দীনের মত অত টেঁরা ছিল না।

বৃটিশ সরকার টাকা দিয়ে আবার সবটাই যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় তার জন্যে ঋণগ্রস্ত নবাবের জমিদারীকে "কোর্ট অব ওয়ার্ডস"-এ ভুক্ত করে সেটা চালাবার জন্যে শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. জেনারেল ম্যানেজার করে দিলেন। আর ঐ ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে সবাইকে ইংরেজী শেখাবার জন্যে আহ্সান মঞ্জিলে ইংরেজী ও উর্দু ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হলো। খাজা সাহেবদের বংশে আমাদের যুগ থেকে লেখাপড়া শুরু হয়। খাজা আতিকুল্লাহ সাহেবের পুত্র খাজা আজাদ ও আমি একই সালে বি. এ. পাস করি। তারপর এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে খাজা ইদ্রিস, খাজা কায়সার। কলেজে পড়েছে খাজা শাহাবুদ্দীনের ছেলে খাজা মহিউদ্দীন। এক খাজা আজাদ ও খাজা কায়সারই নাজিমুদ্দীনের মত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। খাজা শাহাবুদ্দীনের ছোট ছেলে লেফ্ট্যানেন্ট খাজা সাঈদ শাহাবুদ্দীন গ্র্যাজুয়েট না হলেও তাঁর লেখা "To him I owe my life" একটি চমৎকার বই। ১৯৪২ সনে জাপানী ডুবু-জাহাজ তাঁদের জাহাজ 'চিল্কা' ডুবিয়ে দেয়—আহত অবস্থায় একটি জীবন-তরীতে (লাইফ বোটে) ছয় দিন ভেসে থাকার পর—সুমাত্রার আশি মাইল পশ্চিমে এক দ্বীপে অবতরণ করে। সেখানেও জাপানীরা এসে পড়ে এবং সে যুদ্ধবন্দী হয়। ১৯৪৫ সালে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসে ও তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বইখানা লিখে এবং লাহোরে ফিরোজ সন্স (পাকিস্তানের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) সে বই ১৯৫২ সনে প্রকাশ করে। যুদ্ধের পর থেকেই ঐ বাড়ির ছেলেরা বিভিন্ন বৃটিশ ফার্মে ভাল বেতনে

চাকুরী পায়। সৈয়দ সাহেবে আমলের ছেলে সৈয়দ ফৈয়াজ আলমও কেম্ব্রিজের গ্যাজুয়েট এবং এখন পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক পদে বহাল হয়েছেন বলে শুনেছি—বিয়ে করেছেন আমার শিক্ষক ড. হাসানের মেয়ে রিফাতকে।

মোটামুটিভাবে এই-ই আহ্সান মঞ্জিল খান্দানের ইতিহাস। আজ তাঁরা এখানে কেউ নেই বললেই চলে। কেবল খাজা ওয়াছিহ্উদ্দীন এবং খাজা কায়সার বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত আছেন।

খাজা নাজিমুদ্দীনের পূর্ববাংলা সরকারের কর্ণধার হয়ে আসায় ঢাকার মধ্যবিত্তের কি অবস্থা হলো তাই আমরা পরীক্ষা করব এবার। মনে রাখতে হবে—খাজা নাজিমুদ্দীন এলেও খাজা শাহাবুদ্দীন আর ঢাকার রাজধানীতে ফিরে এলেন না। ফজলুর রহমান সাহেব কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব পেয়ে গেছেন। ভাগ্যবান ফজলুর রহমান সাহেব যা আশা করেননি তাই পেয়ে ঢাকার রাজনীতির কথা ভুলে গেলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন জানতেন ঢাকা শহরে লোকের এমনকি সর্দারদেরও তাঁর উপর কোন আস্থা নেই। তারা নবাববাহাদুরকে যতটা সম্মান করেন তা তাঁকে করেন না। তাই তিনি নবাব বাহাদুরের ছেলে ক্যাপ্টেন খাজা হাসান আসকারীকে তাঁর এ. ডি. সি. করে নিলেন। চীফ্ মিনিস্টারের এ. ডি. সি.—শুনতেও অদ্ভুত লাগে তবু তাঁকে করতে হলো কারণ উপরে আল্লাহ নীচে কায়েদে আজম দু'জনই দৃষ্টির বাইরে। কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন—স্বাভাবিকভাবেই আমলা প্রধান আজিজ আহমদের উপরই একমাত্র ভরসা রেখে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসলেন। আর তাঁর বাঁ হাত রইলেন আই. জি. জাকীর হুসেন।

৭ই আগস্ট জিন্নাহ্ সাহেব, দিল্লী থেকে করাচী রওনা হয়ে গেলেন। মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণা ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনিই দু'টো রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল থাকবেন। শেষ মুহূর্তে জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, একই গভর্ণর জেনারেল হলে দু'রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা আরো গভীরতর হবে কারণ কেউ তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারবে না। তারপর অনেক নাম আলোচনা হলো রাজপুত্র 'ডিউক অব কেন্ট' এবং রাজপরিবারের অন্যান্য দু'চারজনের। সবাই বলছে এমন কেউ হতে হবে, যে মাউন্টব্যাটেনের সমকক্ষ নইলে ভাগাভাগির সময়—সকল পাওনা পাওয়া যাবে না। কিন্তু জুলাই মাসের শেষে জিন্নাহ্ তাঁর নিজের নামই পাঠিয়ে দিলেন—সম্রাটের নিকট থেকে নিয়োগপত্র পাবার জন্য। প্রশ্ন অনেকের মনে এল তিনি কেন গভর্ণর-জেনারেল হলেন ? কেন বুঝলেন না যে, তাঁর পক্ষে পাকিস্তানের ভাগ-বাটোয়ারা আদায় করা সম্ভব হবে না ? কেন তিনি বুঝলেন না তাঁর গভর্ণর-জেনারেল হওয়া অর্থ পাকিস্তানে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া ? কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটা তার অজ্ঞান মনের ইচ্ছা। ছোটবেলায় বিশেষ করে বিলেতে পড়ার সময় থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা তাঁকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে তারই প্রতিশোধ নিয়েছেন নিজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার পর থেকে। অবশ্যই আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই—তবু যত তাঁর প্রহেলিকাময় জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছি ততই মনে হয়েছে সে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত—নইলে চল্লিশ বছর বয়সে আঠার বছরের মেয়ে রতন-বাঈকে কেন বিয়ে করেছিলেন। স্যার ডিন শ পেটীট যা নিয়ে জিন্নাহ্র

বিরুদ্ধে কোর্টের "ইনজাংশন" পর্যন্ত জারি করেছিলেন—এটা কি শুধু ভালোবাসা না একটা ধনী "নাইট" পার্সীকে অপদস্থ করার অজানা মানসিক আকাঙ্ক্ষা। মুসলিম লীগ করায়ত্ত করার জন্যে বড় বড় ব্যবসায়ী, যেমন আদমজী, ইস্পাহানীদের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে দেশের নবাব, নাইট, জায়গীরদার, জমিদারদের দ্বারা বেষ্টিত থাকার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁদের মনোনয়ন করা আবার যখন খুশী তাদের খৃষ্টমাস-এর "প্রেজেন্ট" হিসেবে গভর্ণর-জেনারেলকে দেয়া, দু'প্রদেশের দুই মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের মুসলিম লীগ সদস্যপদ খারিজ করা—তারপর নিজেকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত করা—সবটাই যেন সামাজিক অবিচারের উপর প্রতিশোধ।

জিন্নাহ্ কি সত্যই পাকিস্তান চেয়েছিলেন না রাজকোটের দেওয়ানের পুত্র গান্ধীজিও কাশ্মীরী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহেরুর উপর একই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ? আমার মনে হয়—মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো উচিত। রাজনীতির ছাত্রদের এটা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক গান্থারের মতে একজন অস্বাভাবিক (abnormal) লোকের পক্ষেই একনায়ক (Dictator) হওয়া সম্ভব। স্বাভাবিক লোক নিজেকে একমাত্র বুদ্ধিমান সর্ব-জান্তা বলে ভাবতে পারে না। জিন্নাহ্র ব্যাপারে অবশ্য এও হতে পারে যে, যখন পাকিস্তান হলো তখন তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত। কিন্তু আমার চিন্তা সেদিকে যায়নি, তাঁর কঠিন রোগ ধরা পড়েছে ১৯৪৪ সনে—কিন্তু বাকি তিন বছর তিনি কোন বিশ্রাম নিতে চাননি। এমনকি, "পার্টিশন কাউন্সিলে" তিনটি কমিটিতে তিনি নিজেকে, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে ও আবদুর রব নিশতারকে মনোনীত করে—দু'দিন পরে নিশতারকে সরিয়ে নিজেই দু'টো কমিটিতে বসতে লাগলেন—আর সপ্তাহখানেক পরে নবাবজাদাকে সরিয়ে দিয়ে তিনটি কমিটিতেই নিজে থাকলেন। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বুঝবেন যে, কমিটির কাজে কতটা পরিশ্রম করতে হয়। গভর্ণর-জেনারেল হয়েও তিনি নিজে মন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন—যার ফলে পরবর্তীকালে লিয়াকত আলী খান সেসব মন্ত্রীদের আয়ত্তাধীনে আনত পারেননি। জিন্নাহ্ সাহেব যে কারণ দেখিয়ে নিজে গভর্ণর জেনারেল হলেন সে একই কারণে ফিল্ড মার্শাল অকিনলেকের ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীদের অধিনায়কত্ব মেনে নেয়া উচিত ছিল না। অকিনলেককে না মানলে হয়ত কাশ্মীর নাও হারাতে পারত। অবশ্যই এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

করাচীতে পৌঁছে তাঁর এ. ডি. সি. লেফ্ট্যানেন্ট আহ্সানকে বলেছিলেন,—

"Do you know, I never expected to see pakistan in my life time."

মাননীয় আগা খান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

> "I myself am convinced that even as late as 1946 Jinnah had no clear and final idea of his goal, no awareness that he would, within twelve months, be the founder of a new nation, A muslim great power such as the world has not seen for centuries."

আমার মনে হয় যে, সে যদি ঠিক বুঝতে পারত যে—পাকিস্তান আসছেই তাহলে বৃটিশ সরকারের কাছে নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীর প্রধান ও প্রদেশের গভর্ণর

হবার জন্যে বৃটিশ সরকারের কাছে তালিকা প্রদান করতো না—নিজেদের মধ্যে থেকেই সেসব চাকুরীর জন্যে লোক প্রস্তুত রাখত। তাঁর দু'জন মিলেটারী সেক্রেটারী ছাড়াও তিনি জেনারেল ডগলাস গ্রেসী, স্যার আরচিবল্ড রোন্যালডস্, স্যার জর্জ কানিংহ্যাম, স্যার ফ্রান্সিস মুডি, স্যার জন বারোজ প্রভৃতির সাহায্যের জন্য লর্ড ইস্‌মের নিকট যে তালিকা প্রদান করেন তা থেকেই বোঝা যায় জাতির জনক হবার জন্যে তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। যদি তিনি জানতেন পাকিস্তান হবেই তাহলে পাকিস্তানে প্রদেশসমূহ অর্থাৎ বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলচিস্তানের লোক দিয়েই গণ-পরিষদ তৈরি হত। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহ হতে এত লোক গণ-পরিষদে স্থান দিত না। আমার মনে হয়, মিশন প্ল্যান গ্রহণ করার দিন অর্থাৎ ১৯৪৬ সনের ৬ই জুন পর্যন্ত তাঁর ভারতে একটা "কনফেডারেশনের" পরিকল্পনা গ্রহণ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি হয়েই জওহরলালজীর ঔদ্ধত্ব ও অহংকারপূর্ণ বিবৃতি তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারপর ৮ই আগস্ট নেহেরুজীর মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা না করেই সরকার গঠনের পর যে পরিস্থিতি হলো সেখান থেকে আর পেছনে ফেরার উপায় ছিল না। (The situation reached a point of no return) ১৯৪৬ সনের ২৯শে জুলাই "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ এবং খেতাব বর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা তিনি বোধহয় স্থির করেছিলেন। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানই তাঁর নিকট পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল। পাকিস্তান হবার পর কাশ্মীর পাবার প্রচেষ্টা—উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া এবং "পার্টিশন ট্রাইবিউনালে" যাতে বাংলাদেশ কলকাতা পাবার জন্যে এমন কোন যুক্তিতর্ক না উপস্থিত করে—যার ফলে লাহোর হারাবার প্রশ্ন উঠে তার জন্যে বাংলার পক্ষে সোয়ালজওয়াব করার জন্য ভারতের উত্তরপ্রদেশের এডভোকেট ওয়াসিম সাহেবকে পূর্ববাংলার পক্ষে নিযুক্ত করেন, যার বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যে কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন যুক্তিতর্কে সাহায্য করার জন্য তা ওয়াসিম সাহেব কোনদিন ব্যবহার করেননি। অথচ খুলনার পক্ষে শেরেবাংলা সেসব মানচিত্র এবং কাগজপত্র ব্যবহার করে যে খুলনা মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ভাগা-ভাগিতে ভারতের দিকে পড়েছিল তা পূর্ববাংলায় ফিরে এসেছিল। জিন্নাহ্ বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে আমি দশ মাইল পেলে—পূর্ববাংলায় বিশ মাইল ছেড়ে দিতে রাজী—কারণ ঐ দশ মাইলের পেছনে রয়েছে বিরাট মুসলিম জগৎ—যা পূর্ববাংলার পেছনে ছিল না, আগরতলার রাণী সাত দিন খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে থেকেও আগরতলাভুক্তি করার ব্যাপারে কিছু করতে পারলেন না—অথচ শেখ আবদুল্লাহ্‌র বিরোধিতা সত্ত্বেও কাশ্মীর পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাব বিভক্তি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পার্লামেন্টারী পার্টির নতুন নেতা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ খাজা নাজিমুদ্দীন না থাকলে "পার্টিশন কাউন্সিলে" বাংলাদেশের পশ্চিমবাংলার নিকট পাওনা পূর্ব পাঞ্জাবের পশ্চিম পাঞ্জাবের পাওনার বৈষম্য প্রদর্শন করে কারো কিছু পাওনা নেই—এ সমাধানে আসা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠত না।

পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দেয়া উচিত ছিল। এমনকি, গণ-পরিষদের একটি বিল পাস করে নতুন গণ-পরিষদ গঠন করাও উচিত ছিল। কারণ ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্যরা সবই ভারতীয় আর পাকিস্তান গণ-পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যই বহিরাগত—ভারতীয়, যাদের পাকিস্তানের কোন নির্বাচন কেন্দ্র হতে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব ছিলো—দু'চারজন ছাড়া। নতুন গণ-পরিষদ ইচ্ছা করেই করেনি। বরঞ্চ তাঁরা আশিজন দীর্ঘ সাত বছর ধরে একটি "অলিগার্কি" অর্থাৎ কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। বাংলাদেশের নেতারা যাতে গণ-পরিষদ মেনে নেয় সে জন্যে বাংলা থেকে যাঁদের মন্ত্রী করা হলো তাঁরা হলেন—ফজলুর রহমান, গিয়াসুদ্দীন পাঠান, আজিমুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি, যাঁরা হামিদুল হক চৌধুরী এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের মতই কোন সাধারণ নির্বাচনে কোনকালে নির্বাচিত হতে পারেননি। তাই তাঁরাও ভারতীয় গণ-পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে সংবিধান না দেবার ব্যাপারে একমত হলেন। তাছাড়া যে কোন সংবিধান হলেই নির্বাচন দিতে হয়—সে নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব রাখা শক্ত হওয়াই সম্ভব। ন্যাশনাল গার্ড ভেঙ্গে দিলেন—এর বিরোধিতা করার অপরাধে নায়েবে সালারে-সুবা জহিরুদ্দীনের ছ'মাসের জেল হয়ে গেল। অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠানে নাজিমুদ্দীনের লোক নেই সেসব প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে হবে—তাদের হয়রান করতে হবে। এমনকি, পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন সাহেব ভূগোলের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পরেই তাঁর সরকারী চাকুরী খতম হয়ে যায়। কারণ সে শহীদ সাহেবের লোক। এরকম ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সনের জুন মাসে যেদিন স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল সেদিন আমরা ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার কর্মীরা আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কারণ তিনি স্থিরই করেছিলেন যে, তিনি পাকিস্তানে আসবেন না। আমাদের অতঃপর করণীয় কি সে সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, পূর্ববাংলার বামপন্থীদের একটা যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করার মধ্যদিয়েই কেবল আমরা ফ্যাসিবাদী মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারব। ঢাকায় ফিরে এসেই আমরা আমাদের পার্টির লোকদের আমার বাসায় ডাকি এবং সেখানে গণ-আজাদী লীগ (Peoples Freedom League) গঠন করা হয়—এবং একটি ম্যানিফেস্টো তৈরি করে পার্টির কর্মীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সকল কর্মীদের দ্বারা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমাকে "কনভেনর" নিযুক্ত করা হয়। যাঁরা প্রথম কমিটিতে ছিলেন তাঁরা হলেন—তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোহা, অলী আহাদ, তোসাদ্দক আহমদ এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি। শামসুল হক, আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে বর্ধমান চলে গেলেন। শামসুল হক তখন আল্লামা আজাদ সোবহানী ও আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে রবুবিয়াৎ ও রব্বানিয়াতের তত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। যার ফলে পরে পূর্ববঙ্গে এসে তাঁর পুস্তক "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইসলাম" প্রকাশ করেন। তিনি গণ-আজাদী লীগের ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে একমত হননি তাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেননি। যার ফলে তাঁর নিজস্ব কর্মী বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেননি। আগস্ট মাসের ১৪ তারিখে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হলো। অর্থাৎ আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পার্টি গড়ার চেষ্টা করেছিলাম পাকিস্তান হবার দু'মাস আগেই।

২৫শে আগস্ট হঠাৎ আমার বাড়ি সরকার "রিকুইজিশন" করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে বললেন। সরকার এটা বুঝল না যে, স্ত্রী-পুত্র, সংসার-ওকালতি সবেমাত্র আরম্ভ করলেও ছোটখাট একটা লাইব্রেরী ও অন্যান্য মালপত্রসহ এত অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া সম্ভব কি না। আমি গেলাম "একমডেসন অফিসে"—সেখানে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিল আফতাব আহমদ খান, আই. সি. এস. (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী) ও দ্বিতীয় অফিসার ছিলেন কামালুদ্দীন আহমদ (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত) তাঁরা দু'জনেই বললেন যে, তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কারণ এটা মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নির্দেশ। তবু বলে-কয়ে এক সপ্তাহের সময় নিয়ে এলাম। কিন্তু আমি যুক্ত বাংলার পক্ষপাতি সুতরাং আমি সরকারের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়েছি—তাই আমাকে কেউ শহরে বাসাভাড়া দিতে রাজী নয়। অথচ ব্যবসা আমার ওকালতি—জেলা কোর্টের কাছাকাছি আমার থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া ১৯৩৯ সন থেকে রেডিও থেকে আমার একটা ভাল আয় হচ্ছিল—সে টাকাটা তখন প্রয়োজনও ছিল। সাপ্তাহিক সমসামরিক ঘটনার উপর—১৫ থেকে ২০ মিনিট এবং ইতিহাসের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা করতে হত এবং ঐ সময়ে যে সিরিজ-এর উপর সাপ্তাহিক লেখা পাঠ করেছিলাম সে হচ্ছে 'ভুলে যাওয়া মোগল সম্রাটদের কাহিনী' (Forgotten Mughal emperors—Zahandar Shah to Bahadur Shah 11) তাছাড়া নতুন উকিল সিনিয়রের চেম্বারেও কাজ করতে হতো। আমি যেমনই হোক একটা বাসা খুঁজেছি এমন সময় "একমডেসন অফিস" থেকে ২৮শে আগস্ট তারিখে চিঠি এল যে, আমাকে সাত দিন সময় দেয়া হয়েছিল তা বাতিল করা হলো এবং আমাকে ২৯শে আগস্টের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। প্রথমে সীতানাথ মোক্তারের একটা ছোট বাড়ি জুমারাইল লেনে উঠলাম—সেখানে নীচে দু'টো ঘর আর উপরে একটি ঘর। এরপর জিন্দাবাহারের বলরাম সাহা উকিলের বাড়ি খালি হলে আমি সে বাড়িতে উঠলাম। পরদিন কাদের সর্দার সাহেব আমাকে বললেন, আমি যেন কাউকে ভাড়া না দি অথবা নিজে ক্রয় না করি—কারণ তিনি ঐ বাড়িটা নিতে চান। আমি রাজি হলাম। আমার তখন একটি বাড়ির দরকার। সে বাড়িতে আমি ১৯৫৬ সন পর্যন্ত অবস্থান করেছি অর্থাৎ কূটনৈতিক চাকুরিতে যোগ দেবার আগ পর্যন্ত।

পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কর্মীদের উপর এমনি নানা রকমের বিপদ নেমে আসতে লাগল। শহীদ সাহেব এলেন না অভিমান করে। আবুল হাসিম সাহেব এলেন না। শামসুল হক বর্ধমানে থেকে গেলেন তাঁর পুস্তকের বিষয়বস্তুসমূহ আলোচনা করতে। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, নূরুদ্দীন সাহেব তাঁদের পড়াশুনা সমাপ্ত না করে আসতে পারেন না। আবুল মনসুর আহমদ সাহেব শহীদ সাহেবের ইত্তেহাদ নিয়ে রইলেন। এদিকে আমাদের বিরুদ্ধে সৈয়দ সাহেবে আলম (কালু মিঞা) ও মাজেদ সর্দার সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, আমরা পাকিস্তান-বিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী কমিউনিস্ট।

খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার যেভাবে করতে আরম্ভ করছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী এবং ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)-র পরামর্শে তাতে আমাদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে যেত—যদি না ঢাকা শহরের লোকেরা নাজিমুদ্দীন সাহেবের উপর খুব তাড়াতাড়ি বিরূপ না হয়ে উঠত। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব বুঝতে পারেননি যে, স্যার সলিমুল্লাহ্‌র দিন আর ছিল না। আহ্‌সান মঞ্জিলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা,—সোজা হয়ে ওদের দাঁড়াবার উপায় নেই। আমাদের কেবল প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলিয়ে নিতে হবে।

এমন সময় রাজশাহীর মাহবুবুল হকের মারফৎ নূরুদ্দীন সাহেবের একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন বামপন্থী যুবকদের একত্র করে একটি গণতান্ত্রিক যুবসংস্থা করার জন্যে—তাঁরা কলকাতায় বসে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আরো স্থির করেছেন যে, ঢাকায় সে কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। অথচ তখন সাহেবে আলম ঢাকার ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের নিয়ে আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এমনকি শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব নিরাপত্তার জন্যে কাদের সর্দার সাহেবের একটি ঘরে বাস করছেন এবং সেখানে বসেই ওকালতি করছেন। তা সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবে আলম ট্রাকে করে একদিন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লেন তাঁকে অপমান করার জন্যে, কারণ তিনি নাকি অনেক লোকের এক বৈঠকে জিন্নাহ্ সাহেবকে "খরাদজ্জালের সঙ্গে তুলনা করেছেন—কথাটা হয়ত সত্য কারণ ফজলুল হক সাহেব প্রায়ই ঐ রকম কথা বলতেন। উকিল লাইব্রেরীতে বসে একদিন বলেছিলেন,—খরাদজ্জালের চেহারা কানা—স্বর্গে এক পা আর মর্ত্যে এক পা।" নাম বলেননি তবে আমরা বুঝেছিলাম যে, জিন্নাহ্‌র মনোকল্ ব্যবহার আর তাঁর পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার ইঙ্গিত। এমনকি একবার পকেট থেকে আট শ' টাকা হারিয়ে গেলে নোট খাতায় লিখে রাখলেন আট শ' টাকা—জিন্নাহ্ ফণ্ড। রিকশাওয়ালা হাইকোর্টে যাবার ভাড়া ঠিক করল বার আনা—হাইকোর্টে পৌঁছিয়ে দিয়েই চাইল এক টাকা। তিনি দিলেন টাকাটা—বাড়ি এসে নোট করলেন—বারো আনা রিকশা ভাড়া, চার আন জিন্নাহ্ ফণ্ড। একদিন হঠাৎ নোটবইটা আমার হাতে পড়ল—অনেক পৃষ্ঠায়ই দেখলাম তিনি প্রায়ই জিন্নাহ্ ফণ্ডে চাঁদা দিয়েছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—"নানা, আপনি জিন্নাহ্‌কে গালি দেন অনবরত অথচ জিন্নাহ্ ফণ্ডে চাঁদাও দেন দেখতে পাচ্ছি"। তিনি উত্তরে বললেন,—"যে টাকার হিসেব মিলে না—যে টাকা লোকে আমাকে ঠকিয়ে নেয়, যে টাকা চুরি হয় সে তো সবই জিন্নাহ্ ফণ্ডেই যায়, নইলে যায় কোথায়। এই যে প্রতিটি ওকালতনামার উপর "কায়েদে আজম রিলিফ ফণ্ডে" পয়সা দিয়ে যাচ্ছ—তার হিসাব কি কোনদিন কোন কাগজে দেখেছ?" তাঁর কথার মধ্যে ব্যাঙ্গ ও খেদ দু'টোই মিশ্রিত থাকত। তাই বলে যে-মানুষটি স্যার সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁকেই সলিমুল্লাহ্‌র বোন আমিনা বিবির ছেলে গুণ্ডা দিয়ে অপমান করছে—আর মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন অন্তরে আনন্দ পাচ্ছেন—এ যেন দশ বছর আগে পটুয়াখালীর নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ।

নূরুদ্দীন সাহেবের চিঠি পাবার কয়েকদিন পরেই রাজশাহীর আতোয়ার রহমান এলেন ঢাকায় পরামর্শ করতে—সভার স্থান কোথায় হবে। কলকাতার কর্মীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, আমরা জেলা বার-লাইব্রেরীতে করতে পারব। আমি তাঁকে, তোসাদ্দক আহমদ, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, তোহা সাহেব ও তাজউদ্দীন সাহেবের উপস্থিতিতে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করলাম। একমাত্র স্থান আমি বললাম যেখানে গুন্ডারা মারামারি করতে পারবে না সে হলো আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়ি, তাঁর "লন" প্রকান্ড নানা ফুলে-ফলে সাজানো, সুতরাং তিনি রাজী হবেন কি না তাঁর সঙ্গে আলাপ না করে বলা যাবে না।

আমার যতদূর মনে পড়ে আমি ও শামসুল হক তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বেশ সহজেই রাজী হলেন—কারণ বহু বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান—খাজা নাজিমুদ্দীনের তখন ইচ্ছা হয়েছে সৈয়দ সাহেবে আলমকে ভাইস-চেয়ারম্যান করবেন—এবং সেটা হাসনাত সাহেবকে বলা হয়েছে। তিনি কোন তর্ক করেননি খাজা সাহেবের সঙ্গে, কিন্তু অন্তর তাঁর জ্বলে যাচ্ছিল। সুতরাং আমাদের চেয়ে দেখলাম তিনিও কম ক্ষিপ্ত নন আহ্সান মঞ্জিলের প্রতি। তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল খাজা হাবিবুল্লাহ্ জন্যে—কিন্তু তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হবার পরে আর সে দুর্বলতা রইল না। এভাবেই স্থান সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এর পরে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে আমাদের পুরনো পার্টি অফিসে এক বৈঠক বসে এবং একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আমি ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলাম যেহেতু এককালে ঐ পার্টি হাউসের নেতৃত্বের ভার আমার উপর ছিল। "যুবক" বলতে কি বোঝাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে ঠিক হলো যে, যারা ত্রিশ বছর বয়স পেরোয়নি—তাদেরই "যুবক" বলে চিহ্নিত করা হবে—অবশ্য তাদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক তাদের বাদ দেয়া হবে। ১৯৪৩ সনে আমার ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে—সুতরাং আমি কেবল তাদের সমর্থন করতে পারি, সাহায্য করতে পারি কিন্তু তাদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারি না। স্থির হলো অধিবেশন বসবে সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে আর তার প্রস্তুতি নেবার জন্যে ভার নিলেন সর্বজনাব তোসাদ্দক আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, অলী আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল আউয়াল।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে প্রফেসর আবুল কাসেম তমদ্দুন-মজলিস নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নূরুল হক ভূঞা সাহেব ঐ সংস্থার কনভেনর নিযুক্ত হন। সংস্থাটি ছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রথম থেকেই ঐ সংগঠন বাঙলা ভাষা সর্বত্র প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাঁরা সভা, 'সিম্পোজিয়াম;, পুস্তিকা প্রকাশ ও খবরের কাগজের মাধ্যমে তাঁদের আন্দোলন এগিয়ে নিতে চাইছিলেন—পরে তাঁদের ধারণা হয় যে, ছাত্র এবং রাজনীতিবিদদের সাহায্যের প্রয়োজন আন্দোলনে সফলতা লাভ করার জন্যে।

ঐ সময় শাহ্ আজিজুর রহমান সাহেবের নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল একমাত্র মুসলমান ছাত্র প্রতিষ্ঠান। শাহ্ আজিজুর রহমান সাহেব খাজা সাহেবেদের দলে—সুতরাং শহীদ সাহেব ও আবুল হাসিম সাহেবের দলীয় ছাত্রনেতারা স্থির করেন যে,

অন্য একটি ছাত্র সংগঠন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জেলার কয়েকজন ছাত্রনেতা একত্র হয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। নইমুদ্দীন সাহেব ঐ সংস্থার 'কনভেনর' হন এবং অলী আহাদ সাহেব শহর ছাত্রলীগের কনভেনর হন।

সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে অনেক ছাত্র এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে থাকে এবং শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবদের নেতৃত্বে মোগলটুলী অফিসে "এয়ার্কার্স ক্যাম্প" প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুল হক সাহেব ঐ "ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের" কনভেনর হন। "ওয়ার্কার্স ক্যাম্প" সেসব যুবকগণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যাঁরা শহীদ সাহেব অথবা আবুল হাসিম সাহেবের জন্যে মুসলিম লীগে কাজ করেছেন তাঁরা সবাই পুনরায় মুসলিম লীগ দখল করার প্রচেষ্টা চালাবার জন্যেই ঐ "ক্যাম্প" গঠন করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা বোকা বনলাম—কারণ আবুল হাসিম সাহেবের শেষ উপদেশ ছিল—১৯৪৭ সনের জুন মাসে যে বামপন্থীদের একতা গড়ে তুলতে হবে। তাই আমি ঢাকায় এসে গণ-আজাদী লীগ গঠন করি। যার ভিত্তি সেই লাহোর প্রস্তাব—পূর্ব পাকিস্তান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং দু'টো পাকিস্তান একত্র থাকতে হলে কি ভিত্তিতে থাকবে তা পরে নিরূপণ করবে দু'দেশের লোকেরা। তাই আমরা বললাম, বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা তারাই স্থির করবেন। আবার যদি কেন্দ্র গঠিত হয় তবে দু'দেশের রাষ্ট্রভাষাই কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা হবে যেমন—বেলজিয়াম, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পরে যারা ঢাকা এলেন তাদের মধ্যে দেখলাম যতসত্বর সম্ভব ক্ষমতায় যাবার প্রচেষ্টাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হলো ৬ই সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হবার পর বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নটাও যেন তার বিশেষত্ব হারাল। এর পর বাকি রইল যে—কারা কলকাতা যাবে পরের বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব-সম্মেলনে।

ঐ সময় খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল খুবই দ্রুত। কারণ সরকার ঘাটতি জেলাগুলোর জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা না করেই উদ্বৃত্ত জেলাগুলো "কর্ডন" করে ধান ক্রয় করতে আরম্ভ করে। ফলে ঘাটতি জেলাগুলোতে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। ঐ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পরীজাদা আবদুস সাত্তারের গাড়ির উপর কার্জন হলের সম্মুখে ছাত্ররা হামলা করে। এই নিয়ে তোফাজ্জল আলী (টি আলী) সাহেবের জয়নাগ রোডের বাড়িতে এক সভা হয়। সেখানে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও আরো কয়েকজন পরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার কাজ সম্পন্ন করে গান্ধীজি ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে পৌঁছেন। দিল্লীতে চলছিল তখন হত্যা, লুট, উৎপীড়ন এবং ধর্ষণ। গান্ধীজি বিড়লার বাড়ি গিয়ে দিল্লী তথা ভারতে মানবতাবোধ জাগাবার জন্যে সচেষ্ট হন। প্রতিদিন তাঁর প্রার্থনা সভায় হাজার হাজার লোক যোগ দিত।

দলীয় কর্মীদের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা গ্রহণ করতে দেখে আমি যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম। এমনি সময় ডাক্তার মালেক আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন একটি ট্রেড ইউনিয়ন সভায়। আমার যতদূর মনে পড়ে সভাটি ছিল ১৯৪৭ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর। আমার

নিকট যদিও শ্রমিক আন্দোলন একেবারে নতুন ছিল কারণ প্রফেসর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা যিনি আমাকে ১৯৩৭ সনে এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সে-ই আমাকে ১৯৪৫ সনে পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের ঢাকা ব্রাঞ্চের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে বছরই ঢাকার আর. এম. এস. কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হই। এর পর পূর্ববাংলা ব্যাঙ্কিং কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে আমাকে বলা হয়। কিন্তু আমার সম্পর্ক ছিল কেবল কেরানীকুলদের সঙ্গে। ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের ভাষায় "হোয়াইট কলার" শ্রমিকদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হয়েছিল। সত্যিকার মেহনতী মানুষের সঙ্গে তখনো আমার দেখা হয়নি। অথচ ঐ সময় নারায়ণগঞ্জ সুতাকল শ্রমিকদের একটা জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছিল।

ঢাকায় সন্ত্রাসবাদীদের এককালের নেতা অনুশীলন পার্টির প্রতুল গাঙ্গুলী ঢাকায় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি R. S. P. I (Revolutionary Socialist Party of India) গঠন করেন। তাঁরই বন্ধু গোপাল বসাক, নেপাল নাগ ও অনীল মুখার্জী নিজেদের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (C. P. I) সদস্য বলে ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন—কয়েকজন ভারতীয় বলশেভিক পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। প্রতুল গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর অমর ব্যানার্জী ও নেপাল নাহা "আর. এ. পি. আই."-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী ১নং মিলের শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নারায়ণগঞ্জের অন্যান্য মিল শ্রমিকদের সংগঠিত করে সি. পি. আই.। বলশেভিক পার্টির দীনেন সেন ও গৌর বর্মন ঢাকা বিদ্যুৎ কর্মচারীদের এবং মিউনিসিপ্যালিটির ধাংগরদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সনের জুন মাসের পূর্ব পর্যন্ত আমি মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, শ্রমিকদের সমস্যা বা শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি আমার দৃষ্টি একেবারেই আকৃষ্ট হয়নি। আমার একমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আহ্সান মঞ্জিলের প্রতি। আহ্সান মঞ্জিলের পতনের মধ্যদিয়ে আমি ব্যাস্টাইল ধ্বংসের স্বপ্নই দেখেছিলাম। আমার মতে ১৯৪৪-৪৫ সনেই আহ্সান মঞ্জিলের নেতৃত্বের অবসান হয়ে গিয়েছিল—খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৭ সনে প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসে আত্মরক্ষার জন্যেই ব্যস্ত থাকতে হলো। আগের দিনের মত গুণ্ডাদের দ্বারা কাউকে আহ্সান মঞ্জিলে ধরে নিয়ে দৈহিক উৎপীড়ন ও মানী লোকের অপমান করার ক্ষমতা আর ছিল না। ছাত্রদের আন্দোলন, সেক্রেটারিয়েটের কেরাণীদের ধর্মঘট তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। নতুন সংগ্রামের প্রয়োজন হলো তাদের বিরুদ্ধে যারা মধ্যবিত্তদের মধ্য থেকে উপরে উঠে নিজেদের উচ্চ-মধ্যবিত্ত বলে জাহির করতে লাগলেন—কারণ তাদের সঙ্গে সম্পর্কও আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল অভিজাত ঘরের লোকদের। তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়—ময়ূরপুচ্ছে ঢাকা দাড়কাকের সঙ্গে। তারা যেহেতু মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই উঠেছিলেন, সুতরাং তারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দুর্বল দিকটার কথা জানতেন। বাংলায় এদের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল আমীন, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী ও ইউসুফ আলী চৌধুরী। আমার নিজের মনে হলো যে,

এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাড়াও শ্রমিকদের সাহায্য প্রয়োজন হবে।

১৯৪৬ সনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র এন. এম. জোশী কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন—১৯৪৬ সনে চারজন সদস্য কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন তাঁরা ছিলেন—১. এন. এম. জোশী, ২. আফতাব আলী, ৩. মনিবেন কেরা ও ৪. গুরুস্বামী। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট্স এ্যাক্ট" ১৯৪৭ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সনে যখন ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়—তখন এ. আই. টি ইউ. সি. (All India Trade Union Congress) সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শ্রমিক সংস্থা তারপরেই বোধহয় এম. এন. রায়ের আই. এফ. এল (Indian Federation of Labour)। আমি শ্রমিক আন্দোলনে রায়পন্থী আর ডাক্তার মালেক, আফতাব আলী, ফয়েজ আহমদ প্রভৃতি এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতা। এর মধ্যে একমাত্র আফতাব আলী সাধারণ শ্রমিক হিসেবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন ও পরে ডাংগে ১৯২৬ সনে যখন এ. আই. টি. ইউ. সি.'র সেক্রেটারী হয়েছিলেন তখন আফতাব আলী সাহেব সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। আফতাব আলী সাহেবই এশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (I. L. O) গভর্ণিং বডির তখন একমাত্র সদস্য।

২৮শে সেপ্টেম্বর-এর সভায় ইস্টার্ণ পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (EPTUF) গঠিত হয়। সভায় উপস্থিত করা হয় (AITUC)-র একটি প্রস্তাব—যাতে বলা হয়েছিল,—

> "In view of the division of India into two States and the problems arising from it, the General Council permits the affiliated trade unions from Pakistan areas to form a separate central trade union organization if they do so wish and appoints a provisional Committee of the following with powers to co-opt. to examine, and dicide the questions as they think proper :—
>
> East Bengal—Comrade Fazal Elahi Ahmad, Md. Ismail, Nepal Nag and Dinen Sen.
>
> West Pubjab—Comrade Fazal Elahi Qurban, Mirza Ibrahim and Ramesh Chandra.
>
> Sind—Comrade Narayandas Bechar, Sobo and J. Bukhari.
>
> The General Council is confident that if it decided to form a separate organization, machinery will be provided for pooling common experience of Indian and Pakistan Trade Unions and rendering help to each other in common matters."

যাঁরা ঐ সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন,—

ডাক্তার মালিক, কমরেডস্ মারুফ হুসেন, নেপাল নাগ, দীনেন সেন, সমর ঘোষ,

অশ্বিনী দেব, অমৃতেন্দু মুখার্জী, মোহাম্মদ ইসমাইল, অনীল বসাক, রাধাগবিন্দ সরকার, সুনীল সরকার, আফতাব আলী, ফয়েজ আহমদ, সুলতান আহমদ ও প্রফেসর শিবদাস গাঙ্গুলী।

EPTUF-এর সভাপতি হন ডাক্তার মালিক। আফতাব আলী ১৯৪৬ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হন এবং তাঁর স্থলে ডাক্তার মালিক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালীনই আফতাব আলী I. L. O-এর গভর্ণিং বডির সদস্য হয়ে যান। তিনি জেনেভায় এবং লণ্ডনেই থাকতেন। সহ-সভাপতি হলেন,—নেপাল নাগ, মোহাম্মদ ইসমাইল, মোহন জমাদার। সেক্রেটারী হলেন—ফয়েজ আহমদ সাহেব আর অনীল মুখার্জী ও গৌর বর্মন হলেন,—সহকারী সম্পাদক।

EPTUF ডাক্তার মালিককে, এশিয়ার সদস্য দেশগুলোর দিল্লী কনফারেন্সের প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন। কনফারেন্সের অধিবেশন হয়েছিল ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে। পাকিস্তান সরকার ডাক্তার মালিকের নামই I. L. O.-তে পাঠালেন। তাঁর পরামর্শদাতা হয়ে গেলেন নেপাল নাগ। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তখন পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী।

১৯৪৬ সনে নারায়ণগঞ্জ শ্রমিক আন্দোলনের কথা সে সভায় আলোচনা হলো। সেখানে ৯ হাজার সুতাকল শ্রমিক তিন মাস ধরে কিভাবে ধর্মঘট চালিয়ে ছিল। ধর্মঘটের কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. জোশী মিল কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিতে চাইলে মিল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বক্তৃতা করতে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ১৯৪৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে ২১ জন শ্রমিকনেতাকে বরখাস্ত করা হয়। শ্রমিকরা দাবী তোলে—বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনরায় কাজে নিয়োগ করতে হবে আর দশ টাকা মন দরে শ্রমিকদের চাল সরবরাহ করতে হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। মার্চ মাসের ২৫ তারিখে মিলে ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দেয়—যার ফলে পুলিশকে গুলী চালাতে হয়। দু'জন ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করে আর ৭০ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিন্তু ধর্মঘট চলতে থাকে। ৭ই মে তারিখে শ্রমিকদের দাবী মেনে নিলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ঘটনাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং আমি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেবার কথা ভাবি। কিন্তু ডাক্তার মালিকের ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি এক ডাক্তার মালিক ও আফতাব আলীকে ছাড়া কাউকে জানতাম না বলে ওদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়া উচিত কি না তাই ভেবে দেখতে সময় নেই।

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে নিখিল পাকিস্তান পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সভাপতি করা হয় এবং ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এম্প্লইজ লীগের ঢাকা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হই। ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এম্প্লইজ লীগের সভাপতি তখন এডভোকেট নূরুল হুদা। সেই সময় টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন গঠিত হয়—সভাপতি বি. এ. সিদ্দিকী এবং সেক্রেটারী এ. আর. সুন্নামত। পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রথমে আবু তাহের সাহেব পরে গোলাম মর্তুজা সাহেব।

ডাক্তার মালিকের ইচ্ছার কথা এবং I. L. O.-এর গঠনের কথা আমি নূরুল হুদা এবং বদরুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবকে বলি—কারণ আমরা তিনজনই একই ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলাম—অর্থাৎ ওকালতি। সুতরাং আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা যত বেশি ছিল তত ছিল না EPTUF-এর নেতাদের সঙ্গে। কয়েকটি বৈঠক হবার পর স্থির হয় যে, আমরা ভিন্ন ফেডারেশন করব। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে আমরা একটি একমতের ইউনিয়নদের এক সভা ডাকি—সে সভায় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান (T. U. F. D) গঠন করা হয়। নূরুল হুদা সাহেব সভাপতি, আমি সাধারণ সম্পাদক এবং বদরুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। আমাদের সঙ্গে থাকে রেলওয়ে এম্‌প্লইজ, পোস্টাল এমপ্লইজ, টেলিগ্রাফ এম্‌প্লইজ, টেলিফোন এমপ্লইজ, দোকানদার কর্মচারী প্রভৃতি। অর্থাৎ আমরা নেতা হলাম "হোয়াইট কলার" শ্রমিকদের আর EPTUF মেহেনতী শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ও অফিস লেবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকল। এটা শ্রমিক স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর হলেও নেতৃবৃন্দের স্বার্থে সাময়িকভাবে আমরা ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করলাম।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে বার্মা ও সিলোন (শ্রীলঙ্কা) স্বাধীন হলো। বৃটিশ ভারতে আমরা একত্রে ছিলাম। ১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইনের পর বার্মা ভারত থেকে ভাগ হয়ে যায়, কিন্তু শ্রীলঙ্কা আমাদের সঙ্গেই ছিল স্বাধীনতা পর্যন্ত। বার্মা প্রথম থেকেই বৃটিশ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে এবং "কমনওয়েলথে" যোগ দিতে অস্বীকার করে। তার অবশ্যই অনেক কারণ ছিল। বার্মাবাসীদের উপর যে কেবল বৃটিশ-রাজই উৎপীড়ন চালিয়েছিল—তা নয়, ভারতীয় উপনিবেশবাদীরা বার্মাকে যথেষ্ট শোষণ করছিল। চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা কোন ক্ষেত্রেই বার্মার লোকদের স্থান ছিল না। তাদের সম্পদ সবাই মিলে লুট করেছে—আর তাদের রেখেছিল অনভিজ্ঞ, স্বপ্নচারী জাত করে। সব ব্যাপারেই তাদের অজ্ঞ করে রাখা হয়েছিল। অথচ তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চলছিল শোষকদের মুখে যে, তারা অলস প্রকৃতির লোক, স্ত্রীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিজেরা চুরুট খায়। যেমন নয়াচীন সরকার স্থাপিত হবার পূর্বে চীনাদের চন্ডুখোর, ডাকাত এবং খুনী বলে চিত্রিত করা হত। সিলোনেও ভারতীয় উপনিবেশবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। তবে সিলোনের লোকেরা ছিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত—এবং অনন্তকুমার স্বামীর সময় থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আগ্রহী।

এর কিছুদিন পরেই "ইসরাইল" প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইনে। বেলফুর ঘোষণার পর থেকেই ইহুদীদের জন্যে একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছিল প্যালেস্টাইনে। কিন্তু পরে বৃটিশ সরকার নানা দিক চিন্তা করে—হঠাৎ প্যালেস্টাইন থেকে নিজেদের শাসনব্যবস্থা তুলে নেয়—ফলে প্যালেস্টাইনে দেখা দেয় এক চরম অরাজকতা, আমার মনে হয় সে অরাজকতার তুলনা মেলে বৃটিশের একই উপায়ে সাইপ্রাস থেকে চলে যাবার পর সেখানে। প্যালেস্টাইনে হয় আরব-ইহুদী সংঘর্ষ—আর সাইপ্রাসে চলছিল গুণ্ডার রাজত্ব। তারপর প্যালেস্টাইনের সমস্যাটা জাতিসংঘে উপস্থিত করা হয়। আমেরিকা প্রথম ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় পরে মার্কিন সরকারও ঢিলে দিতে থাকে। তখন সোভিয়েট হঠাৎ ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে

লাগে—কি বুঝে তা আমার কোনদিনই বোধগম্য হয়নি। জাতিসংঘের প্রথম সেক্রেটারী ট্রিগভিলাই অবসর গ্রহণ করার পরে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারিতে "ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে" ঢাকা ও কলকাতা ছাত্রদের মধ্যে "ক্যাম্পের" নেতৃত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করল। ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে যারা কাজ করেছেন কি কর্মী কি ছাত্র তারা, ফজলুল কাদের ব্যবসার দিকে মন দেয়ার পর থেকে, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলো। এদিকে শামসুল হক সাহেবও ভাল সংগঠক এবং বেশ কয়েক বছর পূর্বেই ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে বড়দের সঙ্গে রাজনীতি করে তাঁর নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শামসুল হক সাহেব আর কর্মী নন, তিনি নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন ক্রমাগত। শামসুল হক ও শেখ মুজিব স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রিয়তায় বিশ্বাস করত না। লোকে কাউকে ভালোবাসলেই তার ডাকে সাড়া দেবে বা তার নেতৃত্ব মেনে নিবে এটা তারা মনে করতেন অস্বাভাবিক এবং জনসাধারণের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। তাদের মতে সব কিছুই সংগঠন করতে হয়। স্টেশনে অভ্যর্থনা কেউ করে না, যদি না সেখানকার কর্মীদের দিয়ে তার ব্যবস্থা করা যায়। সভায় লোক যোগাড় করা বা তাঁর বক্তৃতার সময় হাততালির ব্যবস্থা করা—সব কিছুর জন্যেই সে পূর্ব থেকে ব্যবস্থা করে রাখত। এমনকি, আমি যখন স্বাধীন বাংলার সমর্থন পাবার জন্যে নেত্রকোণার সভায় শামসুল হকের সঙ্গে গিয়েছিলাম ১৯৪৬ সনে তখন দেখেছিলাম বিভিন্ন স্টেশনে তাঁর জন্যে ফুলের মালার ব্যবস্থা এবং নেত্রকোণায় গিয়ে দেখলাম স্টেশনে কয়েক শ' ছাত্র আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে এসেছে এবং শ্লোগান দিচ্ছে "স্বাধীন বাংলা" জিন্দাবাদ। আমি অবাক হলাম—কারণ আমার ধারণা ছিল যে, সেখানকার লোকদের নিকট থেকে আমরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হব এবং আমি অনেক ইতিহাস ঘেঁটে আমাদের লক্ষ্যের সমর্থনে নানা যুক্তি স্থির করে এসেছিলাম—যার প্রয়োজনীয়তা সত্যিই ছিল না। সাধারণতঃ তিনি লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন—কিন্তু প্রয়োজন হলে নির্মম হতে পারতেন। ভবিষ্যতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এমন লোকের বিরুদ্ধে অন্য লোককে টেনে উপরে তুলতে দ্বিধা করতেন না—আর কোন কর্মী যদি ভুলেও আনুগত্য স্বীকার না করতো তবে তাকে ক্ষমার চোখে কোনদিন দেখেননি। অন্যদিকে তিনি যাঁকে নেতা বলে মানতেন তাঁর প্রতি তাঁর অনুগত্য থাকত অপরিসীম। আমি সেটা দেখেছি যখন তিনি ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কাজ করতেন—আবার দেখেছি যখন আবুল হাসিম সাহেবের সঙ্গে কাজ করতেন। নিজের উপর তাঁর ভীষণ বিশ্বাস ছিল এবং কাউকে তিনি তাঁর চেয়ে বড় বা বেশি বুদ্ধিমান মনে করতেন না। আমার মনে হয়, ঐসব গুণগুলো যেমন তাঁকে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আবার এগুলোর জন্যেই শেষ পর্যন্ত "মেগালোমেনিয়া" হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ জানে না। আমি তখন বিদেশে, ফিরে এসে তাঁর খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি। লোকমুখে শুনলাম যে, শেষের দিকে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে অবিভক্ত বাংলায় নেতৃবৃন্দকে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য করেছিল—তখন বুঝতে পারেনি মানুষের

শক্তি এবং ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থ হবার আগে তাঁর আদর্শ ছিল হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর (আসহাব) একটি পুস্তক যা—অনুচরদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে (আলকোরান) এমন স্ত্রী যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অর্থ সাহায্য করবে এবং তাঁকে অর্থের কথা ভাবতে হবে না বিবি খাদিজা (রাঃ) এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা অনুভূতি দ্বারা সমস্যার সমাধান (এলহাম)। শামসুল হক সাহেব যদি কোন ক্ষুদ্রতর রাজনৈতিক নেতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতেন তবে তাঁর যেসব গুণের সমন্বয় ছিল তাতে দেশের নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন।

তাঁর সঙ্গে যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে যাচ্ছিল তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব। শেখ সাহেব শামসুল হকের তুলনায় সে যুগে বেশি বাস্তবধর্মী ছিলেন—তিনি প্ল্যাটোর আকাশে তাকিয়ে থাকা প্রতিমূর্তি ছিলেন না—তিনি সেই যুবক বয়সেও এরিস্টটলের মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা প্রতিমূর্তির মত ছিলেন। সত্যি বলতে আমি এথেন্সে দু'টি মূর্তি যখন প্রথম দেখি ১৯৫৩ সনে তখন কেন যেন তাঁদের দু'জনার কথা আমার মনে হয়েছিল। আদর্শের চাইতে দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। শেখ সাহেব তত্ত্বের বা মতবাদ প্রচারের চেয়ে বাস্তব জীবনের সংগ্রামে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তাত্ত্বিক আলোচনায় সময় ব্যয় না করে কর্মরত থাকায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা দীপ্তি ছিল। কর্মীদের মধ্যে, ভবিষ্যতে যে তাঁর মুঠার মধ্যে আসতে বাধ্য সে বিশ্বাস জন্মাবার ক্ষমতা ছিল, যেসব কর্মীরা তাঁর সান্নিধ্যে যেত তাদের মনে একটা কল্পনার সুখী সমাজের স্বপ্ন সৃষ্টি করার শক্তি ছিল। এছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বে উঠার জন্যে অন্য যে সকল পন্থাসমূহ শামসুল হক সাহেব গ্রহণ করেছিলেন তাও ঢাকায় এসে তিনি রপ্ত করেছিলেন।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখে যখন ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের মাহুতটুলীর বাড়িতে রেডিও খরব শুনছিলাম তখন হঠাৎ একটা খরব "ফ্ল্যাস" করা হলো যে—গান্ধীজিকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। দুশ্চিন্তা হলো কোন মাথা খারাপ মুসলমান যুবক যদি এ কাজ করে থাকে তবে ভারতে ভীষণ মুসলমান-নিধন চলবে আর লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশে আসার চেষ্টা করবে। অনেকটা নিশ্চিত হলাম যখন ন'টার খবরে জানা গেল যে, তাঁকে হত্যা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘের এক যুবক—নাথুরাম গড্‌সে। আমরা কলকাতা আকাশবাণী স্টেশনে ধরলাম এবং ভারতের নেতৃবৃন্দের "শ্রদ্ধাঞ্জলী' শুনলাম। গভীর দুঃখের সঙ্গে একটি দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। হঠাৎ খবর পেলাম গান্ধীজির জন্যে ঢাকা রেডিও এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কয়েকজন মেয়ে 'আর্টিস্ট' স্টেশনে এনে তাদের গান শেষ হবার পরে রেডিও "পিকআপ" গাড়িতে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। গাড়ি চারজনের মধ্যে দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে যখন সোয়ারীঘাট থেকে আর দু'জনকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন গাড়ি থামিয়ে চারজন মাতাল ছুরি দেখিয়ে দু'টো মেয়েকেই গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে নদীর তীরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। মেয়েরা চীৎকার করে সাহায্য চাচ্ছিল, কিন্তু

যদিও অনেক লোক জমে গেল তবু কেউ সাহস করে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল না। আমি খবর পেয়ে মোগলটুলী অফিসে গিয়ে কর্মীদের নিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করার জন্যে গেলাম। পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়া হলো। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন তাদের একেবারে নদীর পারে নিয়ে গেছে—এবং তাদের কাপড়-জামা খুলে ফেলেছে। মেয়েরা মরণপণ করে ছুটতে চেষ্টা করছে। সমস্ত দেহ বিশেষ করে মুখ-বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লোক সাহস করে লাঠি, ইট-পাটকেল নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে এবং পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। যখন বিশ্ববাসীরা সবাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খবর শুনবার প্রতীক্ষায় তখন গুণ্ডার হাতে মেয়েদের এ লাঞ্ছনা বিশ্বাস করা ছিল অসম্ভব। তবু মাঝরাতে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল। গান্ধীজি কলকাতার মুসলমানদের জন্যে অনশন এবং জীবন শেষে পাকিস্তানের পাওনা টাকা দেবার জন্যে অনশন করে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে নতি স্বীকার করানোর পরে সে পাকিস্তানের মুসলমান গুণ্ডারা এতবড় পৈশাচিক কাণ্ড করে ফেলল—শত শত মানুষের সম্মুখে—এ লজ্জা ঢাকার কোন স্থান ছিল না আমাদের। সে রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখলাম গান্ধীজিকে—সেই আশ্রমে আমাদের ফোকলা দাঁত বের করে হেসে বলছেন, "ভবিষ্যৎ ইতিহাসই স্থির করবে যে, আমি কপট, মোনাফেক কি না। তোমাদের কথায়ই আমার নোয়াখালী যাওয়া বন্ধ হবে না—আমি যখন নোয়াখালী যাবার কথা স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম তখন বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হয়নি।" আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম অসন্তুষ্ট হয়ে অবজ্ঞা ভরে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে মনে হলো তাঁর জীবদ্দশার—তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়া আর হলো না। এ দুঃখ আমার বাকি জীবনে আমার বিবেককে দংশন করবে।

পরদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বোম্বে থেকে বিবৃতি দেখলাম, Weep weep India Weep : If you have tears shed them now".

এদিকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং হামিদুল হক চৌধুরী পরিষদ সদস্য ছিলেন না। ১৯৩৫ সনের আইনে তাঁরা ছ'মাসের বেশি মন্ত্রীসভায় থাকতে পারেন না। তাই প্রথম টাঙ্গাইল দক্ষিণ নির্বাচনী এলাকায় আসন খালি হওয়ায় তিনি সেখানে প্রার্থী হলেন। ঐ সময় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কিছুদিনের জন্যে কাগমারী এসেছিলেন সবাই ধরে তাঁকে প্রার্থী করে দিলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেব ভয় পেয়ে সেখান থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করলেন—ফলে মাওলানা সাহেব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিষদে নির্বাচিত হলেন। তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর কোন আকর্ষণ না থাকায় তিনি আসাম চলে যান। ওখানে যাবার কিছুদিন পরেই আসাম সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রাজবন্দী করে রাখে। এদিকে দু'মাসের মধ্যেও কোন নির্বাচনী হিসাব (Election Return) দাখিল না করার জন্যে ইলেকশন কমিশনার তাঁকে দু'বছরের জন্যে নির্বাচনে প্রার্থী হবার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে নামিজুদ্দীন সাহেব টাঙ্গাইলে নাম প্রত্যাহার করার পর ফরিদপুরের আহমদ আলী মৃধাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মনোনয়ন করে তাঁর আসন

খালি ঘোষণা করান—কিন্তু সেখানেও বিপদ এল—কর্মীরা সব সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তাই তিনি আর ওখানে না দাঁড়িয়ে হামিদুল হক সাহেবকে প্রার্থী করলেন—কিন্তু হামিদুল হক সাহেব সে নির্বাচন কেন্দ্রে গেলে এমন বিক্ষোভ দেখাল ছেলেরা যে, হামিদুল হক আর প্রার্থী হতে সাহস পেলেন না।

এর পর খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব অধ্যক্ষ ইব্রাহীম সাহেবকে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান করে তাঁর ভূয়াপুর আসন খালি করে সেখানে যে প্রার্থী তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন রিটার্নিং অফিসার তাঁর দরখাস্ত নাকচ করে দেন কি একটা টেকনিক্যাল ভুলের জন্যে। ফলে নাজিমুদ্দীন সাহেব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেব্রুয়ারি মাসেই পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কিন্তু তখনো হামিদুল হকের জন্যে কোন আসন পাওয়া গেল না। এদিকে ছ'মাস পার হয়ে যাচ্ছে। গভর্ণর-জেনারেল জিন্নাহ্ সাহেবকে বলে-কয়ে ১৯৩৫ সনে আইনের ঐ বিশেষ ধারা অর্ডিন্যান্স পাস করে সংশোধন করে ছ'মাসের জায়গায় ন'মাস করে নিলেন। কিন্তু তবু তাঁর আসনের যোগাড় হলো না। শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীন ফজলুর রহমান সাহেবকে ধরলেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসনের পদে ইস্তফা দিতে। ফজলুর রহমান সাহেব রাজী হলেন না। নাজিমুদ্দীন সাহেব জিন্নাহ্ সাহেবকে ধরলেন এবং জিন্নাহ্র আদেশে ফজলুর রহমান সাহেব ঐ আসন থেকে পদত্যাগ করেন আর হামিদুল হক সেই আসন থেকে নির্বাচিত হন ১৯৪৮ সনের মে মাসে।

১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ঢাকায় আগমন করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের অতিথি হন। তাঁর সঙ্গে দু'দেশের বাস্তুহারাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি নাজিমুদ্দীন সাহেবকে বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়াবে। দুই বাংলারই অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে বিরাট সংখ্যক বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করতে। তিনি স্থির করেছেন যে, তিনি উভয় বঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে চেষ্টা করবেন। সন্ধ্যায় এডভোকেট আলী আমজাদ খান সাহেবের বাসায় শান্তি মিশনের কাজ কিভাবে চলবে তা বিশদভাবে কর্মীদের বুঝিয়ে দেন। অনেক পরিষদ সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন—তিনি পরিষ্কারভাবে তাদের বলেন যে, গান্ধীজি তাঁকে বাংলাদেশে তাঁর অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন—যতদিন না উভয় বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সরকারের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। শহীদ সাহেব কলকাতা ফিরে যাবার কিছুদিন পরেই জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। শহীদ সাহেব জিন্নাহ্ সাহেবকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যে কাজের ভার নিয়েছেন তা ছেড়ে তখন তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁর মতে তিনি পুনর্বাসনের কাজ বাইরে থেকে যতটা করতে পারবেন মন্ত্রী হয়ে তা পারবেন না।

মার্চ মাসের ২রা তারিখে প্রফেসর আবুল কাসেম সাহেব আমাকে খবর দিলেন যে, সেদিন ফজলুল হক হলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও কোর্টকাচারীর ভাষা কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে আমি যেন সে সভায় যোগদান করি। আমি

বিকেলে সেখানে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছুসংখ্যক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্যে অনুরোধ করা হয়। তারপরে সভার কাজ আরম্ভ হয়। একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা এবং শিক্ষার বাহন বা কোর্ট-কাচারীতে বাংলা ভাষা ব্যবহার-এর দাবী না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্যে দাবী করাই যুক্তিসঙ্গত বলে স্থির করা হলো। নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে দু'জন গণ-আজাদী লীগ থেকে, দু'জন গণতান্ত্রিক যুবলীগ থেকে, দু'জন তমদ্দুন মজলিস থেকে আর সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ও ফজলু হক মুসলিম হল হতে চারজন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দু'জন প্রতিনিধি ছাড়াও "ইনসাফ্", "জিন্দেগী" ও "দেশের দাবীর" পক্ষ থেকে তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে ঐ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে ৭ই মার্চ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও ১১ই মার্চ বাংলার প্রতিটি স্থানে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়। অনেক আলোচনার পর দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিষদ সদস্য ও হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি সংগ্রাম পরিষদে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটাতে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৫২ সনে যেটা সম্ভব ছিল সেটা ১৯৪৮ সনে সম্ভব ছিল না। যে কোন আন্দোলনে ট্যাক্টিক্সের প্রশ্নটা সর্বপ্রথম বিবেচ্য। আন্দোলন ধাপে ধাপে এগোয় এবং যে কোন আন্দোলন করার পূর্বে জনগণের মানসিকতার কথা ভুলে গেলে আন্দোলনে সফলতা লাভ হয় না—বরঞ্চ আন্দোলনের উপর যে আঘাত আসে তাতে অন্তত সাময়িকভাবে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সংগ্রাম পরিষদ অনেকগুলো সাব-কমিটি করে দেন এবং সেখানে সকলের সাহায্যই নিতে বলা হয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের সকল প্রতিনিধিদের সভা আবার ১০ই মার্চ বসে এবং সেখানে মোটামুটিভাবে কি কি করা হয়েছে—এবং পরের দিন কি করা হবে তা স্থির করা হয়। এটা স্থির হয় যে, অফিস-আদালতেও পিকেটিং চালাতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কর্মীদের নিয়ে সেক্রেটারিয়েট গেটে পিকেটিং করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমার অনুরোধ ছিল তাঁর কাছে যে, তিনি নিজে পিকেটিং না করে সংগঠনের কাজ হাতে নিলে ভাল হয়—কারণ কলকাতা থেকে যেসব ছাত্ররা এসেছিলেন তাদের সবার কর্ম-ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। পরিচালনার ভার নিলে তিনি সঠিক কর্মী সঠিক স্থানে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মত ছিল ভিন্ন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি নিজে নেতৃত্ব না দিলে কর্মীরা সাহস হারিয়ে ফেলতে পারে। সেও হয়ত সত্য। তাঁর আর আমার মধ্যে ঐ পার্থক্যটা বরাবরই ছিল যে কারণে তাঁর মতে আমি ছিলাম, "আরম্ চেয়ার পলিটিশিয়ান।" পরদিন নেতৃস্থানীয় যাঁরা গ্রেফতার হলেন তাঁরা সর্বজনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলী আহাদ এবং আরো অনেক কর্মীও গ্রেফতার হয়—লাঠিচার্জের ফলে বহু ছাত্র ও কর্মী আহত হয়। আন্দোলন চলতে থাকে। আমার এখনো ধারণা নেতারা প্রথমদিনে গ্রেফতার না হয়ে পরিচালনার দায়িত্ব নিলে—আন্দোলন আরো জোরদার হতো।

১১ই মার্চের পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৩ই মার্চ সরকার কলকাতার সকল খবরের কাগজ আটক করে এবং সেসব

সংবাদপত্রসমূহ পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। আন্দোলন প্রতিদিনই দানা বাঁধতে লাগল।

এর পর স্থির হয় যে, ১৫ই মার্চের ধর্মঘটকে বিশেষ করে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে—কারণ সেদিন পরিষদের অধিবেশন বসবে। যাঁরা পরিচালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন এবং ডাক্তার করিম উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা শহরে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে পুরনো শহরে আসা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। ঢাকার সর্দার ও সাধারণ লোক পাকিস্তান হবার পরেই এ আন্দোলনকে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফজলুল হক বা সলিমুল্লাহ্ হল থেকে আমার বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যেত। এবং প্রতিদিনই বাসায় এসে শুনতাম যে, হয় সর্দার সাহেব বা ঢাকা ক্লাবস্ কমিটির লোকেরা আমাকে খুঁজে গেছে। ১২ তারিখে তাদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হলে আমি তাদের বলি যে, "পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন—কারণ আপনাদের ধারণা ছিল যে, আমি ঢাকার লোকের কোন ক্ষতি করতে পারি না। আজো আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনাদের ক্ষতি হয় সে কাজ আমি কোনদিনই করব না বা কাউকে করতে দেব না।" কেউ কেউ আমার আশ্বাসবাণী সরলভাবে গ্রহণ করল—আবার অনেকের মনে সন্দেহ থেকে গেল। আমি তাদের বললাম যে, ১৩ তারিখে তাদের সন্দেহের নিরশন হবে। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় তারা এলো আমার বাসায়। আমি তাদের প্রথমে বললাম যে, "বিগত ছ'মাস ধরে কি দেখছেন আপনারা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ্ বিহারের লোক—তিনি যে কেবল এক একজন মোহাজেরকে দু'টো-তিনটে করে হিন্দু বাড়ি বণ্টন করেছেন তা নয়, যত রেশনসপ নতুন হয়েছে তাদের মধ্যে বণ্টন হয়েছে, হিন্দুর যত বন্দুক বাজেয়াপ্ত হয়েছে সবই বণ্টন হয়েছে বিহারীদের মধ্যে, যত ট্যাক্সি লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সবই বিহারীরা পেয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশ্নার, সবগুলি সেক্রেটারী অবাঙালী সুতরাং তাদের কাছ থেকে সুবিচার পাবার আশা করা বাতুলতা। মোহাজেরদের ছেলে-মেয়েদের জন্য সরকার স্কুল করে দিচ্ছে। বিহার থেকে যত লোক আসছে তারা একটু লেখাপড়া জানলেই রেল বিভাগে চাকুরী পেয়ে যাচ্ছে—কারণ তারা সবাই বলছে যে, তারা কেউ ছিল স্টেশন মাস্টার, কেউবা ক্রু, কেউবা গার্ড। হিন্দুস্থান থেকে তারা কিছুই আনতে পারেনি—সুতরাং শেষ বেতনের সার্টিফিকেটও ফেলে এসেছে। আমাদের হিসেবে ভারত থেকে সর্বশুদ্ধ ১৪ হাজার লোক রেলের চাকুরীতে আসবে—এবং এখানকার সমসংখ্যক হিন্দু রেল কর্মচারী ভারতে চলে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে ৪৩ হাজার লোক এসে দাবী করছে যে, তারা সবাই ভারতে রেলগাড়িতে চাকুরী করত। এসব দেখেও বুঝতে পারছেন না আপনারা যে, একদিন তাদের চাপে শহর ছাড়তে বাধ্য হবেন। কারণ তাদের দাবী হলো যে, পাকিস্তানের জন্যে তারাই কেবল জীবন দান করেছে।" দু'-চারটি প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হলো। মনে হলো তারা সব শুনে হতভম্ভ হয়ে গেছে। তারা যা চোখে দেখেছে তার সারমর্মও তারা বুঝতে

পারেনি। তাদের বোধহয় বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করলেই এদের প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে। এর সঙ্গে যুক্ত বাংলার কোন সম্পর্ক নেই।

এর ফলে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। সেন্ট্রাল ক্লাবস্ কমিটির সেক্রেটারী শামসুল হুদা এক "লিফ্‌লেট' ছাপিয়ে দিল যে, আমি বলেছি যে, শিক্ষার বাহনই বাংলা হবে—রাষ্ট্রভাষা হবে বলে আমি তাঁদের সভায় কিছু বলিনি। ঐ লিফ্‌লেটের একটা কপি নিয়ে বাহাউদ্দীন চৌধুরী আমার বাসায় এসে উপস্থিত। আমি লিফলেট পড়ে দেখলাম ওটার বিরুদ্ধে আমার নিজের নামে একটা লিফ্‌লেট না দিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাই করা হলো এবং বিকেলের মধ্যেই বলিয়াদী প্রেস থেকে আমার সহিতে ঐ লিফ্‌লেটের বিরুদ্ধে অন্য লিফ্‌লেট ছেড়ে দেয়া হলো। ওটার জন্যে আমি বলিয়াদী প্রেসের ব লা ডাক্তারের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলাম। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া অত তাড়াতাড়ি আমার দস্তখতযুক্ত লিফ্‌লেট বের করা সম্ভব হতো না—যার ফলে হয়ত আন্দোলনের ক্ষতি হতো।

১৪ তারিখে অনেক রাতে ফিরে আসি। সুতরাং সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠেই শুনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও খাজা নসরুল্লাহ্ আমার স্যাঁতস্যেতে চেম্বারে বসে আছেন ভোর থেকেই। আমি নিচে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তাঁরা খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের দূত হিসেবে এসেছেন একটা মিটমাট করার জন্যে। কারণ জিন্নাহ্ সাহেব আসবেন ১৯ তারিখে। তার পূর্বেই তিনি মোটামুটিভাবে একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান। আমি বললাম যে, আমি ফজলুল হক হলে যাচ্ছি নেতারা যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করি—যদি মিটমাট সম্ভব হয় তবে বারোটার পূর্বেই আমরা খাজা সাহেবের বাড়ি যাব আর যদি না যাই তবে যেন বুঝে নেন যে, নেতারা মিটমাটের বিরুদ্ধে। আমি তাঁদের বিদায় করে আমার ছোট টাইপ-রাইটার নিয়ে বসে দাবীগুলি লিখে ফেললাম। তারপর গোসল করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফজলুল হক হলে তোহা সাহেবের ঘরে তাজউদ্দীন সাহেবকে পেলাম—একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কাসেম সাহেবকে ডাকতে ও সংগ্রাম পরিষদের যাঁদের পাওয়া যায় তাঁদের খবর দিতে। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই এলেন তখন আমি নাজিমুদ্দীন সাহেবের মিটমাটের ইচ্ছের কথা বললাম—এবং মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে কি কি কথাবার্তা হয়েছে তাও বললাম। কাসেম সাহেব বললেন যে, আমরা আন্দোলনের জন্যেই আন্দোলন করছি না—আমরা আমাদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আলাপ করতে রাজী আছি। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কথাও তাই—একমাত্র তোহা সাহেব বললেন, আন্দোলন ক্রমাগতই জোরদার হচ্ছে—এমনি সময় আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীদের উপর সুবিচার করা হবে না—কারণ আন্দোলন এখন কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়—সব মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জের কর্মীরা সেদিন আসবে। অনেক আলোচনার পর দাবী-দাওয়ার উপর আমি যে ড্রাফ্‌ট করেছিলাম সেটা উপস্থিত করি। এবার তোহা সাহেব ও তাজউদ্দীন সাহেব রাজী হলেন অবশ্য কিছু রদবদল করে। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল অতসব দাবী সরকার মেনে নেবে না—সুতরাং ফয়সালাও হবে না। মাঝখান থেকে

নাজিমুদ্দীন সাহেব আর বলতে পারবেন না যে, আমরা পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্যে এবং যুক্ত বাংলার জন্যে আন্দোলন করছিলাম।

আমরা বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বর্ধমান হাউসে গেলাম। নাজিমুদ্দীন সাহেবের সেক্রেটারী এস. এন. বাকের, আই. সি. এস. আমাদের তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন এবং খাজা সাহেবকে খবর দিলেন। খাজা সাহেব নীচে নেমে এলে আমরা তাঁর ঘরে গেলাম। খাজা সাহেব কিছুক্ষণ ভূমিকা করে বললেন যে, তিনি বাংলার বিরুদ্ধে না। তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে বাংলা ভাষার জন্যে যে তাঁর দরদ আছে তা জানাবেন। আমরা বললাম, আমাদের দাবীগুলো যদি তিনি মেনে নেন তবে আমরা আন্দোলন বন্ধ করতে রাজী আছি—তবে তা কার্যকরী হবে যদি যাঁরা আজ বাংলা ভাষার জন্যে ঢাকা জেলে বন্দী হয়ে আছেন তাঁদের যদি মত হয়। খাজা সাহেবের কাছে আমাদের দাবীগুলো উপস্থিত করা হলে—তাঁর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তিনি বললেন,—এসব দাবী মেনে নিলে পাকিস্তান থাকবে না। আমরাও বললাম, দাবীগুলো যদি আপনি না মেনে নেন তবে আমরা বিদায় হই। তিনি আমাদের বসিয়ে রেখে বাকেরের ঘরে গিয়ে আজিজ আহমেদের সঙ্গে টেলিফোনে দাবীর কথা বলে তাঁকে আসতে বললেন। আজিজ আহমেদ বোধহয় রাজী হননি। আবার আমাদের চা খাওয়াতে বলে তিনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—দশ মিনিটের মধ্যে তিনি ফিরবেন। আমরা বুঝলাম চীফ্ মিনিস্টার, চীফ্ সেক্রেটারীর বাড়ি যাচ্ছেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি এলেন—এবং বললেন যে, তিনটি ব্যাপারে তাঁর আপত্তি আছে। একটি হচ্ছে—সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে, তবে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের ছাড়া যাবে না। দ্বিতীয়, পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশন না বসিয়ে তাদের বিরুদ্ধে "ডিপার্টমেন্টাল ইন্‌কোয়েরী" করা হবে আর যেসব কলকাতার খবরের কাগজ পাকিস্তান-বিরোধী সেগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে না। আমরা বললাম, আমাদের দাবী নিম্নতম—এর মধ্যে কোন রদবদল হবে না। তিনি যেন মনে হলো রাজী হবেন চুক্তিপত্রে সই করতে তখন তোহা সাহেব বললেন যে, চুক্তিপত্রে যা লেখা আছে তাছাড়াও তাঁকে লিখে দিতে হবে যে, তিনি দেশবাসীর নিকট যেসব অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন। তোহা সাহেব আলোচনা ভেঙ্গে দেবার জন্যে শেষ বান নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু খাজা সাহেব তখন ভেঙ্গে পড়েছেন—সুতরাং তাও মেনে নিলেন। চুক্তিপত্রে আমি ও খাজা সাহেব সই করলাম। পূর্বের কথা মত আমরা জেলখানায় গেলাম। জেলার বললেন, 'আপনাদের ভেতরে যেতে দেয়া হবে না—এক একজন করে ডেকে দেব কারণ ওটা জেল-গাইডে বারণ করা রয়েছে।' আমি জেলারের ঘর থেকে খাজা সাহেবকে টেলিফোন করলাম, ধরলেন এস. এন. বাকের। তাঁকে বললাম যে, জেলার যা বলছেন তাতে চুক্তি বাতিল করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। বাকের গেলেন মুখ্যমন্ত্রীকে খবর দিতে—কিছুক্ষণ পরে বাকের আমাকে টেলিফোন জেলারকে দিতে বললেন—আমি জেলারের হাতে "রিসিভার" দিলাম। কিছুক্ষণ কি কথা হলো তারপর জেলার বললেন—'আপনারা ভেতরে যেতে পারেন' এ বলে সুবেদারকে পাঠালেন আমাদের দোতলায় নিয়ে যেতে।

এদিকে আমাকে ঢুকতে দেখে শওকাত আলী সাহেব ভেবেছেন আমাকে বুঝি পুলিশ গ্রেফতার করে এনেছেন—তাঁর কি স্ফূর্তি—আমার কাছে এসেই শ্লোগান দিলেন—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ভারি ভাল লাগল। দোতালায় দিয়ে দেখলাম সবাই সেখানে আছেন। ছোটোখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম—তারপর চুক্তির কথা বললাম তাঁরা রাজী হলেন। আমরা খাজা সাহেবকে জানিয়ে দিলাম। সব ঠিক আছে—তবে রাজবন্দীদের তক্ষুণি ছেড়ে না দিলে সেদিনের বিক্ষোভ থামানো যাবে না। খাজা সাহেব বললেন তখনই ছেড়ে দেয়া হবে। প্রফেসর আবুল কাসেম চেষ্টা করতে লাগলেন বিক্ষোভকারীদের ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ও-কাজটার জন্যে প্রয়োজন "মাইক ফিটিং" গলার আওয়াজ যেটা কাসেম সাহেবের ছিল না। শেখ সাহেব বা শামসুল হক সাহেবের অনুপস্থিতির অসুবিধাটা বোঝা গেল।

আমার ১৬ তারিখে সিরাজগঞ্জে কলেজে বক্তৃতা দেবার কথা—তাই আমি চুক্তি হবার পরেই বাসায় ফিরে কাপড় ছেড়ে সিরাজগঞ্জ রওনা হয়ে যাই। সিরাজগঞ্জ নেমে দেখি ডাক্তার জসিমুদ্দীন ও বেশ কিছু ছাত্র স্টেশনে উপস্থিত। আমি জসিমুদ্দীনের সঙ্গে কলেজে আসার আগে তাঁর ওখানে চা খেলাম। আবদুল্লাহ-হিল-মাহ্‌মুদ কলকাতায় আমাদের প্রথম ডেপুটি হাই কমিশনার তখন সিরাজগঞ্জে। রাতে তাঁর ওখানে খাবার জন্যে দাওয়াৎ গ্রহণ করলাম। দুপুরে ঐ কলেজে বক্তৃতা করার সময় একটি ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষের ছাত্রী আমাকে তাদের বাড়িতে খাবার জন্যে দাওয়াৎ করলে আমি বললাম যে, বিকেলে তাদের বাড়ি চা খাব, দুপুরে হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গেই খাব। বক্তৃতা হলো ঘণ্টাখানেক। অনেক সমস্যার উপর আলোচনা হলো। পরে বুঝলাম যে, আবদুল্লাহ হিল-মাহ্‌মুদের দাওয়াৎ গ্রহণ করায় ছেলেরা একটু বিব্রত হয়েছে। কারণ তাদের ধারণা যে, দুর্ভিক্ষের সময় সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসাবে অনেক টাকা করে যে বাড়ি বানিয়েছে সে বাড়িতে আমার খাওয়া উচিত নয়। যাক, বিকেলে সে মেয়েটি অর্থাৎ আমিনা (পরবর্তীকালে আমার ছাত্র বাহাউদ্দীন চৌধুরীর স্ত্রী মীনা চৌধুরী) তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তার পিতা সিরাজগঞ্জে ওকালতি করতেন। মীনার ওখান থেকে আমার বন্ধু সৈয়দ আকবর আলীর বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি আর এক-দফা চা খাই—তারপর ঢাকার পথে রওনা হই। ১৮ তারিখে ঢাকায় ফিরে শুনলাম যে, চুক্তিপত্র দু'পক্ষের একপক্ষও ঠিক প্রতিপালন করেননি। খাজা সাহেব পুরো চুক্তিপত্র পরিষদে উপস্থিত করেননি—আন্দোলনের নেতারাও ঐ সুযোগে যাঁর যাঁর দলের বা নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ১৮ তারিখেও গোলমাল করেছেন। আর খাজা সাহেব আমাকে হন্নে হয়ে খুঁজেছেন।

১৯শে মার্চ জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকায় এলেন। বিমানবন্দরে বিরাট অভ্যর্থনা হলো। কারণ জিন্নাহ্ সাহেব যদিও ১৯৩৬ সনে ঢাকা এসেছিলেন, কিন্তু তখন ঢাকার সাধারণ লোক তাঁকে দেখেনি—এমনকি, নামও শোনেনি। পাকিস্তান হবার পর এই তাঁর ঢাকায় প্রথম আগমন। সুতরাং হাজার হাজার লোক বিমানবন্দরে এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তিনি রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বক্তৃতা করেন। উর্দু যে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে সে কথা উল্লেখ করলে ছাত্ররা সভা ত্যাগ করে—তবে সেটা

দেখা যেত না যদি না তখনই "মাইক ফেল" করত এবং অনেক লোক কিছু শুনতে না পেয়ে সভা ত্যাগ করতে থাকত। এতে আমাদের সুবিধা হলো যদিও ঘটনাটা "ঝড়ে কাক মরল ফকিরের কেরামতি বাড়ল" ঐ বহুদিনের পুরনো প্রবাদটি সত্য বলে প্রমাণিত করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও তিনি একই কথা বললেন। তখন কনভোকেশন হলেই নইমুদ্দীন এবং আরো কয়েকজন "না" "না" করে উঠল।

২৪শে মার্চ কমিটি অব একশনের সঙ্গে জিন্নাহ্ আলোচনা করবেন বলে আজিজ আহমেদ সাহেব খবর দিলেন। আমার কাজ ছিল মেমোরেন্ডাম ড্রাফট্ করা। সেটা করা হলো—এবং সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো—তাঁদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রদবদল করা হলো। পরে ভাল কাগজে ওটাকে পাইপ করা হলো। সরকার জানালেন বসার ঘর ছোট বলে আমরা যেন সাতজনের বেশি না যাই—আমরা আপত্তি করলাম যে, ওভাবে সংখ্যা বেঁধে দিলে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। আজিজ আহ্মদ সাহেব বললেন ঠিক সাতজন না হতে পারে—তবে যত কমসংখ্যা হয় তাই যেন আমরা চেষ্টা করি। তাছাড়া আরো জানান হলো যে, গভর্ণর-জেনারেল সাহেব অসুস্থ। যাক, আমরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত দশ-বারোজন গিয়েছিলাম। পরবর্তী ঘটনা অন্যান্য বইতে এর আগেই লিপিবদ্ধ হয়েছে (লেখকের : A Socio-Political History of Bengal দ্রষ্টব্য।) জিন্নাহ্ সাহেবের নিকট মেমোরেন্ডামটা আমরা দিলে তিনি ওটা পেগ টেবিলের উপর রাখলেন। অসুস্থ মনে হলো। খিট্খিটে মনে হলো—আর মনে হলো যে, তিনি ঐ রকম স্বাস্থ্য নিয়ে একটার পর একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন—আর কথার সময় হাত নাড়াচ্ছেন অনেকবার। আমার যেন কেন মনে হলো যে, তাঁর যুক্তিকে ফলপ্রসূ করার জন্যে সুন্দর হাতের আঙুলগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিলেন।

আমাদের এসব আন্দোলন নতুন শহরে অর্থাৎ রমনা, লালবাগ ও তেজগাঁ থানাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোতোয়ালী, সুত্রাপুর থানায় আমরা শহরবাসীকে নিরপেক্ষ করতে পারলেও দলে টানতে পারিনি। তাই ঢাকা শহরে জনসভা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সনের ৭ই ডিসেম্বরে সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ পার্কে শেরেবাংলার জনসভা করার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আমরা আর জনসভা ডাকতে চেষ্টা করিনি। শেরেবাংলার সে সভা থেকে তাঁবু ভো দূরের কথা—একখানা চেয়ারও আগুন থেকে কাদের সর্দার সাহেবের লোকেরা রক্ষা করতে পারেনি। ফজলুল হক সাহেবকে কোন রকমে অক্ষত অবস্থায় এক হাজার গজ দূরে কাদের সর্দার সাহেবের বাড়ি পৌছান সম্ভব হয়েছিল।

চারদিকে আট্ঘাট না বেঁধে আর জনসভা করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাদের এক সুবর্ণসুযোগ এসে উপস্থিত হলো ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসের বাজেট অধিবেশনের ফলে। বিক্রয় করের (Sales Tax) হার সাধারণ ব্যবসায়ীর উপর এসে পড়ায় চকবাজার, ইসলামপুর, বাবুর বাজার, মোগলটুলী প্রভৃতি এলাকার ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবার তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ এল জনসভা করার জন্যে। এ সময় সাখাওয়াৎ হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি। তিনি আর চকবাজারের ফজলুল হক সাহেব এলেন আরমানিটোলা ময়দানে সভার ব্যবস্থা করতে। তাঁরা

নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব নিলেন। সভা ডাকা হলো। ইতিমধ্যে মোহন মিঞা ও সাহেবে আলম সাহেব নিশ্চিত বসে নেই—তাঁরা বাদামতলির গুণ্ডার সর্দারকে টাকা দিলেন কয়েক হাজার সভা ভেঙ্গে দেবার জন্যে।

সভার দিন এক অপূর্ব কাণ্ড ঘটে গেল। বাদামতলির বাদশাহ একগাদা টাকার নোট ছড়িয়ে দিল সভায় এবং ঘোষণা করল যে, ঐ টাকা তাকে দিয়েছে মোহন মিঞা ও কালু মিঞা মিটিং ভাঙ্গার জন্যে। পরে বুঝেছিল সে যে, ঢাকার মানুষের ক্ষতি করার জন্যেই তাঁরা ঐ টাকা দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে বাদশাহ মিঞা জনগণের পক্ষে চলে এল। সভায় প্রায় দশ হাজার লোক হয়েছিল। শামসুল হক দীর্ঘতম বক্তৃতা করেছিলেন। আমার বক্তৃতা স্বাভাবিকভাবেই খুবই ছোট হয়েছিল।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি শহীদ সাহেব ঢাকা এলেন তাঁর শান্তি মিশন নিয়ে। করোনেশন (সদরঘাট) পার্কে সভা হলো—এবারে উঠলেন খাজা নসরুল্লাহ্‌র বাড়িতে। বক্তৃতা হচ্ছে তখন শাহ্ আজিজুর রহমান সাহেবের দলের ইব্রাহিম নামে একটি ছেলে ছুরি নিয়ে রেলিং-এর উপর দিয়ে শহীদ সাহেবের পেছনে লাফিয়ে পড়ল। ভাগ্য ভাল আমাদের কর্মীরা সেখানে থাকায় শহীদ সাহেবের জীবন সে যাত্রা রক্ষা পেল। এপ্রিল মাসেই মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে পাকিস্তান হবার পর শহীদ সাহেবের প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁদের মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে খাজা নসরুল্লাহ্‌র দিলকুশা বাড়ির বারান্দায় অনেক আলোচনা হলো। আমাদের বললেন যে, পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ সভাপতি মিঞা ইফ্‌তেখারউদ্দীন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি মানকি শরীফ-এর পীর সাহেবকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করে তাঁরা কবে আসতে পারবেন সেটা জেনে যেন শহীদ সাহেবকে জানানো হয়। তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হলো এবং দু'জনেই মে মাসের মাঝামাঝি পূর্ববঙ্গে আসতে রাজী হলেন। ইফ্‌তেখারউদ্দীন সাহেব এর পূর্বে যখন ঢাকায় এসেছেন তখনই তিনি তাঁর শ্যালিকার স্বামী ওয়াজির আলী শেখ, আই. সি. এস-এর বাড়িতে থাকতেন। মে মাসের মাঝামাঝি খবর নিয়ে জানলাম যে, ওয়াজির আলী সাহেব তাঁর কোন খবরই জানেন না। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু ইফ্‌তেখারউদ্দীন সাহেব এলেন আমাদের তার করে। লিখেছিলেন যে, আমরা যদি "সার্কিট হাউসে" জায়গা না পাই তবে যেন অন্যত্র থাকার এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করি। সত্যিই সার্কিট হাউসে জায়গা পাওয়া গেল না—সুতরাং বলিয়াদীর জমিদার চৌধুরী লাবিবউদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবকে বললাম। তিনি তাঁর গাড়ি দিতে ও থাকার ব্যবস্থা তাঁর বাড়িতেই করতে রাজী হলেন। লাবু সৌখিন লোক ছিলেন—সিগারেটও তাঁর "মনোগ্রাম" বিলেতের উইলস্ কোম্পানি থেকে তৈরি করে আনতেন। গাড়ি ছিল একাধিক। শহীদ সাহেবও এসে পৌঁছলেন। মিঞা ইফ্‌তেখার ও শহীদ সাহেব খাজা নসরুল্লাহ্‌র বাড়িতে আলোচনায় স্থির হলো যে, মুসলিম লীগ দখলের প্রচেষ্টাই প্রথমে চালানো দরকার। কারণ তা নইলে লোকে বলতে পারে যে, নেতারা পকেট লীগকে জনসাধারণের লীগে পরিণত করার চেষ্টা না করেই নাজুক সময়ে বিরোধীদলের সৃষ্টি করেছে। শহীদ সাহেব, খয়রাত হুসেন, আলী আহমদ খান ও আনোয়ারা খাতুন তিনজন বিরোধীদলের পরিষদ সদস্য-সদস্যাকে প্রথমে আক্রাম খাঁকে

রশীদ বই দিতে অস্বীকার করেন। ফলে করাচী যাওয়াই স্থির হলো। খয়রাত হুসেন টাকা-পয়সার অভাবের অজুহাত দিলেন—আলী আহমদ খান সাহেব বাড়ির কাজে আটকা পড়ায় আতাউর রহমান খান এবং আনোয়ারা খাতুন দু'জনেই করাচী গেলেন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মিঞা ইফ্‌তেখারউদ্দীন সাহেব পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে মানকি শরীফের পীর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে চৌধুরী সাহেবকে মাওলানা ভাসানী সাহেবের মতামত জানিয়েছিলেন। তাঁরা তিনজনেই তিনটি প্রদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। আতাউর রহমান সাহেব ও আনোয়ারা খাতুনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে খালিকুজ্জামান তাই প্রস্তুত হয়েছিলেন। ভণিতার দরকার হয়নি। চৌধুরী সাহেব তাঁদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (All India Muslim League) ছিল সংগ্রামের জন্যে—তাই এখন সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে সরকারের সকল কাজকে সমর্থন করার জন্যই কেবল একটি নতুন পার্টির দরকার। দুনিয়াকে দেখাবার জন্যে সরকারের পেছনে জনসমর্থন রয়েছে এবং সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকার। জিন্নাহ্ সাহেব সরকারে যোগ না দিলে এটার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি জাতির পিতা এবং স্রষ্টা সুতরাং লোকে ভাবতে পারে তাঁর কথাই বেদবাক্য (Gospel truth) বলে দেশের জনসাধারণ মেনে নেয়। তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই। আমরা সেসব লোককে দিয়েই পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠন করব যাঁরা সরকারের সকল কার্যকেই সমর্থন করবে। আতাউর রহমান সাহেব এবং আনোয়ারা খাতুন বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে স্যার জাফরুল্লাহ্ পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে পড়ায় সার জাফরুল্লাহ্‌কে নিউইয়র্কেই সর্বসময়ে থাকতে হচ্ছিল। এই সময় জিন্নাহ্ সাহেব আবার শহীদ সাহেবকে জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূতের (কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর র‍্যাঙ্ক নিয়ে) পদটি গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু শহীদ সাহেবের নিকট ঐ অনুরোধ গ্রহণযোগ্য হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুর রহমান সাহেবের পরিত্যক্ত আসন থেকে হামিদুল হক চৌধুরী পরিষদ সদস্য হয়ে গেছেন এবং মন্ত্রিত্বের আসনে আরো শক্ত করে বসেছেন। তাই এবার তিনি শহীদ সাহেবের বাংলাদেশে বার বার আসা বন্ধ করার জন্যে খাজা সাহেবকে উপদেশ দিলেন। এদিকে মানিকগঞ্জ থেকে শহীদ সাহেবকে শান্তি কমিটির এক সভায় নিমন্ত্রণ করা হলো এবং তিনিও রাজী হলেন। মানিকগঞ্জে জুন মাসের ৪ তারিখের সভায় যোগ দেবার জন্যে ঢাকায় ৩ তারিখে সকালে এসে পৌঁছেলেন বিমানবন্দরে। আমরা কয়েকজন ছাড়া বিমানবন্দরে কেউ নেই। নসরুল্লাহ্ সাহেবকে তার করে এসেছেন—অথচ গাড়ি আসেনি। বিমানবন্দর থেকে টেলিফোন করলাম নসরুল্লাহ্‌কে। তিনি বললেন যে, তাঁর বাড়ি অনেক অতিথি আছে—সুতরাং তাঁর বাসায় জায়গা হবে না। কথাটা যেন শহীদ সাহেব বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, 'আমি কথা বলব'—আমরা বললাম, 'সেটা কি ভাল হবে ?' কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়। স্থির হলো আনোয়ারা খাতুনের বাড়িই যাবেন। আমি আমজাদ খান সাহেবের জয়নাগ রোডের বাড়িতে গেলাম। তাঁরাও জায়গা দিতে রাজি হলেন না। অগত্যা আমি ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাড়ি গেলাম। শাহজাহান সাহেব বাড়ি

নেই—তাঁর স্ত্রী নূরজাহান তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম যে, তোমার ক্লাসে যাওয়া হবে না। শহীদ সাহেব তোমার এখানে আসছেন। পাকের যোগাড় করো। আমি তাঁকে আনতে চললাম। নূরজাহান রিকশা ছেড়ে দিল। অবাক হলো যে, শহীদ সাহেব বাংলার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী যাঁর সম্বন্ধে এত কিছু শুনেছে—সে কিনা তার বাড়িতে অতিথি হবেন। নূরজাহানের পাক এত ভাল ছিল সে, আমি তার ওখানে যেচে খেতে চাইতাম। আমার উপরও তার শ্রদ্ধা ছিল—তাই তার মনে কোন সন্দেহ হয়নি যে, আমি মিছে করে বলতে পারি। যদিও আমি কোন ভূমিকা না করেই কথাটা সোজাসুজি বলে ফেলেছিলাম—তবু দ্বিতীয়বার প্রশ্ন না করেই সে পাকের আয়োজনে চলে গেল।

আমি আমজাদ সাহেবের বাড়ি এসে শহীদ সাহেবকে বললাম,—"চলুন খাবার ব্যবস্থা হয়েছে" তিনি বললেন, "কোথায় ?" আমি বললাম, "প্রশ্ন নয়—চিরকাল আপনি নেতৃত্ব করেছেন এবার আমাদের নেতৃত্ব মেনে নিন", কথা না বাড়িয়ে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে এলেন এবং শাহজাহান সাহেবের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট খাবার ব্যবস্থা। শাহজাহান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের শোবার ঘরটাই তাঁর জন্যে ছেড়ে দিলেন। অনেক লোকের জন্যে খাবার ব্যবস্থা ছিল—আমাদের সবারই খাবারের ব্যবস্থা হলো। সন্ধ্যায় বাদামতলী স্টীমার স্টেশনে শহীদ সাহেবের সঙ্গে আমরা গেলাম। মানিকগঞ্জের স্টীমার ছাড়ার কথা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অথচ সাড়ে আটটা বেজে গেল—স্টীমার ছাড়ার নাম নেই। সারেংকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, "পুলিশ সাহেব" বলে গেছেন তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজ না ছাড়তে। বুঝলাম শহীদ সাহেব বিপদের সম্মুখীন।

তারপরে চারদিকে টেলিফোন করে জানলাম যে, "কেবিনেট মিটিং" চলছে, এবং মুখ্যমন্ত্রী করাচীতে টেলিফোন "বুক" করেছেন এবং সেখানে থেকে একটি "কলের" অপেক্ষা করছেন।

রাত সাড়ে ন'টায় দু'টো জীপ এসে থামল বাদামতলি ঘাটে। প্রথম জীপ থেকে নেবে এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ, ইনস্‌পেক্টর জেনারেল জাকির হুসেন আর ডি. আই. জি. ওবায়েদুল্লাহ্। পেছনের গাড়িতে উচ্চ পুলিশ কর্মচারীগণ। আমরা জাহাজের সম্মুখের ডেকে বসে আছি। ওবায়েদুল্লাহ্ শহীদ সাহেবের হাতে একটি সরকারি আদেশপত্র দিলেন। শহীদ সাহেব বললেন, 'এ ছোট সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরি—আর এতগুলো যাত্রীর হয়রানি করার কোন প্রয়োজন ছিল না।' আমরা উঠে এলাম জাহাজ থেকে। জাকির হুসেন বললেন শহীদ সাহেবকে, "আপনি আজ রাতে আমার বাসায় অতিথি হলে সুখী হব।" শহীদ সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি হবার পথে। তিনি উত্তরে বললেন,— "Thanks. If I am not under arrest I would prefer to remain with my host."

জাকির হুসেন বললেন, "না আপনি যেখানে খুশী রাতটা কাটাতে পারেন।" শহীদ সাহেব বললেন,—"Tell your Nazimuddin that Suhrawardy is not yet dead."

এই জাকির হুসেনকে তিনি একদিন ঢাকার পুলিশ সুপার করেছিলেন। তারপর ১৯৪৬ সনে হাডসন সাহেব যখন আবার ডি. আই. জি. হয়ে আসার কথা হলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তদানীন্তন ডি. আই. জি. পুলিশ সুপার হবেন এবং জাকির হুসেন অতিরিক্ত সুপার হবেন। জাকির হুসেন মনজুর মোর্শেদ সাহেবকে ধরলেন—এর বিহিত করার জন্যে। মনজুর মোর্শেদ সাহেব কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর নিকট "কল-বুক" করে আমার জন্যে পার্টি অফিসে গাড়ী পাঠালেন—আমি গিয়ে দেখি মনজুর মোর্শেদ সাহেব ও জাকির হুসেন সাহেব লনে বসে আছেন। আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চা আনতে বলে মোর্শেদ সাহেব আমাকে সব কথা বলে বললেন যে, তিনি প্রায়রিটি কল 'বুক' করেছেন "কল" তখনই এসে যাবে। সত্যিই 'কল' এল এবং আমি তাঁকে সব কথা বললাম—তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আমি এখুনি টেইলরকে বলে দিচ্ছি।" তার পরের দিনই দেখা গেল হাডসন সাহেব আসছেন না আর ঢাকায়। দেশ বিভক্ত হওয়ার সময়ও তাঁকেই আই. জি. হিসেবে নিযুক্ত তিনি করেছেন কলকাতা মুসলিম লীগ কর্মীদের মতের বিরুদ্ধে।

রাজনীতিতে উত্থান-পতন আছে এবং ওটা মেনে নেয়া রাজনীতিবিদদের উচিত। আমরা শাহজাহান সাহেবের বাড়ি এসে দেখি—তাঁর বাড়ির চারপাশে পুলিশ দাঁড়ানো। ভেতরে গিয়ে দেখি ইন্টেলিজেন্স—একজন ডি. এস. পি. আর একজন ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টর আনোয়ারউদ্দীন সাহেব ও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম।

শহীদ সাহেব এসে খুব বোকা বনে গেলেন। তিনি অতটা আশা করেননি। তাঁর ভয় হলো পাছে শাহজাহান সাহেবদের উপর কোন বিপদ নেমে আসে। আমি মনে মনে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করছিলাম। ধীরে ধীরে কর্মীরা সবাই চলে গেল শাহজাহান সাহেব আমাকে থেকে যেতে বললেন। শহীদ সাহেবের জন্যে খাটখানা 'ফ্যানের' ঠিক নীচে নিয়ে আসা হলো। নেটের মশারী খুলে ফেলে পাখা ছেড়ে দিলে তিনি শুতে গেলেন। আমরা তিনজন সারারাত বসে রইলাম। কারো ঘুম এল না। বোঝা গেল শহীদ সাহেব নজরবন্দী যদিও আদেশপত্রে তার উল্লেখ ছিল না। পরের দিন সকালে উঠেই চোখ বুজে বলতে লাগলেন,—"নাগিনীরা চারদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস/শান্তির ললিতবাণী শোনাবে ব্যর্থ পরিহাস/যাবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই/দানবের সঙ্গে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।" নূরজাহান এম. এ. ক্লাসের বাংলার ছাত্রী—অবাক হয়ে গেলেন শহীদ সাহেব নোটবই দেখে বাংলা কবিতা পড়ছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি নোটবই বন্ধ করলেন। নূরজাহানকে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি তো বাংলার ছাত্রী—আমাকে বোঝাও দেখি—মধুমাখা আঁখিজল অর্থ কি ? লবণাক্ত আঁখিজল কি মধুমাখা হতে পারে ?" নূরজাহান সারারাতের জাগরণের কথা, ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদের কথা এক মিনিটে ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'শহীদ সাহেব আপনি বাংলা সাহিত্য পড়েন ? কবিতা পড়েন ?' শহীদ সাহেব জবাব না দিয়ে আমাদের পাস কাটিয়ে "বাথরুমে" যাবার পথে কেবল বললেন,—"দুঃখিত, লজ্জিত।" এমনি করে নানা কথার ভেতর দিয়ে দিনটি কাটল। খবরের কাগজ-এর রিপোর্টাররা আসল। জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখনো যুক্ত-বাংলায় বিশ্বাস করেন কি না।" তিনি

উত্তরে বললেন যে, তিনি কোনদিনও যুক্ত-বাংলায় বিশ্বাস করেননি। রিপোর্টার তবু ঘুরে-ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বাংলা বিভক্ত না হবার জন্যে বিবৃতি দিয়েছেন কি না—পাকিস্তান হবার পূর্ব দিন পর্যন্ত ? আপনি, শরৎবসু ও আবুল হাসিম চেষ্টা করেছিলেন কি না যুক্ত-বাংলা করতে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'পক্ষে বিবৃতি দেইনি বা করার প্রচেষ্টা চালাইনি।' রিপোর্টররা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করল যে, 'আপনি একসময় দেশের নেতা ছিলেন আপনার নিকট আমরা সত্য ভাষণ আশা করব। আপনার অনেক বিবৃতি বেরিয়েছে এ বিষয়ে আপনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আপনি কি সে সবই অস্বীকার করতে চান ?' তিনি গম্ভীরভাবে বললেন যে,—তাঁর কোন বিবৃতিতেই যুক্ত-বাংলার কথা নেই, থাকতে পারে না। কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নিখিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—বাংলা বিভক্ত হবার পরে তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না—আর তাঁর বিবৃতি দেয়ার কোন কারণ ঘটেনি। বিভক্ত হবার পরেই কেবল যুক্ত করার কথা উঠে। বিভক্ত হবার পূর্বে যুক্ত হবার প্রশ্ন উঠে না। এ সাধারণ কথাটা যাদের জানা নেই তাদের সঙ্গে আমি বৃথা আলাপ করতে রাজী নই। বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধে আমরা সবাই বিবৃতি দিয়েছি এবং কায়েদে আজমের আদেশে আমরা সকল মুসলমান সদস্যই বাংলাকে ভাগ করার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি। কেবল হিন্দু সদস্যরাই বিভক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছে। তাও কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিষ্ঠানের আদেশে।" এখানেই "প্রেস কনফারেন্সের" পরিসমাপ্তির ঘোষণা করে তিনি তাঁদের বিদায় দিলেন।

বিকেলে ডি. এস. পি. সিদ্দিক দেওয়ান সাহেব তাঁকে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে গিয়ে গোয়ালন্দগামী জাহাজে তুলে দিলেন। এর কিছুদিন পরেই গণ-পরিষদে এক আইন পাস করা হলো যে, পাকিস্তানে যেসব সদস্যদের বাড়ি নেই বা সরকারের নিকট থেকে বাড়ি "এলটমেন্ট" নেননি তাদের গণ-পরিষদের সদস্য থাকতে দেয়া হবে না। শহীদ সাহেব 'বিলের' বিরোধিতা করলেন। বললেন, কেবল তাঁকেই বের করার জন্যে ঐ 'বিল' আনা হয়েছে। তাঁর বা তাঁর পিতা বা পিতামহের কোন বাড়ি কোথায়ও নেই, কি ভারতে কি পাকিস্তানে তাই বলে সেটা একটা অপরাধ হতে পারে না।

পরিষদে ঐ আইন পাস হবার পরই দেখি একদিন ফরমুজুল হক সাহেব আমার বাসায় এসে উপস্থিত। আমাকে বললেন যে, 'আমার আড়াই শ' টাকার প্রয়োজন—আমার কাছে এখন টাকাটা নেই।' বললাম,—'কি করবেন টাকা দিয়ে ?' তিনি বললেন,—"আমার শান্তিনগরের বাড়িখানা শহীদ সাহেবের নামে দানপত্র করে দিব—রেজিস্ট্রী করে। সেই রেজিস্ট্রেশনের খরচটা ঠিক এখনই আমার কাছে নেই। আর আপনাকে একজন সাক্ষী হতে হবে।" জিজ্ঞেস করলাম,—'আপনার পরিবারের সবাই রাজি হয়েছেন ?' তিনি বললেন যে, "সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।" আমার স্ত্রীর নিকট থেকে মাসিক খরচের টাকা থেকে টাকাটা নিয়ে গেলাম সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল প্রস্তুত ছিল—রেজিস্ট্রী হয়ে গেল। শহীদ সাহেবকে তার করে দেয়া হলো যে, ঢাকায় তাঁর জন্যে বাড়ি নেয়া হয়েছে। তার একটা কপি জিন্নাহ্ সাহেবকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

১৯৪৮ সনের ১৪ই আগস্ট আমার তৃতীয় পুত্র নিজামউদ্দীন আজাদ জন্মগ্রহণ করে। আমাদের আরো দু'টো ছেলে ছিল তাই আমরা একটি মেয়ে চেয়েছিলাম কায়মনোবাক্যে। কিন্তু এবারও আমাদের ছেলে হওয়ায় আমরা স্থির করলাম আমাদের আর সন্তানের প্রয়োজন নেই। বিবাহের ন'বছরে তিনটি ছেলেই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করলাম। অন্য দু'টো ছেলের সম্বন্ধে এতটা লিখিনি এটা বিশেষ করে লিখলাম—যেহেতু আমার এই ছেলেটি ১৯৭১ সনে ১১ই নভেম্বর মুক্তিসংগ্রামে নিহত হয়।

জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকা ছেড়ে যাবার পরেই তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারদের অনুরোধে তিনি জিয়ারতে যেতে রাজী হন। তাঁর শেষ সরকারি কাজ স্টেট ব্যাঙ্কের উদ্বোধন। জুলাই মাসে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। আগস্ট মাসে তাঁকে জিয়ারত থেকে কোয়েটা নিয়ে যেতে হলো। ৫ই সেপ্টেম্বর নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন তিনি। তাঁর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে তাই স্থির হলো যে, ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর ভাইকিং-এ করাচী যাবেন। তিনি সারা জীবন অত্যন্ত একাকী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সে ব্যর্থতা অনুভব করেছেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান জিয়ারতে একবার দেখতে গিয়েছিলেন। শোবার পায়জামা তাঁর সবই ছিল সিল্কের। ডাক্তার করাচীতে ভায়েলার তৈরী পায়জামার জন্যে খবর দিলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে পায়জামা তাঁর কাছে পৌঁছেনি। জীবনভর যারা তাঁর কাছছাড়া হয়নি মরণের কাছাকাছি এসে তিনি তাদের কাউকে দেখেননি। সত্যি বলতে প্রধানমন্ত্রী অন্তর দিয়ে তাঁর মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কারণ যাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায় না, যাঁর মতই একমাত্র মত বলে ধরে নিতে হবে তাঁকে কেউ আপন বলে ভাবতে পারে না। জিন্নাহ্ ও তাই কারো আপন হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে তাঁর ভাইকিং করাচী এসে পৌঁছল। তাঁর আগমনবার্তা গোপন রাখার জন্যে গভর্ণর-জেনারেলের নিশান ঢেকে দেয়া হলো। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও বিমানবন্দরে আসেননি—অন্যান্য মন্ত্রীরা তো দূরের কথা। তাঁকে যখন স্ট্রেচারে নামানো হলো তখন তাঁর চোখের উপর বহু কষ্টে নিজের হাত রাখল ছায়া দেবার জন্যে। একটি সেনাবাহিনীর এম্বুলেন্সে তুলে দেয়া হলো। কিছুদূর চলার পরই এম্বলেন্স ভেঙ্গে পড়ল। ছিন্নমূল মানুষের যেখানে বাস সেই নোংরা স্থানে এম্বুলেন্স পড়ে আছে—মাছি জিন্নাহ্র মুখে-চোখে এসে পড়ছে—আর সে মাছি তাড়াবার কিছু নেই। সিস্টার ডানহাম একটা কার্ড দিয়ে সে মাছি তাড়াতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে আর একটা এম্বুলেন্স আনা হলো আর তাইতে চড়িয়ে তাঁকে গভর্ণমেন্ট হাউস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। রাত সাড়ে দশটার দিকে তিনি মরণের কোলে ঢলে পড়লেন।

খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই করাচী রওনা হয়ে গেলেন। লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রিসভা নাজিমুদ্দীনকেই গভর্ণর-জেনারেল হিসেবে মনোনীত করল এবং খাজা সাহেবই পাকিস্তানের দ্বিতীয় বড়লাট হলেন। ঐ সাথেই বাংলাদেশে খাজা বংশের রাজনীতির পরিসমাপ্তি ঘটল। পরবর্তীকালে অবশ্যই আইয়ুব খান আবার খাজা আসকারীকে পাগড়ি পরিয়ে নবাব বানালেন এবং খাজা সাহেবদের রাজনীতিতে টেনে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাতে করে তিনি মিল মালিকও হয়েছিলেন, কিছু

রাজনীতিও করেছিলেন—কিন্তু ভাঙ্গা কুলায় কত চাল ঝাড়া যায়। তারপর আইয়ুব সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল সে-বাড়ির কন্যাবংশের সৈয়দ আলাউদ্দীনের ছেলে সৈয়দ খায়েরুদ্দীনের উপর। তিনি নিজেকে খাজা খায়েরুদ্দীন বলতেন। তিনি কন্যা পক্ষেরও দ্বিতীয় তরফের। তিনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন—শেষে আর তাল সামলাতে পারেননি।

নূরুল আমীন সাহেব ছিলেন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অভিজাত ঘরের। নূরুল আমীন সাহেব মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। অবশ্যই পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে উচ্চ মধ্যবিত্তের লোক বলে চিন্তা করতেন। তবু আমার ধারণা নূরুল আমীন সাহেব মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্তি পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তের জাগরণে একটি বড় ঘটনা।

১৯৪৮ সনের অক্টোবর মাসে ডাক্তার মালিক বিরোধীদল ছেড়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে ই. পি. পি. ইউ. এফ.-এর ওয়ার্কিং কমিটি ডাক্তার মালেকের সভাপতি পদে থাকা উচিত কি অনুচিত তাই নিয়ে আলোচনা করেন। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ তাঁর সভাপতি পদে ইস্তফা দাবী করেন। অন্যদিকে ফয়েজ আহমদ তাঁর বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত ভোট নেয়া হয় এবং ফয়েজ আহমদ অল্পসংখ্যক ভোটে জিতে যান। বামপন্থীরা সভা থেকে বেরিয়ে যায়। তারা কিন্তু তাদের সদস্যপদে ইস্তফা দেয়নি। কিন্তু ১৯৪৮ সনে রেল রোড ওয়ার্কার্সরা যখন ধর্মঘটের নোটিশ দিল—তখন ডাক্তার মালিক-ফয়েজ আহমদ-এর দল রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে ফেডারেশন থেকে বের করে দেন। এর ফলে কমিউনিস্ট সদস্যরা ফেডারেশন থেকে সবাই পদত্যাগ করেন। ফলে ফেডারেশন থেকে ঢাকা জেলা সুতাকল শ্রমিক সংস্থা, ঢাকার রিকশা ইউনিয়ন, বরিশাল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল কর্মচারী ইউনিয়নও ফেডারেশনের বাইরে চলে যায়।

১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে প্রথম "ট্রি পার্টাইম লেবার কনফারেন্স" হয়। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ এবং পূর্ব বাংলার ই. পি. টি. ইউ. এফ.-এর নেতৃবৃন্দ একটি সংস্থা গঠন করেন। নতুন সংগঠনের নাম হয় "পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন" (এ. পি. টি. ইউ. এফ)।

১৯৪৯ সনের জানুয়ারি মাসে ফজলুর রহমান সাহেব আরবী অক্ষরে বাংলা লেখার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফজলুর রহমান সাহেব নতুন রাষ্ট্রে মন্ত্রী হয়েই নিত্যনতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করতে থাকেন। প্রথমে তিনি স্থির করলেন যে, পাকিস্তানে ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী শেখার প্রয়োজন সীমাবদ্ধ—সুতরাং ইংরেজী পড়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে আরম্ভ করলেই চলবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ও আরবী এবং পূর্ববঙ্গে উর্দু, আরবী ও বাংলা ভাষা শেখান বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে ছেলে-মেয়েদের উপর কেবল তিনটি ভাষা শেখার চাপই পড়ল না—ইংরেজী নীচে থেকে না পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে চার বছরে ইংরেজীতে যে জ্ঞান লাভ করল তা দিয়ে কলেজের শিক্ষকদের কথা বুঝতে অসুবিধা হলো। সবচেয়ে অসুবিধা হলো যারা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী পড়তে গেল। ফলে তারা কি করে ক্লাস না করে পারা যায়

তারই বুদ্ধি বের করতে সচেষ্ট হলো। কথায় কথায় ধর্মঘট দেখা দিল। ভুল যখন ধরা পড়ল তখন আবার তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হলো এবং এতগুলো ভাষা শেখা যখন ছোটদের জন্যে সম্ভব নয়—তখন প্রথমে আরবী বাদ পড়ল দুই পাকিস্তান থেকেই। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে উর্দুও উঠে গেল। মাঝখান থেকে পাঁচ বছর কতগুলো অর্ধ শিক্ষিত লোক কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

এরপর এল আরবী অক্ষরে বাংলা লেখার পরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করল। বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ভারতে রফতানীর জন্যে পাটের উপর বিশেষ রফতানী কর বসিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ভারতের পাট কলসমূহের চাক্কা বন্ধ করার—ফলে ভারত নিজেরাই পাটের চাষ আরম্ভ করল এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাট রফতানীকারী দেশ হিসেবে পরিণত হলো। এমনি করে নিত্যনতুন পরিকল্পনায় হাত দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে তুলল।

১৯৪৯ সনে ইন্দোনেশিয়ায় রিপাবলিক গঠিত হলো জাতিসংঘের সাহায্যে। নয়াচীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৮ই জানুয়ারি "জুলুম প্রতিরোধ" দিবস পালন করল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ৩রা মার্চ ধর্মঘট করে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ঐ ধর্মঘটকে সমর্থন করে এবং তাদের দাবী গ্রহণ না করায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছাত্রদের ধর্মঘট আহ্বান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জন ছাত্রকে কম-বেশি শাস্তি দেয়া হয় জরিমানা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত। যারা বহিষ্কৃত হলো তারা তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে যেতে পারল না—যাদের শুধু জরিমানা হয়েছিল—তারা হয় জরিমানা দিয়ে বা ক্ষমা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়াশুনা আরম্ভ করল। বহিষ্কৃত ছেলেদের মধ্যে ছিল দবিরুল ইসলাম, অলী আহাদ, আবদুল হামিদ, আবদুল মান্নান প্রভৃতি। যাদের জরিমানা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হলো না। আমার নিজের ধারণা, তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তব ও সময়োপযোগী হয়েছিল। তিনি তখন জননেতা হবার পথে—তাঁর আর ছাত্র থাকা শোভা পাচ্ছিল না। নিজে থেকে পড়াশুনা ছেড়ে না দিয়ে একটা ইস্যুর উপর পড়াশুনা ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একইভাবে তিনি গণতান্ত্রিক যুবলীগকে অগ্রসর হতে না দিয়ে যুবকের দল থেকে বড়দের দলে শামিল হলেন। পরবর্তীকালে তোহা সাহেব ও অলী আহাদ সাহেব যুবলীগ করে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন বটে, কিন্তু কর্মী পর্যায়ে থেকে জাতীয় নেতা হিসেবে গৃহীত হননি। এখানে শেখ সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজির কিছু মিল দেখা যায়। গান্ধীজিও হোমরুল লীগ অমনি করে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ বছরই ছাত্র ফেডারেশনের শেষ অধিবেশন হয়। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য তখন ছিলেন ভাল লেখাপড়া জানা ছেলেরা—যেমন সর্দার

ফজলুল করিম, আখলাকুর রহমান, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার। আমার মনে হয়, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, এনায়েত করিম, বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও ছাত্র ফেডারেশন করতেন।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আসন শূন্য হলে করোটীয়ার জমিদার খোরম খান পন্নীকে মুসলিম লীগ মনোনয়ন দেয়। সেই নির্বাচন কেন্দ্রে শামসুল হক খোরমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামেন। পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগের এটাই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা—খোরম খান পন্নী জমিদার। শামসুল হক সাধারণ কৃষকের ছেলে পন্নীদেরই প্রজা। নূরুল আমীন সাহেব মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-নির্বাচন তাঁরই জেলায়। শামসুল হকের পেছনে কোন রাজনৈতিক দল নেই—নেই টাকা পয়সা। ১৫০ নম্বর মোগলটুলী "ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের" কর্মীরা ছিল কেবল তাঁর পক্ষে। টাকার জন্যে আলমাস ৮০০ টাকা ও আমি কয়েকজনের নিকট থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে টাঙ্গাইল পৌঁছি। এছাড়া নির্বাচনী ক্যাম্পের জন্যে শামসুল হকের বাড়ি থেকে কয়েক মন চাল দিয়ে গিয়েছিল তাঁর ছোট ভাই নূরুল হক। সর্বজনাব আলমাছ আলী, আউয়াল, শামসুজ্জোহা, খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাজুউদ্দীন আহমদ, শওকাত আলী, হযরত আলী শিকদার ও আজিজ আহমেদ সবাই নির্বাচনে দিনরাত না খেয়েদেয়ে খেটেছেন। খোদাবক্স মোক্তার সাহেব সবার দেখাশুনা করতেন। আমার একটা ভরসা ছিল বাবু রণদাপ্রসাদ সাহার সাহায্য। কিন্তু হামিদুল হক চৌধুরী পূর্ব থেকেই তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া মুসলিম লীগ সে বাড়িতে ক্যাম্প করে বসে আছে। সুতরাং সেদিক থেকে যে সাহায্যটা আমি আদায় করতে পারতাম তা আর হলো না। নূরুল আমীন সাহেব নিজে নির্বাচনী অভিযানের ভার নিয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ নির্বাচনে আমাদের পক্ষে সুবিধা করে দেয় খোরমের স্ত্রী। সে খোরমের বিরুদ্ধে একটি ইস্তেহার বের করে—এই বলে যে, সে তার স্ত্রী হলেও তার সঙ্গে সহবাস না করে সে তার আপন বোনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করছে। আর একটি সুবিধা হলো খাজা নূরুদ্দীন সাহেব তাঁর সাপ্তাহিক মর্ণিং নিউজে বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দিলেন যে, হামিদুল হক চৌধুরী ভারতের ডালমিয়ার কাছ থেকে ঘুস খেয়ে ডালমিয়ার ড্রামগুলো ভারতে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন—তাতে পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছিল। এছাড়াও ঐ নির্বাচনে ভোট পাবার জন্যে নূরুল আমীন সাহেব গরুর গাড়ি বোঝাই চাউল ঐ দু'থানায় পাঠাতে থাকেন। অথচ তার পূর্বে তারা বহুদিন সরকারি চাল দেখেনি। ফলে লোকের ধারণা হলো যে, সরকার এত চাল থাকা সত্ত্বেও এতদিন সেখানে চাল সরবরাহ না করে তাদের না খাইয়ে রেখেছে। তাছাড়া শামসুল হক ঐ যে প্রথমদিন সাইকেলে উঠেছিলেন সে সাইকেলেই প্রতি ঘরে ঘরে লোকের কাছে গিয়েছেন।

১৯শে মার্চ তারিখে হযরত আলী আসাম গিয়ে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে জেলে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে শামসুল হককে ভোট দেবার জন্যে একটি আবেদনপত্রে সাক্ষর নিয়ে আসেন। আমি দেখলাম যে, সেখানে জেলের সিকিউরিটি অফিসারের কোন সীল নেই। আমি ওটাকে ছাপতে নিষেধ করলাম। ২৩শে মার্চ আমি ঢাকায় ফিরে

এলাম। আমার একটা খুব বড় সেসন মামলা ২৯শে মার্চ তারিখে। মানিকগঞ্জের চর দখল নিয়ে দুই জমিদারের মধ্যে জমি নিয়ে ঝগড়া হয়। ১৯ জন দু'পক্ষে খুন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমার ঢাকা আসার পর অল্প কয়েকদিন আগে ঐ আবেদনপত্রটি ছেপে বিলি করে দেয়।

নির্বাচনে শামসুল হকের জয় হয়। ফলে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ফাটল ধরে। তাছাড়া শামসুল হকের বিজয়ের পর শহীদ সাহেব এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে চলে আসেন। আরো কারণ ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু কিরণ শঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁর কলকাতা থাকা বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছিল। 'ইত্তেহাদ'ও নানা কারণে আর চালানো সম্ভব না হওয়ায় সেটাও বিক্রি করে দিতে হলো। নবাবজাদা হাসান আলী, আবুল মনসুর আহমদ সাহেব ও মানিক মিঞা পূর্ববঙ্গে চলে এলেন। আবুল মনসুর সাহেব ময়মনসিংহে বাসা নিয়ে আবার ওকালতি আরম্ভ করলেন—নবাবজাদা দেশে ফিরলেন। মানিক মিঞা ঢাকায় এলেন। ঐ সময় মাওলানা ভাসানী সাহেবও আসাম জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শেষবারের মত দেশে ফিরে এলেন। শহীদ সাহেব এবং মাওলানা সাহেবের মধ্যে আলোচনা হলো—তারপর শহীদ সাহেব লাহোর গেলেন মিঞা ইফ্‌তেখারউদ্দীন ও মানকি শরীফের পীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। মানকি শরীফ ইতিমধ্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং মেমদোতের নবাব পাঞ্জাবে জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের পত্তন করেছেন। মেমদোত মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাঁর বিরুদ্ধে PRODA মামলা খাড়া করা হয়। শহীদ সাহেব মেমদোতের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হন। মামলা বহুদিন ধরে চলে এবং শহীদ সাহেব বহু টাকা উপার্জন করেন ঐ মামলায়। ঐ বছরই পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে শরৎ বসু উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে বহু ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে প্রমাণ করেন যে, জনগণ "স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিল না। পূর্ব বাংলার শামসুল হক ও পশ্চিম বাংলার শরৎ বসুর বিরুদ্ধে একই কথা—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রচার করে ব্যর্থ হয়েছিল।"

শহীদ সাহেবের পশ্চিম পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। সুতরাং সেখানে তিনি নীচে থেকে সংগঠন করার আশা ছেড়ে দিয়ে উপর (Top) থেকে একটি সংগঠন ড্রইংরুমে বসে তৈরি করে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা চালান। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে জিন্নাহ্-আওয়ামী মুসলিম লীগের একটা কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব-এর "উপরের চক্র" থেকে কিছু লোক যোগাড় করতে সচেষ্ট হন। মেমদোতের মামলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আইয়ুব খোরোর PRODA মামলা শুরু হয়। খোরোর মামলায় শহীদ সাহেব খোরোর পক্ষ সমর্থন করেন। সেই সুযোগ তিনি পয়সা আয় ছাড়াও সিন্ধুতে—নইলে অন্ততঃ করাচীতে কোন সংগঠন করা যায় কি না তার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু দু'টো কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। প্রথম করাচী সম্পূর্ণভাবে মোহাজেরদের দখলে—যাদের বলা হয় "নই-সিন্ধি" (New Sindhis) আর যারা পুরনো বাসিন্দা তাদের বলা হয় "আসলি সিন্ধি" (Original Sindhis) এদের মধ্যে এত তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোহাজেরদের সঙ্গে কথা বললে "আসলি

সিন্ধি"রা তার বিরুদ্ধে যাবে আর যদি তাদের কথা না বলেন তবে খোরো, তালপুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদের দয়ার উপরই নির্ভর করতে হয়। ১৯৪৭ সন থেকে 'ছিন্নমূল' মানুষের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করার যে বাসনা—তার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। তাছাড়া করাচী রাজধানী বিধায় সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাতে কোন বিরোধী ভাব না গড়ে উঠতে পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হত। অন্যদিকে চৌধুরী খালিকুজ্জামান, ইউসুফ হারুন, চুন্দ্রিগড় সকল নেতারাই মোহাজের। বলতে গেলে জিন্নাহ্ এবং লিয়াকত আলী খানও মোহাজের। লিয়াকত পূর্ববঙ্গ থেকে গণ-পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন। শহীদ সাহেবও মোহাজের আর এককালে জিন্নাহ্ এবং লিয়াকত আলী খানের বিরোধিতা করেছিলেন বলে তিনি তখন মোহাজের সমাজজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন। শহীদ সাহেব করাচীতে তাই কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। তবু শহীদ সাহেব পাকিস্তানে এসে করাচীকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মশীলতার কেন্দ্র হিসেবে স্থির করলেন। মাওলানা ভাসানী সাহেব তাঁকে ঢাকায় তাঁর কর্মস্থল করতে বললেন। কারণ তাঁর মতে, শহীদ সাহেব করাচীতে পাত্তা পাবেন না মাঝখান থেকে পূর্ববাংলাও হারাবেন। আমার মনে হয়, শহীদ সাহেবের সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল তাঁর উচ্চাভিলাস। পূর্ববঙ্গে কর্মস্থল করলে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া কখনো সম্ভব হবে না, দ্বিতীয়তঃ তাঁর জীবনযাত্রা যে ধরনে গড়ে উঠেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিলেত থাকাকালীন সে জীবনের সঙ্গে কলকাতার কিছু মিল থাকলেও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কোন মিল ছিল না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ স্বাধীনতার সময় অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং সামন্ত যুগের ধ্যানধারণা তাদের মধ্যে ছিল প্রকট। ক্লাবজীবন, নাচ-গান প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের ধারণার সঙ্গে শহীদ সাহেবের ধারণার কোন মিল ছিল না। তাছাড়া করাচীতে আইনব্যবসা আরম্ভ করলে ঢাকা হাইকোর্টে "সিনিয়র কাউন্সিলর" নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অন্যদিকে ব্যবসায় করাচীতে প্রসার হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর—জুন মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভা ডাকা হয়। পুরাতন নিয়মে মাওলানা আক্রাম খাঁ সবাপতি পদে ইস্তফা দেন—সেই ইস্তফাপত্র বিবেচনার ব্যাপারে নানা মুনীর নানা মত দেখা দিল। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব যে পন্থায় নূরুল আমীন সাহেবকে মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করা হয়েছিল তা মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ধারণা হলো যে, ফজলুর রহমান ও নূরুল আমীন সাহেবদ্বয় তাঁকে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত আবার মাওলানা আক্রাম খাঁকে অনুরোধ করে তাঁর ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করালেন। এতে ইউসুফ আলী চৌধুরীর মুসলিম লীগ করায়ত্ব করার পরিকল্পনা ভেঙ্গে গেল।

বিরোধীদলের নেতা এবং কর্মীরা কাজী মোহম্মদ বশীর (হুমায়ুন) সাহেবের রোজ গার্ডেনের বাড়িতে শহীদ সাহেব ও আবুল হাসিম সাহেবের দলীয় লোকদের এক সভা ডাকা হলো। মাওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা ফজলুল হক দু'জনকেই ডাকা হলো এবং তাঁরা দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। শামসুল হক তাঁর ম্যানিফেস্টো তৈরি করে রেখেছিলেন—সেটাই তিনি উপস্থিত করলেন। শেখ সাহেব সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া), খয়রাত হুসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমদ খান, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, আলমাছ আলী, আবদুল আউয়াল, শামসুজ্জোহা, সৈয়দ আবদুর রহিম ও আবদুল জব্বার খদ্দর। তাছাড়া মোগলটুলী "ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের" সকল কর্মী শামসুল হক সাহেবের নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত ছিল। আমিও শামসুল হক সাহেবের একটি দাওয়াৎ পেয়েছিলাম এবং উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আলোচনার পর মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হক সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ও খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবকে যুগ্ম-সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হবার কয়েক মাস পরেই গণ-পরিষদে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী গণ-পরিষদে উপস্থিত করেন। এর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। পাকিস্তান 'অবজার্ভার'-এর সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক আবদুস সালাম এবং জহুর হুসেন চৌধুরী মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করার জন্যে মুসলিম লীগ ছাড়া বাকি সব পার্টির লোককেই নিমন্ত্রণ করেন। 'অবজার্ভার' অফিসে সবাই বসে। যাঁরা খুব উৎসাহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে নামকরা যায় সর্বজনাব তাজউদ্দীন আহমদ, অলী আহাদ, সাখাওয়াৎ হোসেন, আবদুল ওয়াদুদ, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, তাসাদ্দক আহমদ, আবদুল মতিন প্রভৃতি। সভায় আমাকে 'কনভেনর' করে একটি কমিটি করে দেয়া হয়। কমিটির নাম দেয়া হলো "কমিটি অব একশন ফর ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন।"

মুসলিম লীগ তাঁদের একটি কমিটি গঠন করলেন ময়মনসিংহে মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্যে। সেখানে হামিদুল হক চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান প্রভৃতিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হলো। আওয়ামী লীগেও তেমনি একটি কমিটি গঠিত হলো তার মধ্যে থাকলেন আতাউর রহমান খান, রফিকুল হোসেন, মানিক মিয়া, নূরুল ইসলাম প্রভৃতি। তিনটি স্ব-স্ব কমিটির আলোচনা বৈঠক চলার পর দেখা গেল সকলেই একমত হয়েছিল যে, মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি গণ-পরিষদে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল—তা পূর্ববাংলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সবিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাঁদের মধ্যে মতভেদ রইল যথেষ্ট। তবে আমাদের কমিটির সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের মিল অনেক বেশি। অমিল হলো তিনটি বিষয়ে : ১. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি, ২. কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ ও ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যার মূলনীতি ও ভিত্তি।

আওয়ামী লীগ সমস্ত দেশের গণভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার পক্ষপাতি আর আমরা তাকে পার্লামেন্টের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচন করার পক্ষপাতি। আমাদের যুক্তি ছিল যে, প্রেসিডেন্ট থাকবেন ক্ষমতাহীন তাঁকে গণভোটে নির্বাচিত করলে গণতান্ত্রিক ফেডারেশন চলবে না কারণ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন বিশেষ একটি কেন্দ্র থেকে। সুতরাং তাঁর পক্ষে দেশের সকল

মানুষের ভোটে নির্বাচিন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাহীন করে রাখা সম্ভব হবে না—যার ফলে দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা কায়েম হবে এবং একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। আমাদের মতে, কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগদ্বয়ের পরিকল্পনা করার অধিকার তাঁদের উপর ন্যস্ত থাকবে—বাকি সকল বিষয় আঞ্চলিক স্টেটের উপর ন্যস্ত থাকবে। আওয়ামী লীগ দেশরক্ষা, পরাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের হাতে রাখার প্রস্তাব করে আমাদের মতে, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান দু'টো সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্র সুতরাং জাতিসংঘ বা বৃটিশ কমনওয়েলথের মত দু'টো দেশের প্রতিনিধি সংখ্যা সমান সমান হবে কারণ "একলোক এক ভোট" ব্যবস্থা করলে সম্পূর্ণ দেশকে একটা স্টেট মেনে নিতে হয় আর দু'টো রাষ্ট্রই লোকগণনার সময় মিথ্যে করে মানুষের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করবে ফলে ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যে-রকম লোকগণনা হয়েছে এখানেও তাই হবে। আওয়ামী লীগ "এক লোক এক ভোটের" প্রস্তাব গ্রহণ করে।

আমি কমিটি অব্ একশনের পক্ষ থেকে আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্যে সকল জেলায় জেলায় যাই এবং সেইসঙ্গে জেলা পোস্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন ও ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এম্প্লইজ ইউনিয়ন সংগঠনের কাজও করার চেষ্টা করি। সমস্ত জেলা সংগঠিত হবার পর আমার এ ধারণা হয় যে, সবারই মত যে কেবল মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রস্তাবসমূহ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বলেই কাজ শেষ না করে "আমাদের মতে সংবিধানের কাঠামো কি হবে তাও দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করে সেটি একটি কনভেশনে পাস করে দেশের জনমত গঠন করা প্রয়োজন।" ঐসব আলোচনার ভিত্তির উপর আমরা একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করে সকল জেলায় ও অন্যান্য পার্টির নেতৃবৃন্দের নিকট পাঠিয়ে দেই—এবং ১৯৫০ সনের জানুয়ারি মাসে একটি "গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন" ডাকা স্থির করি। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের জনাব আতাউর রহমান খানের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম সেই কারণে যদিও তিনি আওয়ামী লীগের নেতা তবু তাঁকেই গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমরা আমন্ত্রণ জানাই। স্থির হয় যে, সভাপতির বক্তৃতা তিনিই করবেন, কিন্তু মূলনীতির খসড়া আমি কনভেনশনে উপস্থিত করব। প্রতিটি ধারা দু'দিন ধরে আলোচনা হবে এবং কোন সংশোধনী গৃহীত হলে খসড়াটিও সংশোধন করা হবে।

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে সভাপতির লিখিত ভাষণ পাঠ করার সময় আতাউর রহমান সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং তাঁর অসমাপ্ত বক্তৃতা আমিই সভায় পাঠ করি। দু'দিন ধরে বাক-বিতন্ডার পর শেষ সন্ধ্যায় খসড়া গৃহীত হয়। সিলেট জেলার পক্ষ থেকে আবদুস সামাদ সাহেবের একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় সেটি হচ্ছে,—

> "3 A United State of Pakistan shall be a sovereign socialist Republic." (লেখকের A Socio-Political History of Bengal, Appendix দ্রষ্টব্য)।

কনভেনশনের কাজ শেষ করে আমি খাবার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলাম কারণ ঐ দু'দিনের খাটুনীতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ অলী আহাদ সাহেব এসে আমাকে

ধরে বার-লাইব্রেরী হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়। হলে ঢুকে দেখলাম এক অদ্ভুত কাণ্ড। বরিশালের নূরুল ইসলাম সাহেব নতুন কনভেনর নির্বাচনের জন্যে আতাউর রহমান সাহেবের নাম প্রস্তাব করেছে এবং আবদুল ওয়াদুদ সেটা সমর্থন করেছে। অলী আহাদ আমার নাম প্রস্তাব করে ফেলল আর তাজউদ্দীন সাহেব ও জহুর হোসেন সাহেব সমর্থন করল ভোট সবই আমার পক্ষে এলো। যাঁরা বেরিয়ে গেলেন তাঁরা হলেন আতাউর রহমান সাহেব, মানিক মিয়া, রফিকুল হোসেন, নূরুর ইসলাম, আবদুল ওয়াদুদ সবাই আওয়ামী লীগের। এমনি একটা দুঃখজনক ঘটনাটি যে তারা কি মনে করে করেছিল তা আমি অনেক পরে বুঝেছিলাম।

১৯৫০ সনে রাজশাহী জেলায় দু'টো দুর্ঘটনা হয়। প্রথমটি সাওতাল কৃষকদের সঙ্গে পূর্ববাংলার পুলিশবাহিনীর সংঘর্ষ এবং কয়েকজন পুলিশের জীবন্ত সমাধি। কৃষাণদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইলা মিত্র। তিনি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। পুলিশ তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে।

দ্বিতীয় ঘটনা রাজশাহী জেলে খাপড়া ওয়ার্ডে গুলী চালান হয় এবং সাতজন রাজবন্দী ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। এর কিছুদিন পূর্বেই ঢাকা জেলে শিবেন রায় অনশন করে প্রাণত্যাগ করে। নূরুল আমীন সাহেবের মন্ত্রিত্বের আমলে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হয়, হাজার হাজার কর্মী গ্রেফতার হয়। শামসুল হক সাহেব, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, মাওলানা ভাসানী প্রভৃতি নেতারা ছাড়াও বহু কর্মী বছরের পর বছর ধরে বন্দী জীবনযাপন করে। নূরুল আমীন সাহেব এর জন্য কতখানি দায়ী আর কতখানি দায়ী চীফ্ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ এবং আই. জি. জাকির হুসেন তা বলা দুঃসাধ্য। তবে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর স্কন্ধে চাপতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে দু'টো ঘটনার কথা মনে পড়ে। শামসুল হক সাহেব টাঙ্গাইল নির্বাচনে জয়ী হলেও তিনি কোনদিন পরিষদে বসতে পারেননি কারণ তাঁর বিরুদ্ধে নূরুল আমীন তাঁর লোক দিয়ে ঐ নির্বাচনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করালেন। নির্বাচন বাতিল করার কারণ দু'টো দেয়া হলো—প্রথম তিনি নির্বাচনের প্রতীকের ঘরে লিখেছিলেন "লাঙ্গল অথবা ধানের আঁটি"। দ্বিতীয়তঃ মাওলানা সাহেবের নাম জাল করে মিথ্যে আবেদনপত্র—যেটা তিনি জেল থেকে পাঠাতে পারেন না। ট্রাইব্যুনালে যাঁদের সদস্য করা হলো—তার মধ্যে একজন হাইকোর্টের জজ আর দু'জন জেলা জজ। হাইকোর্টের জজ রায় দিলেন নির্বাচন বাতিলযোগ্য নয়। দুই জেলা জজ যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে তাঁরা দু'জনেই বললেন নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে। শামসুল হক সাহেব নির্বাচনের পরেই ইডেন কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর আফিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা থেকে মুক্তি পান। বিয়ে পড়ান ড. শহীদুল্লাহ এবং ঐ বিবাহ মজলিসেই আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের সঙ্গে আতাউর রহমান খান সাহেবের নাম শুনেছেন তাই আমাকে বললেন, তাঁদের আলাপ করিয়ে দিতে। পরবর্তীকলে তাঁরা দু'জন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরেই শামসুল হক সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৫২ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত জেলে বন্দী করে রাখা হয়। আমার বিশ্বাস, শেখ মুজিবুর রহমান

সাহেবও তাঁর জীবনে দীর্ঘকাল কারাবাস তাঁর সময়েই হয়েছিল। অবশ্যই শেখ সাহেব একমাত্র যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রিত্বের সময় ছাড়া আর সকল মন্ত্রিত্বের সময়ই কারাবাস করেছেন।

টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচন বাতিল ঘোষণা ও বিবাহের পরে পরেই দু'বার গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে অবস্থান করার ফলে তাঁর অন্তরে যে আঘাত পান তার ফলে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে থাকেন এবং তার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। আফিয়া খাতুনের অনুরোধে আতাউর রহমান সাহেব এবং আমি নূরুল আমীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলি এবং শামসুল হক সাহেবের চিকিৎসার জন্যে তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করি। তিনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমাদের কথা শুনলেন সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ফাইলও দেখছিলেন। তারপর বললেন যে, আপনাদের কথায় তাঁর মুক্তি হবে না। এ সম্বন্ধে আই. জি. প্রিজন্স আমাকে কিছু জানায়নি। আমরা বললাম যে, আপনি আই. জি. প্রিজন্সকে আমাদের কথার ভিত্তিতে রিপোর্ট চাইতে পারেন তা নইলে তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে না। তিনি উত্তরে বললেন,—"আপনাদের কথামত কাজ করলে সরকার চালানো সম্ভব হবে না।" এর পরে আর কথা চলে না। তাই চলে এলাম।

আর একদিন দেওয়ান মাহবুর আলীর স্ত্রী জানালেন যে, দেওয়ান সাহেব খুবই অসুস্থ বাঁচে কি না সন্দেহ। আমরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, মুখ্যমন্ত্রীর নিকটে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু কে শোনে। তাই আবার আমরা দু'জন গেলাম তাঁর কাছে। ঐ একই ব্যবহার কেবল বললেন যে, 'দেওয়ান মাহবুর আলী ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে'—আরো বললেন, 'দেওয়ান সাহেব তাঁর আত্মীয় সুতরাং আমাদের চেয়েও তিনি দেওয়ান সাহেবকে বেশি চিনেন।' তিনি বললেন, 'যদি "বণ্ড" দেয় যে, আর কোনদিন রাজনীতি করবে না তবে ছাড়া যেতে পারে কি না তিনি দেখবো। নইলে তাঁকে ছাড়া হবে না।' অবশ্যই তিনি পরবর্তীকালে দু'জনকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন—শামসুল হক তখন বিকৃত মস্তিষ্ক এবং চিকিৎসার বাইরে আর দেওয়ান মাহবুব আলীর স্বাস্থ্য এত ভেঙ্গেছিল যে, সে আর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পায়নি।

জানুয়ারিতেই লিয়াকত আলী খান এলেন ময়মনসিংহে মুসলিম রীগ কাউন্সিল সেশনে যোগ দিতে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টের আলোচনা শুনলেন। ঢাকায় এলেন আমাদের "কমিটি অব্ একশনের" তরফ থেকে চারজন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের "গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন" গৃহীত মূলনীতি তাঁর হাতে দেই এবং তাঁর সঙ্গে কেন আমরা ঐ মূলনীতি গ্রহণ করেছি তারও কারণসমূহ ব্যক্ত করে একটা রিপ্রেজেন্টশন তাঁকে দিয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করি। আতাউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিন্নভাবে দেখা করেও আওয়ামী লীগের বক্তব্য পেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন যে, গণ-পরিষদের মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রস্তাবসমূহ পূর্ববাংলার কোন পার্টি বা ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

এ সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়ার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র চীনদেশের নেতা মাও-সে-তুং তাঁর পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে সোভিয়েট রাজধানী মস্কোতে গিয়ে দু'মাস আলোচনা চালালেন। কি আলোচনা হয়েছে তা বহির্বিশ্বের জানার কথা নয়। যেটুকুন খবর এসে পৌঁছল সে হচ্ছে যে, সোভিয়েট এবং চীনদেশ ত্রিশ বছরের এক চুক্তি সম্পাদন করেছে—চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে যে, আগামী ত্রিশ বছরে জাপান বা অন্য কেউ যদি চীন বা সোভিয়েট রুশ আক্রমণ করে তবে উভয় দেশই একত্র হয়ে যুদ্ধ করবে শত্রুর বিরুদ্ধে। তাছাড়া সোভিয়েট চীনদেশকে পাঁচ বছরে ত্রিশ কোটি টাকা দেবে শিল্পসামগ্রী ও রেলের সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্যে।

জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে এবং সে আক্রমণের মুখে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করল। জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রস্ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী সভা ডাকার জন্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ট্রীগভি লাইকে অনুরোধ করেন। পরের দিন বিকেল বেলা নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহূত হলো এবং মার্কিন প্রতিনিধি এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়াকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সীমানার উত্তরে চলে যাবার জন্যে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর ৯—০ ভোটে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল—সোভিয়েট রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সভায় যোগ দেয়নি। জেনারেল ম্যাকার্থার জাপান থেকে মার্কিন সাজোঁয়াবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ানদের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাকার্থার দক্ষিণ কোরিয়া এলে প্রেসিডেন্ট সিংম্যানরি তাকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু জেনারেল ম্যাকার্থার অবস্থা বুঝে আট ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে জাপান চলে যান। আমেরিকান সৈন্যরা উত্তর কোরিয়ানদের হাতে মার খেয়ে পিছু হটতে লাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা এই প্রথম অস্ত্র ধরে এমন নাজেহাল হলো যে, মার্কিন সৈন্যদের উপর সবাই আস্থা হারাতে বসল। আমেরিকা চল্লিশটি ট্যাঙ্ক নিয়ে পলাতক মার্কিন সৈন্যদের সাহায্যে এগিয়ে এলে উত্তর কোরিয়ার ট্যাঙ্কবাহিনী চল্লিশটার মধ্যে আটত্রিশটা ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। জাপান থেকে যে দেড়শ' মার্কিন সৈন্য এসেছিল তার মধ্যে জনত্রিশেক আহত অবস্থায় জাপানে নিয়ে যেতে পারা গেল বাকি সব উত্তর কোরিয়ানদের গুলীতে প্রাণ দিল। নতুন মার্কিন সেনাবাহিনী যারা এল তারা আত্মরক্ষা করে চলতে লাগল আরো সৈন্যদের জন্যে। জাতিসংঘের অনুরোধে অন্যান্য দেশ থেকে সৈন্য পাঠানো হলো—কারণ অপমান কেবল আমেরিকার নয়—নিরাপত্তা পরিষদের। এবারে সম্মান রক্ষা পেল। বৃটিশ সৈন্য এল তিন হাজার। দশ হাজার ক্যানাডিয়ান সৈন্য, ডাচ সৈন্য হাজারখানেক—দক্ষিণ আফ্রিকার এক স্কোয়াড্রন বিমানবাহিনী।

জেনারেল ম্যাকার্থার নতুন ভুল করল—উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা যখন জাতিসংঘ বাহিনীর চাপে ফিরে যাচ্ছিল তখন চীনের সীমানা লঙ্ঘন করার আদেশ দিল মার্কিন সৈন্যদের। ইয়ালো নদীর ওপারে যেতে চীনা সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। চীনাদের সম্মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারোই থাকল না। তুর্কী সৈন্যরা প্রথম তাদের সফল

বাধা সৃষ্টি করল এবং বেয়নেট চার্জ করে দু'শ' চীনা সৈন্য হত্যা করার ফলে যুদ্ধের মোর ফিরল। পাঁচ হাজার তুর্কী সৈন্য তুমুল যুদ্ধ করে চলল। তাদের সাহায্য করার জন্যে আমেরিকার ট্যাঙ্কবাহিনী এগিয়ে এলে চীনা সেনাবাহিনী তুর্কী সৈন্যদের হটে আসতে অনুরোধ জানালে—তুর্কী সেনাধ্যক্ষ উত্তরে বলল যে, "যুদ্ধটা সবেমাত্র জমে উঠেছে"। মার্কিন সৈন্যরা দেখল যে, তাদের আধুনিক যন্ত্র, ট্যাঙ্কবাহিনী, বিমানবাহিনী চীনা পদাতিকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেত যদি না তুর্কী ও অন্যান্য সৈন্যরা তাদের রক্ষা করত।

এদিকে হো-চি-মিন ভিয়েতনামে ফরাসী সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে তুলছে—এতকাল ইউরোপের সৈন্যদের মনে করা হত অজেয়—অথচ এশিয়ায় তাদের অবস্থা দেখে বোঝা গেল যে, বহুদিন সাম্রাজ্য শক্তিসমূহ ধনে-জনে, আরামবাদীরা পাত্‌তাড়ি গুটাবে এশিয়া থেকে।

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলো ভারতে দাঙ্গার ফলে। স্বাধীনতার পূর্বে দাঙ্গার মধ্যে কিছুটা বীরত্ব ছিল—কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অর্থে দাঁড়াল সংখ্যালঘু হত্যা—চরম কাপুরুষতা। খুব শীত পড়েছিল সেদিন। আমার বাড়ির সম্মুখে একটি ছোট হার্মুনিয়াম মেরামত করার দোকান ছিল এক হিন্দুর। তার কেউ ছিল না। কয়েকদিন পূর্বে তার মেয়ে ও মেয়ের জামাই এসেছিল বেড়াতে। হঠাৎ দাঙ্গা লেগে গেল—তার মেয়ে ও মেয়ের জামাই সকালে একফাঁকে রাস্তা পার হয়ে আমার বাসায় এল। মহল্লার রসিক দাসের সবাই ছিল বন্ধু তাই সে ভয় পেল না। গুণ্ডারা তার বাড়ি আক্রমণ করলে সে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চীৎকার করতে থাকে—কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ফেলে—তখন সে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে দৌড়াতে থাকে—কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আমি চীৎকার শুনে দোতলার জানালা খুলে দেখি যে, একটা গুণ্ডা তার পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আমি ঐ মহল্লায় অল্পদিন—লোকটাকে চিনতে পারলাম না। আমি তখনো জানি না—তার জামাই ও মেয়ে আমাদের নীচের তলায় একটা ঘরে লুকিয়ে আছে। গুণ্ডারা অনুমান করেছিল ঠিকই। আমাকে গেটের দরজা খুলে দিতে বলল—আমি কোন উত্তর দিলাম না—ওরা ছুরি উঁচিয়ে কি যেন বলল। ইতিমধ্যে রসিকের মেয়ে আমার স্ত্রীর কাছে এসে কেঁদে বলছে—গেট খুলে দিলে আমাদের হত্যা করবে। গুণ্ডারা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল—এমনি করে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল। মহল্লার কোন লোক জানালা থেকে দেখলাম না। ঘণ্টাখানেক পরেই অলী আহাদ সাহেব এসে উপস্থিত। দাঙ্গার ব্যাপার আলোচনা করতে এসেছেন ও কর্তব্য কি তাই ঠিক করতে। তাকে পেয়ে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। দাঙ্গা প্রতিরোধের পূর্বে প্রথম কাজ হলো ওদের কোনপ্রকারে পার করে দেয়া। অলী আহাদ সাহেব আমাকে বললেন, তাঁর সঙ্গে পার্টি অফিসে যেতে। আমার ভয় হলো আমি বেরিয়ে গেলে গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে পারে। আমি তাই বললাম, আমি পরে যাব—কয়েকজন লোক পাঠাতে বললাম ওদের একটা হিল্লে করতে। বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন। দুপুরের পর কয়েকজন লোকের সাহায্যে পেছনের

দেয়াল ভেঙ্গে—কিছুদূর হিন্দুপাড়ায় তাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ১৫ তারিখে দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে আমি আর বেরুতে সাহস পেলাম না। মনে হলো—হয়ত গুণ্ডারা আমার উপর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল অনেক জেলায়—বিশেষ করে বরিশালে। বরিশালের মুসলিম লীগের তদানীন্তন সেক্রেটারীকে গ্রেফতার করা হলো। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে ভীষণ পরিবর্তন এসেছিল। বোধহয় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে থাকার ফলে। পরবর্তীকালে তিনি শেখ সাহেবের পরম বন্ধুও হয়েছিলেন।

লিয়াকত আলী খান ছুটে এলেন ঢাকায় সব দেখে তিনি সরকারি কাজের প্রশংসা করতে পারলেন না। আরো অবাক হলেন দেখে যে, দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিচ্ছে মুসলিম লীগের এক শ্রেণীর গুণ্ডা আর বিহারী মোহাজেররা। তারা বাড়ি দখল করার জন্যেই হিন্দুদের বিতারণের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে আমরা সরকারের আইন রক্ষার ক্ষেত্রে চরম অবহেলার কথা উল্লেখ করলাম। লিয়াকত আলী খান ভয় পেলেন যে, এর ফলে উদ্ধাস্তু সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দেবে। তাই তিনি নেহেরুর সঙ্গে সংখ্যালঘু সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলেন। এক মাস পরে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে লিযাকত আলী খান দিল্লী পৌঁছেন এবং লিয়াকত-নেহেরু প্যাক্ট সই হয় ৮ই এপ্রিল।

মুসলিম লীগ সরকার ইনকোয়েরী কমিশন গঠন করেন। মুসলিম লীগ কমিশনের পক্ষে ছিলেন সর্বজনাব রেজাই করিম সাহেব, জহিরুদ্দীন সাহেব এবং জমিরুদ্দীন সাহেব।

পাকিস্তানে লিয়াকত আলী খান এবং তাঁর মুসলিম লীগ শেখ আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে উত্তেজিত জনতা মিছিল করতে আরম্ভ করে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা কোনদিনই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

১৯৫০ সনের এপ্রিল মাসের ত্রিশ তারিখে অনেকদিন আলোচনার পর এ. পি. টি. ইউ. এফ. এবং টি. ইউ. এফ. পি.-এর মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। ঐ সমঝোতার ফলে ফেডারেশন নতুনভাবে সংগটিত হয়। নূরুল হুদা সাহেব প্রেসিডেন্ট, আমি ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ফয়েজ আহমদ সাধারণ সম্পাদক, আফতাব আলী কোষাধ্যক্ষ ও জহুর আহমদ চৌধুরী সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ফেব্রুয়ারি মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারতে চলে যান এবং তার স্থলে ডাক্তার মালিক পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তার তপশিলী হিন্দুদের কোন সাহায্য করতে পারেনি—এমনকি লিয়াকত আলী খান যখনই যে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন যোগেনবাবুকে ডাকা হত না। লিয়াকত আলী খানের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে যাঁদের ডাকতেন তাঁরা হলেন—গোলাম মোহাম্মদ এবং ফজলুর রহমান সাহেবদ্বয় আর উপস্থিত থাকতেন সেক্রেটারী-জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। কিন্তু যোগেন মণ্ডলের ধারণা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী কেবল তাকেই বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। সিলেটে রেফারেন্ডামে তার দান ছিল

অনস্বীকার্য এবং তার জন্যেই আমরা তপশিলী সম্প্রদায়ের ভোট পেয়েছিলাম সে রেফারেণ্ডামে। যখন অনেক মুসলিম নেতা যেমন স্যার সাদুল্লাহ্ এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রেফারেন্ডামে কোন সাহায্যই করেননি।

যেগেন মণ্ডল চলে যাওয়ায় ১৯৫০ সনে সর্বপ্রথম তপশিল সম্প্রদায়—বিশেষ করে তাদের মধ্যে কৃষক শ্রেণী পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। ভারত সরকার ১৯৪৭ সনে যারা দেশত্যাগ করে কলকাতা গিয়েছিল—তাদের প্রতি ধর্মের দিক থেকে সহানুভূতি থাকলেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকে তারা কেবল বোঝা হয়ে রইল। তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে ঘোলাটে করেছে ঐ দেশের কোন উপকার করেনি। কিন্তু ১৯৫০ সনে যারা দেশত্যাগ করে ভারতে গেল তাদের ভারত সরকার স্বাগতম জানাল—তাদের জমি দিল, হালের বলদ দিল পাট বোনার জন্যে এবং তাদের প্রচেষ্টায়ই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাট চাষ আরম্ভ হয়—এবং ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাট রফতানীকারী দেশে পরিণত হয়। তাছাড়া ১৯৫০ সনে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ার আরো কারণ ছিল—সেটা সামাজিক। হিন্দু সমাজ ১৯৪৭ সন থেকেই গোসাই-ব্রাহ্মণের অভাব অনুভব করছিল কারণ পূজা দেবার জন্যে ঠাকুর পাওয়া যাচ্ছিল না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবার অসুবিধা তারা অনুভব করছিল—কিন্তু তবু তারা মাটির আকর্ষণে দেশ ছাড়েনি। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নানাভাবে তাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করল হিন্দুদের জমি দখলের জন্যে। শহরে বিহারীদের যে উদ্দেশ্য ছিল দাঙ্গা বাধাবার পেছনে—ঠিক একই উদ্দেশ্যে, যোগেন মণ্ডলের যাবার পরে, গাঁয়ের মুসলমান মোড়লদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেখা দিল। লোভ তাদের পেয়ে বসল—যার ফলে সামরিক লাভ হলেও পরবর্তীকালে সকল বাঙালীকে তার খেসারৎ দিতে হয়েছে এবং দিতে হবে। তপশিলী কৃষক যাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমার, কামার, স্বর্ণকার, কাঠমিস্ত্রী, জেলে প্রভৃতি দেশ ছাড়তে আরম্ভ করে। পূর্ববাংলার মেরুদণ্ড ভাঙ্গায় ১৯৫০ সনের সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা প্রভূত সাহায্য করেছে।

যোগেন মণ্ডল ভারতে চলে যাবার পর ডাঃ মালিক কেন্দ্রে শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় একটি জাতির ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গড়ে উঠল। করাচী রায়পন্থী খতিব সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদকে সেক্রেটারী করে ১৯৫০ সনে (All Pakistan Confederation of Labour; APCOL) গঠিত হলো। ওয়ার্কিং কমিটিতে ২১ জন সদস্য নেয়া হলো। পূর্ববাংলা থেকে থাকল ডা. মালিক, মোহাম্মদ সোলেমান, গোলাম মর্তুজা, জহুর আহমদ চৌধুরী, আফতাব আলী আর আমি। ডাঃ মালিকের ইচ্ছা ছিল ফেডারেশন করার কিন্তু আমি বললাম, দুই পাকিস্তানের মধ্যে কেবল কনফেডারেশনই হতে পারে—পরিশেষে স্থির হলো যে, পশ্চিম পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার ও পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার সব ব্যাপারেই স্বাধীন থাকবে কেবল বিদেশে কে যাবে সেটা স্থির করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালিক—APCOL-এর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী।

করাচী থেকে ফিরে এসে আমরা দেখলাম যে, নূরুল হুদা সাহেববকে ট্রিপারটাইট লেবার কনফারেন্সে ডাকা হয়নি বলে তিনি ফয়েজ আহমদের বিরুদ্ধে কেবল কুৎসা

রটনা করেই ক্ষান্ত হননি নারায়গঞ্জে সুতাকলের শ্রমিকদের এক সভায় ফয়েজ আহমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফয়েজ আহমদ। ফয়েজ আহমদ কাউন্সিল সভা ডেকে নূরুল হুদা সাহেবকে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব পাস করেন। সে কাউন্সিল অধিবেশনে আমাকে পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব্ লেবার সভাপতি নির্বাচন্ করেন। ফয়েজ আহমদ সাহেব সেক্রেটারী, আফতাব আলী ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জহুর আহমদ চৌধুরী সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সভাপতির বক্তৃতায় আমি যা বলেছিলাম তার একটা মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো,—

"পূর্ব পাকিস্তানে সত্যি বলতে এখনো কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। ডজনখানেক সুতাকল আছে সারা বাংলাদেশে তার বেশির ভাগই নারায়ণগঞ্জে। চা-বাগানের লক্ষাধিক শ্রমিক আছে যারা সিলেট জেলায়ই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল শ্রমিকদের মধ্যে অনেক শ্রমিক রয়েছে তাদের বেশির ভাগই চট্টগ্রামের বাসিন্দা। আমাদের দেশে জাহাজী শ্রমিক প্রায় দু'লাখ, কিন্তু জাহাজী শ্রমিকদের তালিকাভুক্তির জন্য বাণিজ্যিক জাহাজ কোম্পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কলকাতা এখন আর যাওয়া চলে না—করাচী বহুদূরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে মাদ্রাজী জাহাজী শ্রমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে আর করাচী থেকে মাকরাণীদের তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ জাহাজীদের জন্যে অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে বাংলাদেশের বিস্তর ক্ষতি হবে। জাহাজী শ্রমিকরা প্রায় সবই সিলেট জেলাবাসী। এরা সবাই বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে।

কলকাতার পাটকলে, জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানায়, আসামের তেলের খনিতে যারা কাজ করত বা এখনো করছে তারা বেশির ভাগই নোয়াখালীর অধিবাসী। কলকাতা পোর্টের ম্যারিনার্সদের বেশির ভাগই চট্টগ্রামের বাসিন্দা হলেও নোয়াখালীর লোকও রয়েছে। কলকাতার হোটেলগুলোতে যারা টেবিল-বয় এর কাজ করছে তারা বেশির ভাগই ঢাকার লোকেরাই করত। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তারা অনেকেই দেশে ফিরে এসে বেকার জীবনযাপন করছে।

পাকিস্তান হবার পর যেহেতু প্রায় ৭০ লক্ষ বাস্তুহারা ভারত থেকে করাচী গিয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্যে সরকার স্থির করেছেন করাচীই প্রথম শিল্পায়িত করতে হবে। আমাদের পূর্ববঙ্গে কয়েক লক্ষ বাস্তুহারা এসেছে—তাদের জন্যে আদমজী, বাওয়ানী ও ইস্পাহানীরা পাটশিল্পের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। এসব কারখানায় বাঙালী শ্রমিকদের খুবই কষ্ট হচ্ছে—তার কারণ তারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রথম তালিকাভুক্ত করে—তাছাড়া তাদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রথম কাজ। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্যেই সরকার এসব কারখানায় মালিকদের বৈদেশিক মুদ্রা দেবার আশ্বাস দিয়েছে। এসব কারখানায় তাই বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা অসুবিধা হয়েছে। এখন ঐসব কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চাই না।

আমাদের কারখানাগুলোতে জমিহারা কৃষক পেশাচ্যুত হস্তশিল্পী, বেকার শহুরে যুবকরা চাকুরী নিতে আসে। আমাদের দেশে জমিহারা কৃষক খুবই বেশি তাই তারা শহরে বেশি সংখ্যায় চাকুরী প্রার্থী। সুতরাং বেতনের জন্যে তারা দর কষাকষি করতে পারে না বিগত চার বছরে শ্রমিকদের জন্যে কোন আইনই করা হয়নি। ভারত বিভক্তির সময় যে সকল শ্রম আইন ভারতে ছিল আমরা তাও উপভোগ করতে পারছি না। ইউনিয়ন করার অসুবিধা হচ্ছে—মালিকরা ইউনিয়ন যারা করতে চায় তাদেরই বরখাস্ত করে দেয়। নতুন দেশ, তাই জনসাধারণ উৎপাদন চায়, শ্রমিকদের কোন আন্দোলন পছন্দ করে না। শ্রমিকরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে তাই শ্রমিকদের শিক্ষিত করতে, সংগঠন করতে বাইরের শ্রমিক নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। বাইরের শ্রমিক নেতাদের প্রয়োজন সেদিনই ফুরিয়ে যাবে যেদিন শ্রমিক সমস্যা সচেতন হবে ও শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমরা আশা করছি যে, মিল মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে এবং বড় বড় মিল—তাদের লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্যে বেশি করে শ্রমিক নিয়োগ করবে এবং অনেক মজুর একত্রে থেকে কাজের মধ্যদিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। APCOL-এর কাজ হবে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মত আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার করে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কোন চাপই সৃষ্টি করতে পারবে না যদি আঞ্চলিক ফেডারেশনগুলো শক্তিশালী না হয়। আবার আঞ্চলিক ফেডারেশনগুলে শক্তিশালী হতে পারে না যদি তাদের সদস্য ইউনিয়নগুলো ভালভাবে সংগঠিত না হয়। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, একমাত্র মজুর শ্রেণীই সমাজতন্ত্র আনতে পারে না, কারণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পূর্বশর্ত সদবুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্লবী নেতৃত্ব এবং যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে সে নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে না—সেজন্যেই মেহেনতি জনতার জন্যে আমরা দেখি কার্লমারক্স, লেনীন, মাও-সে-তুং-এর তাত্ত্বিক চর্চা। তাঁদের লেখা পড়লেই বোঝা যায় অবস্থার বিশ্লেষণ ও কার্য প্রণালীর পরিকল্পনা ও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও ক্ষুরধার বুদ্ধির ব্যবহার করেছেন। শ্রমিকরা আন্দোলন করতে পারে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে পারে—কিন্তু তাই বলে সফল বিপ্লবের পথে মেহেনতি শ্রমিক সমাজকে সঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারে না। তাই দেখা যায় যথেষ্ট প্রাণ দিয়ে ও মহান আদর্শ সম্মুখে রেখেও ফরাসী বিপ্লব সফল হয়নি—অথচ লেনীন ও মাও-সে-তুং সফল বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক। শিল্পায়িত হতে অনেক বিলম্ব হবে—এখনো আমরা শ্রমিক বলতে কেরাণী সম্প্রদায়কেই মনে করছি—অথচ সত্যিকার শ্রমিক তারা নন। সত্যিকার শ্রমিক যে স্বহস্তে কাজ করে উৎপাদন করে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজ হচ্ছে মজুরদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা তবুও তাদের একটা সামাজিক চেতনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে যাতে উভয়পক্ষ আলাপ-আলোচনা করে তার সমাধান করতে পারে এ অধিকার অর্জন করা শ্রমিক

ইউনিয়নের প্রথম ধাপ। এক কথায় যৌথ দর কষাকষির অধিকার। ঐ দর কষাকষি সম্ভব নয় যদি শ্রমিক ইউনিয়নের অধিকার না থাকে কারখানার লাভ-লোকসানের সমস্ত সংবাদ পেতে। আর সর্বোপরি ইউনিয়নের প্রয়োজন সর্ববিষয়ে মালিক এবং শ্রমিক একত্রে বসে কারখানার ভবিষ্যৎ ও শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অংশীদার হবার অধিকার। সমাজতান্ত্রিক দেশে সেটা আছে বলেই যৌথ দর কষাকষির ব্যবস্থা সেখানে নেই।

ইউনিয়নের শক্তি অনেকটা নির্ভর করবে তার সভ্য সংখ্যার উপর এবং তারা হবে চাঁদাদাতা সভ্য। হিসাবে যেন কোনদিন গড়মিল না হয়—প্রতিটি পয়সার হিসাব সংরক্ষণ করতে না পারলে নেতা আর নেতৃত্বই হারাবে না—ইউনিয়নও ভেঙ্গে যাবে। সংগ্রামের চূড়ান্তরূপ হচ্ছে ধর্মঘট—তাই সকল প্রকার প্রচেষ্টা না চালিয়ে যেসব শ্রমিকরা ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা দেশের ক্ষতি করে দশের ক্ষতি করে। অনেক নেতা পাবেন যাদের ধারণা ঘরের দরজার কাছে বিপ্লব অপেক্ষা করে আছে। দরজা জোর করে খুলে দিলেই বিপ্লব হয়ে যাবে—তারা আপনাদের ভুল পথেই চালাতে পারে—সত্যিকার শ্রমিক দরদী তারা নয়। কারণ বিপ্লব আসার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে না।

অনেক সময় মালিক ধর্মঘট করার জন্যে শ্রমিকদের উত্তেজিত করে। কারো উপর অবিচার অথবা অনর্থক অত্যাচার করে ধর্মঘট হবার জন্যে, কারণ তখন হয়ত তার উৎপাদিত মাল গুদামভর্তি ধর্মঘটের সময় উৎপাদন হ্রাস করে বাজারে গুদামের মাল বেশি দামে ছাড়তে পারে। অনেক সময় তাদের এজেন্টরা ধর্মঘটের সাহায্য করে তাদের হাতের মাল বেশি দামে বিক্রি করার জন্য। তাই ধর্মঘটগুলোকে কখনো কখনো হাল্কাভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশনের সভাপতি ছিলাম। ১৯৫৫ সনে আওয়ামী লীগে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলে আমি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ করি।

১৯৪৮ সনের শেষের দিকে খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্ণর-জেনারেল হবার পরেই তাঁরই অনুরোধে লিয়াকত আলী খান পূর্ববাংলার জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং আইয়ুব খানকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এড্‌জুটেন্ট-জেনারেল নিযুক্ত করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ভাষা আন্দোলনের সময় বর্ধমান হাউস ছেড়ে আইয়ুব খানের অতিথি হয়েছিলেন নিরাপত্তার প্রয়োজনে। বাংলাদেশের লোকেরা এ সম্বন্ধে কোন মনোযোগ দেখায়নি। তবে তাঁর ঐ নিযুক্তির উপলক্ষে বাবু রণদাপ্রসাদ সাহা এবং আরফান খান সাহেব আইয়ুব খানকে ঢাকা ক্লাবে এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। ঐদিনই শহীদ সাহেব এসেছিলেন ঢাকায় একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। খাজা নসরুল্লাহ্‌র মেয়ের বিয়ে কাদেরী সাহেব (আই. সি. এস.)-এর সঙ্গে। খবর পেয়ে রণদাবাবু ও আরফান খান সাহেব দু'জনেই তাঁকে নৈশভোজে যোগ দেবার জন্যে ধরেন। ১৯৪৩ সন থেকেই বাবু রণদা সাহার সঙ্গে শহীদ সাহেবের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং রণদাপ্রসাদ বাবু যখন কুমুদিনী হাসপাতাল উদ্বোধন করার জন্যে গভর্ণরকে আমন্ত্রণ করার কথা শহীদ সাহেবকে বলেন তখন শহীদ সাহেবই তার ব্যবস্থা করে দেন। রণদাবাবু তাঁর

"মীর্জাপুর বোটে" করে গভর্ণর ও শহীদ সাহেবকে মীর্জাপুর নিয়ে যান। রণদাবাবু অপূর্ব করে সাজিয়েছিল মীর্জাপুরকে সে উপলক্ষে যারা উপস্থিত ছিল তারা অনেকদিন তা ভুলবে না। শহীদ সাহেব রণদাবাবুর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সবাই ঢাকা ক্লাবে এসে গেছেন, মন্ত্রীরা সবাই এসেছেন—সবাই বসেছেন এমন সময় সবার পরে শহীদ সাহেব এলেন—সাদা প্যান্ট ও বুশসার্ট পরে। এক কোণার টেবিলে বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রণদাবাবু তাঁকে "মেইন টেবিলে" নিয়ে এসে আইয়ুব খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শহীদ সাহেব বললেন,—"Nice to meet you General". আইয়ুব তাঁর "শান্তি মিশনের" ব্যাপারটা জানতেন—তাই তিনি শুধু বললেন, "হ্যালো" অন্য কোন কথা না বলেই তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। হাবিবুল্লাহ্ বাহার সাহেব স্বভাবিকভাবেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কথার মধ্যে বাংলায় বলে ফেললেন,—"পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ ধরবে অসি আর পূর্বাংশ ধরবে মশি। পূর্ববাংলার লোকেরা যুদ্ধ করতে জানে না, কিন্তু কবিতা লিখে বীরের প্রশংসা সাহিত্য, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করতে জানে। আপনারা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন আর আমরা আপনাদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, অমর করে রাখব।" বাংলা বলে আবার ইংরেজীতে তার অনুবাদ করে দিলেন। শহীদ সাহেব হঠাৎ মুখ খুলেন—বললেন,—

"Dear Minister, your statements need amendments. Bengalees are courageous enough to protect themselves. As a Prime Minister when I visited Dacca in 1946 I was impressed when I learnt that a Dacca boy of fifteen years had the courage to stab a Sikh in broad-daylight in the market."

সবাই তাঁর দিকে তাকালেন। বাহার সাহেব অপ্রস্তুত হলেন। আর আইয়ুব খান, আজিজ আহমদ প্রভৃতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে রইলেন—কিন্তু কেউ তাঁকে ঘাটালেন না। নৈশভোজটা জমল না আর।

হামিদুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে PRODA মামলা আনা হলো হামিদুল হক নিজেই তাঁর মামলা পরিচালনা করেছিলেন। সেই মামলায় চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ সাক্ষ্য দেবার সময় বললেন যে, তিনি মন্ত্রীদের কার্যকলাপও নোট করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট পাঠান। ঐ মামলায় এটাই প্রমাণ হলো যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নামে আমলাতন্ত্র চলছিল। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আমলারাই পরিচালিত করত। ১৯৫০ সনে হামিদুল হক চৌধুরীকে সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার অযোগ্য বলে বিবেচিত হলো।

সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে এড্জুটেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্থান সেনাবাহিনীর প্রথম পাকিস্তানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের পদে নিযুক্ত হন। আইয়ুবের এ পদোন্নতি সম্পূর্ণ খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বদৌলতে। জিন্নাহ্ সাহেব আইয়ুব বাউণ্ডারী কমিশনে থাকতে যেসব অপকর্ম করেছিলেন—তার জন্যে তাঁকে কোর্ট মার্শাল করতে চাইলে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবেই তাঁকে বাঁচিয়ে পূর্ববাংলায় GOC করে নিয়ে আসেন। খাজা সাহেব গভর্ণর-জেনারেল হবার পর লিয়াকত সাহেবকে বলে তাঁকে

Adjutant General করে পিণ্ডী নিয়ে যান—এবং পরে তাঁকেই লিয়াকত আলী খান অনেক সিনিয়র অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে সি. এন. সি. নিযুক্ত করেন। অল্প বয়সে এত দ্রুত প্রমোশন পাবার ফলে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হতে পারেনি—যার ফলে পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক হবার জন্যে তাঁর প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এদিকে শেখ আবদুল্লাহ্ কাশ্মীরে গণভোটে গণ-পরিষদ গঠন করার সংকল্প ঘোষণা করাতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তাঁকে সাবধান করে দেন যে, যদি ঐ ধরনের কোন পরিকল্পনা তাঁর থাকে, আর যদি তা অবিলম্বে শেখ সাহেব পরিহার না করে তবে পাকিস্তান তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যখন গণ-পরিষদের নির্বাচন হয়ে গেল তখন লিয়াকত আলী খান নির্বাক হয়ে গেলেন। সেই সাবধান বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোন পরিকল্পনার কথা আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর ও তৎসঙ্গে পাকিস্তানের মান কমে গেল। লিয়াকত আলী খানের অমনি করে বড় বড় কথা বলা এবং সে অনুসারে কাজ না করা তাঁর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বজ্রমুষ্টি দেখাত সবাইকে এবং সেই বজ্রমুষ্টির ছবি কাগজে কাগজে ছাপা হত—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সকলের নিকট তাঁর অভিনয় অনেকটা হাসির খোরাক জোটাত।

১৯৫০ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কিছুদিন পরেই আবুল হাসিম সাহেবের নিকট থেকে তার পেলাম। তিনি ঢাকায় চলে আসছিলেন সবাইকে নিয়ে। বুঝলাম তাঁকে শেষ পর্যন্ত বর্ধমান ছাড়তে হলো। বাপ-দাদার বাড়ি-ঘর ছেড়ে আসা বিশেষ করে আবুল হাসিম সাহেবের পক্ষে যাঁরা বংশের রয়েছে একটা ঐতিহ্য—যাঁর পিতার নামানুসারে তাঁদের গ্রাম কাশিয়ারার নাম হয়েছে কাশিমনগর—সে গ্রাম ছেড়ে আসা। সহায়, সম্পদ, আত্মা, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন সবকিছু ফেলে স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের হাত ধরে নিঃসহায় অবস্থায় ঢাকায় আসছেন—কে আছে তাঁর এখানে, কোথায় উঠবেন, কোথায় থাকবেন, কি করবেন। এই কি আজাদী—এই কি স্বাধীনতা, এই কি রাজনীতির শেষ পরিণতি ?

জলিল সাহেবও তার পেয়েছেন। জলিল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমাকে বললেন যে, তাঁদের বাড়িতেই আবুল হাসিম সাহেব থাকবেন যতদিন না অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায়।

আবুল হাসিম সাহেবের বর্ধমানের বাড়িতে হিন্দুরা আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি অন্ধ সে অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে শহরে তাঁর পরিচিত অনেক বন্ধুর বাড়িতে উঠবার চেষ্টা করেন। হিন্দু ব্যক্তিগত বন্ধু ও কমিউনিস্ট যারা তাঁর নিকট থেকে উপকার পেয়েছে এককালে তারা কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। একদিন যে অজস্র যুবকদের প্রেরণা যুগিয়েছে তিনি আজ অসহায়। কতটা অসহায় যে তিনি সেটা বোঝলেন যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বর্ধমান শহর থেকে গাঁয়ের বাড়ি গেলেন—যখন অন্য ধর্মের প্রজারা তাঁকে বললেন যে, তাঁর কোন ভয় নেই। "আমরা জীবিত থাকতে আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না।" এটাই তাঁকে সবচেয়ে বড় আঘাত করেছে। যুগ যুগ ধরে যারা মনিবের উপর ভরসা করে বেঁচেছে তাদেরই ভরসায় আজ বাঁচতে হবে—এ ছিল সামন্ত অভিজাত বংশের মানুষের উপর নিষ্ঠুরতম আঘাত। তখনই স্থির

করলেন তিনি পাকিস্তানে আসবেন।

আমার ভয় হলো নূরুল আমীন সাহেব কি ব্যবহার করবেন তাঁর সঙ্গে। নূরুল আমীন সাহেবের সরকার ১৯৪৮ সনের দিক ক্ষমতায় আসার পর যে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছেন তা থেকে ঐ অন্ধ, অসহায়, কপর্দকহীন লোকটি কি রক্ষা পাবে ?

আমরা কিছুদিন পূর্বেই আমাদের গণ-আজাদী লীগ (People Freedom League)-কে সিভিল লিবারটীজ লীগে পরিণত করেছি। কোর্টে রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষ সমর্থন করতে জামিনের ব্যবস্থা করতে—ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্যে জনমত সৃষ্টি করতে। কিন্তু আমরা কতটা সাহায্য করতে পেরেছি ? ১৯৫১ সনের ১৭ই জানুয়ারি আইয়ুব খান জেনারেল গ্র্যাসীর নিকট থেকে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর ঐ নিযুক্তি সিনিয়র অফিসাররা আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারেননি। ফলে আইয়ুব ও দেশরক্ষাসচিব ইস্কান্দার মীর্জা একযোগে ষড়যন্ত্র করে যাদের আনুগত্যের প্রতি তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল তাদেরই সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। ঐ সময় কাশ্মীরে হানাদার ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে লড়াই চলছিল—জেনারেল আকবর খান ছুটি নিয়ে জেনারেল তারিক ছদ্মনামে হানাদারদের পরামর্শ দিয়েই কেবল সাহায্য করেননি, পাকিস্তান সৈন্যদের ছুটি দিয়ে-হানাদারদের পক্ষে যুদ্ধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করে সৈন্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

আইয়ুব তাঁর লোকপ্রিয়তায় ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠল এবং ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো আকবর খানকে বিপদে ফেলার জন্যে। তার সুযোগও এসে যায়। "ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন"-এর (ডিব্লউ. এফ. টি. ইউ.) এক প্রতিনিধিদল তখন পিন্ডীতে এসেছিলেন এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও সাজ্জাদ জহীরের সঙ্গে এক নৈশ্যভোজে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে কাশ্মীরের ব্যাপার আলোচনা করার জন্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ জেনারেল আকবর খান এবং অন্যান্য জেনারেল যাঁরা তখন ছুটিতে থেকে আকবর খানের সঙ্গে কাশ্মীর লড়াইর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তাঁদেরও নিমন্ত্রণ করেন। ইস্কান্দার ও আইয়ুব প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের খবর হচ্ছে যে রুশ সাম্যবাদীদের সঙ্গে আকবর খানের একটা সমঝোতা হয়ে গেছে এবং আকবর খান সরকার উৎখ্যাত করার জন্যে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। লিয়াকত আলী খানের বিশ্বাস হলো এ জন্যে যে, নেহেরু আমেরিকা থেকে ইতিমধ্যে সরকারিভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন—কিন্তু লিয়াকত আলী কোন নিমন্ত্রণ পাননি। সাজ্জাদ জহীরকে একথা বলতেই সাজ্জাদ তাঁর জন্যে মস্কো থেকে নিমন্ত্রণপত্র আনার ব্যবস্থা করলেন। এখানে উল্লেখ করা যায় ভারতের ইন্টারিম সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে লিয়াকত আলী বাজেট-বক্তৃতা করেছিলেন তা সাজ্জাদ জহীরের খসড়া। মস্কো থেকে সত্যিই নিমন্ত্রণপত্র এল। আমেরিকা খবর পেয়েই লিয়াকত আলীকে নিমন্ত্রণ করে পাঠায়। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস হলো যে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও সাজ্জাদ জহীরের মস্কোর প্রথম লাইনের লোকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নিবিড় বন্ধুত্ব আছে।

ঐ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইস্কাদার মীর্জা, আইয়ুব খান ও পুলিশ কর্ণধার কোরবান আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে আইয়ুবের তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁদের গ্রেফতার

করার ব্যবস্থা করেন এবং পরে তাঁদের একটি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা হয়। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ সাক্ষী আর রাষ্ট্রবিদ্রোহের মামলা সুতরাং পাঞ্জাবের কেউ মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করতে রাজী হলেন না। করাচীর এ. কে. ব্রোহী সাহেব সরকারি পক্ষে। আকবর খানেব স্ত্রী নাসীমা খান শহীদ সাহেবকে ধরে পড়লেন। শহীদ সাহেবের বন্ধুরা তাঁকে ঐ মামলার ব্রীফ গ্রহণ না করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু শহীদ সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। চীফ্ জাস্টিস আবদুর রশীদ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন।

জেরায় কতগুলো কথা বের হলো। প্রথম, যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীরা বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে এসেছে তাই সবার উপর সুবিচার হচ্ছে না, হয়ত হওয়াও সম্ভব নয়। কায়েদে আযমের সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা ছিল না। এবং লিয়াকত আলী সাহেবের ঐ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ডিফেন্স সেক্রেটারী ইস্কান্দার মীর্জার কথামতই কাজ করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। অনেক নীচের লোককে দ্রুত প্রমোশন দেয়ায় তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে গিয়েছিল। অনেক অফিসাররাই মনে করতেন যে, লিয়াকত আলী সরকার কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারেন না—কারণ তাঁরা সকল ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ।

আইয়ুব খানে জেরার সময় প্রথম বলেছিলেন যে, খাজা শাহাবুদ্দীন প্রথম খবর দেন প্রধানমন্ত্রীকে—কারণ শাহাবুদ্দীন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—পরে আবার যখন প্রশ্ন করা হলো যে, সরকারের "ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ" বেশি "এফিসিয়াণ্ট" না "আর্মি ইন্টেলিজেন্স" ? উত্তর দিলেন যে, "আর্মি ইন্টেলিজেন্স"। শহীদ সাহেব বললেন, 'তাহলে তো সর্বাগ্রে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের নিকটই প্রথম খবর আসা উচিত।' আইয়ুব উত্তরে বলেছিলেন যে—তিনি খবরটা আগেই পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আরো 'চেক' করছিলেন। এমন সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গভর্ণর চুন্দ্রিগড় খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন। জাস্টিস রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই বলেছেন খাজা শাহাবুদ্দীন প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম খবর দিয়েছেন। আইয়ুব বিরক্ত হয়ে বললেন যে, তাঁরা দু'জনেই খবর দিয়েছেন—তবে কে আগে কে পরে তাঁর তখন ঠিক স্মরণ পড়ছে না। এ অবস্থায় শহীদ সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, যারা দ্রুত প্রমোশন পেয়েছে তারাই ঐ মামলাটি সাজিয়েছেন—তাদের ভবিষ্যৎ নিষ্টন্টক করার জন্যে। আইয়ুব ঐ প্রশ্নে তেলে-বেগুনে ক্ষেপে গেলেন এবং জবাব দিতে অস্বীকার করলেন। জজ সাহেব বললেন যে, 'ওটা আসামীর "সাজেসনে" আপনি বলতে পারেন যে, ওটা সত্যি নয়—কিন্তু আপনি "হা"-"না" একটা কিছু বলতে হবে।' আইয়ুব শুধু বললেন যে, 'আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান, আমাকে এমনি প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল।' জজ সাহেব তাঁকে উকিলের কর্তব্য সম্বন্ধে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেও তাঁর নিকট জবাব পাবার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। আইয়ুব সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেবে এলেন এবং বাইরে চলে গেলেন।

পরবর্তীকালে আইয়ুব খান তাঁর পুস্তক "FRIENDS NOT MASTERS-এ বলেছেন,—

"Suhrawardy was a complex character, a man who loved the gay life of night-clubs and had tremendous energy and drive. He took great delight in attacking the army officers who appeared as witnesses and I felt he far over-stepped the mark in his cross-examination. The Court, however, remained passive. There was nothing I could do about it at the time. The conspirators were convicted and sentenced. Some years later Suhrawardy and his supporters prevailed on the government to release them. That was the prerogative of the government and I could not object, but what I could not forgive was Suhrawardy's unnecessarily harsh and undignified cross-examination of the army officers."

তিনি আরো তাঁর পুস্তকে এ ব্যাপারে লিখেছেন,—

"The Rawalpindi conspiracy had deep roots; it grew in the soil of discontent and distrust and it was able to develop for several reasons. There was considerable unrest among the officers caused by a spate of swift promotions from junior to senior ranks. This raised expectations of unwarranted heights. Every officer felt that unless he was made Commander-in-Chief no one would believe that he had done well in life...

But I think the main reason for this discontent was that we had a government which failed to discharge its functions properly. When Akbar Khan's papers were seized we found among them a thesis is which he had accused the Prime Minister and everybody else in the government of inefficiency and inability to give decisions. Akbar Khan's aim was to establish a tidier form of government. He knew how to influence people and he had cast his net widely and unobtrusively."

উপরের বিশ্লেষণ দেখে মনে হয়, আইয়ুব পাঁচ বছর পর ঐ কাজটিই করেছেন,—তবে তার পূর্বে ইস্কান্দার মীর্জাকে দিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতাকে দেশের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে, তারপর ইস্কান্দার মীর্জাকেই তিন সপ্তাহ পরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৫১ সনের ১৬ই অক্টোবর পিন্ডীতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার কক্‌ওয়ালিস আমাদের সেই উপলক্ষে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। ১৬ তারিখে আমাদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ ছিল চীফ্ সেক্রেটারী আজিজ আহ্‌মদ-এর বাড়ি। ১৬ তারিখে বি. টি. ইউ. সি.'র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আমরা দুপুরে লাঞ্চ খাই গ্রীণ হোটেলে।

পিন্ডীর সংবাদ ঢাকায় তখনো এসে পৌঁছেনি। রাতে আজিজ আহ্‌মদ সাহেবের বাড়ির সম্মুখে দেখলাম সাইনবোর্ডে লেখা "ডিনার ক্যান্সেলড্"। আমরা তো অবাক তখন অতিথিদের নিয়ে আবার কোথায় যাই। একজন লোক এসে খবর দিল যে, আজিজ আহ্‌মদ সাহেব গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই। কাল ভোরে তিনি ও মুখ্যমন্ত্রী চলে যাচ্ছেন করাচী। আজিজ আহ্‌মদের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। আমরা সবাই খবর শুনে খুব "শকট্" হলাম। পরে অতিথিদের নিয়ে হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা বিদায় নিলাম দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

পরের দিন কাগজে খবর বেরুল। আমরা অবাক হলাম যখন খাজা সাহেবের বিবৃতি দেখলাম। তিনি বলেছেন,—'The cabinet to day has given me the onerous responsibility of being Pakistan's Prime minister".

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর তাঁর মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারেন না। খাজা সাহেবের উচিত ছিল মুসলিম লীগ পার্টির সভা ডেকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করতে বলা এবং নির্বাচিত নেতাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলা—বড়জোর তিনি পুরাতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ইতিমধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে বলতে পারতেন। ফজলুর রহমান সাহেব ভাবলেন যে, নাজিমুদ্দীনকে সম্মুখে রেখে তিনি রাষ্ট্র চালাবেন। পাঞ্জাবী সদস্যদের অমত ছিল না—কারণ পূর্ববাংলা থেকে যখন প্রধানমন্ত্রী করতেই হবে তখন সেই সবচেয়ে সোজা লোক—তাছাড়া গোলাম মোহাম্মদ যখন গভর্ণর-জেনারেল হচ্ছেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন এবং অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন—কিছুদিন তিনি সেক্রেটারী জেনারেল ও অর্থমন্ত্রী দু'টো পদই দখল করে রাখলেন—পরে স্থির হলো যে, তাঁর পরে আর কেউ সেক্রেটারী জেনারেল হবেন না।

১৯৫১ সনেই "ইয়্যূথ লীগ" গঠিত হয়। তোহা সাহেব প্রেসিডেন্ট ও অলী আহাদ সাহেব সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। "ইয়্যূথ লীগ" পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একটি অঙ্গবিশেষ ছিল। বেশ কিছুসংখ্যক ছেলে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউরী পার হয়ে গেছে অথচ রাজনৈতিক কারণে চাকুরীর আশা নেই তারা সবাই ঐ সংস্থায় যোগ দিতে আরম্ভ করে। তাছাড়া অলী আহাদ সাহেব নিজে তখন ভাল কর্মী বলে সুপরিচিত ছিল।

আগস্ট মাসে সরকারী অফিসের কেরাণী সম্প্রদায় ১৯৫১ সনে ই. পি. এফ. এল.-এর বাইরে গিয়ে ইউনাইটেড কাউন্সিল অব্ এসোসিয়েশন্স অব্ সিভিল এম্প্লইজ অব্ পাকিস্তান UCACEP গঠন করেন। সর্বশুদ্ধ এগারোটি সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়ন ঐ সংস্থায় যোগদান করেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে বিশেষ বেতন কমিশন গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২৩টি কনভেনশন সরকার গ্রহণ করেছিল—কিন্তু কনভেনশনের প্রেক্ষিতে কোন আইন করা হয়নি ১৯৫৯ পর্যন্ত। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ৭ নম্বর কনভেনশন আর কনভেনশন নম্বর ৯৮, কনভেনশন নম্বর ৮৭ বলে,—

> Freedom of Association and Protection of the Right to organize. The Convention guarantees:

a. The right of workers and employers to establish and join organizations of their own choosing.
b. The right of workers' organizations to draw up their own coanstitution and rules, select their representatives in full freedom and organise their activities.
c. The proection of workers' and employers' organizations from dissolution and suspension by administrative authority.
d. The right to establish and join federations and confederations and affiliate them with international organizations of workers and employers, and
e. The protection of the free exercise of the right to organize."

কনভেনশন নম্বর ৯৮ নিম্নরূপ,—

"Workers shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of thir employment. **Workers' and Employers' Organizations shall enjoy adequate protection against interference by each other in their establishment, functioning or administration .** Machinery shall be established, when necessary, for the purpose to ensuring respect for the right to organise. The convention does not deal with the positions of public servants and the extent to which its provisions shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national regulations."

শ্রমিক নেতাদের জন্যে উপরোক্ত দু'টো কনভেনশন শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে নিতে আমাদের দেশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ১৯৬৮ সনে নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিকদের পক্ষে তাদের দাবী-দাওয়া করার জন্যে অনেক খড়কুটো পোড়াতে হয়েছে। ৮৭ নম্বর কনভেনশনে আমাদের অধিকার দেয়া হয়েছিল সংগঠন করার আর ৯৮ নম্বর কনভেনশনে আমরা পেয়েছিলাম যৌথ দর কষাকষির ক্ষমতা। শ্রমিকদের শোষণ ও শাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ছিল এক ভয়ানক বিপদ।

একটি উদাহরণ দেয়া যায়। ঢাকার টেলিগ্রাফ কর্মচারীদের পক্ষে অনেক আবেদন-নিবেদন করেও তাদের বেঁচে থাকার মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ পাওয়া সম্ভব হলো না। তখন তারা স্থির করল যে, কাজের দ্রুততা কমিয়ে দেবে—কারণ তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেই পূর্বের মত পরিশ্রম করা সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ বিভাগ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—নেতৃস্থানীয় যারা যেমন তাদের সেক্রেটারী—এ. আর. সুন্নামত সাহেব ও অন্যান্য ইউনিয়ন সদস্যদের বিরুদ্ধে চার্জশীট হলো কেন তাদের "গো-শ্লো" অভিযোগ চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না কারণ দেখাতে বলা হলো—সঙ্গে সঙ্গে তাদের "সাস্‌পেণ্ড" করা হলো। এখানেই শেষ নয়, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের

অভিযোগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে স্পেশাল ফি দিয়ে ঢাকার সেরা ফৌজদারী উকিল রেজাই করিম সাহেবকে নিযুক্ত করল। মামলা সেশনে এল। গোলাম মাওলা সাহেবের কোর্টে মামলা এলো বিচারের জন্যে। আমি ইউনিয়নের পক্ষ সমর্থন করি। দায়রা মামলা পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে চলেছিল। আমার ওকালতি জীবনে ওটাই আমার দীর্ঘতম এক ফৌজদারী মামলা। শাহ্ আজিজুর রহমান সাহেব তখন সবেমাত্র আইনব্যবসায়ে যোগদান করেছেন—তাঁকে রাখা হলো আমার সহকারী হিসেবে। রেজাই করিম সাহেব ইচ্ছে করেই মামলা দীর্ঘতর করেছিলেন—যাতে পয়সার অভাবে ওরা আমার ফিস না দিতে পারে এবং আমি মামলা চালাতে অস্বীকার করি। একটা জিনিস সরকার বুঝতে পারেনি—ওকালতি ছাড়াও শ্রমিকনেতা হিসেবে আমার একটা কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি। পঁয়তাল্লিশ দিন পরে আমাদের ছায়ালজবার শেষ হবার পরে জজ সাহেব জুরীদের দু'দিন ধরে মামালার বিষয়বস্তু এবং আইনের ধারাগুলো বুঝিয়ে দিলেন—জুরী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্যে পাশের ঘরে ঘণ্টাখানেক পরে এসে মত দিলেন যে, আসামীরা নির্দোষ। সরকার এর পরে হাইকোর্টে গেলেন—আমি উপস্থিত ছিলাম দেখতে কি হয়। হাইকোর্টে আপীল গৃহীত হলো না। সুতরাং আমরা হাঁপছেড়ে বাঁচলাম। রাজনৈতিক মামলাগুলোও অমনি দীর্ঘদিন চালাবার চেষ্টা চালাতো সরকার। আমার অমনি একটি মামলার কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসছে। তাজউদ্দীন সাহেব ফকির আবদুল মান্নান সাহেবের নির্বাচন কেন্দ্রে তখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। হঠাৎ একদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতে ডাকাতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সে মামলায় আতাউর রহমান সাহেব ও আমি স্থির করি যে, মামলা যাতে সেশনে না যায় তার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট-এর কমিটিং কোর্টেই পূর্ণ জেরা করা হবে। হলোও তাই—কয়েক সপ্তাহ এবং কয়েক তারিখে মামলা শুনারীর পর তাজউদ্দীন সাহেব বেকসুর খালাস হয়ে গেল। পাকিস্তান হবার পর পরই সরকারের হুকুমে শ্রমিক নেতাদের ও বিরোধীদলের কর্মীদের পুলিশ কেবল জেলেই নিয়ে যায়নি হাজার রকমের হয়রাণী করেছে।

শ্রমিক নেতাদের প্রথম কাজ ছিল—মালিকদের সমকক্ষতার ভিত্তিতে দাবীসমূহের উপর আলোচনা করা। এরই জন্যে আমরা বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম করেছি। রেলওয়েতে ধর্মঘট করে অনেক ইউনিয়ন সদস্য তাদের চাকুরী হারিয়েছে। ১৯৬৮ সনে অবশ্যই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমার চিরকালই এ ধারণা ছিল এবং আজো আছে যে, মেহেনতি মানুষ একদিন তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে। এ না হয়ে পারে না। কারণ মেহেনতি মানুষই দেশের মেরুদণ্ড। তবে সেদিন যতদিন না আসে ততদিন আমাদের তাদের আসার পথে যত বাধাবিঘ্ন আছে তা দূর করতে হবে। অভিজাতদের সরিয়ে দিলেই পথ পরিষ্কার হবে না—তাদের পরে আসবে উচ্চ মধ্যবিত্ত—আবার উচ্চ মধ্যবিত্তের স্থান দখল করবে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত। প্রত্যেক ধাপেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—যত দিনে না বিত্তহীন কৃষক-শ্রমিকদের ভাগ্য তারা নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। সেটা কি ইতিহাসের ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়েই হবে না বিপ্লবের মধ্যদিয়ে হবে তা আমার জানা নেই। হয়ত জীবনসায়াহ্নে

আমি তা দেখেও যাব না। আমার কাজ শুরু তাদের আগমনটাকে যতটা সম্ভব সহজ করে রাখা। ১৯৫২ সনের জানুয়ারি মাসে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববঙ্গে এসেই তাঁর সততা ও সাধুতার খোলস খুলে ফেললেন। ২৬শে জানুয়ারি তারিখে পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। ১৯৪৮ সনে এই খাজা নাজিমুদ্দীনই ওয়াদা করেছিলেন যে, বাংলা ও উর্দু দু'টো ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে পরিষদ থেকে গণ-পরিষদে প্রস্তাব পাঠাবেন।

ঐ বক্তৃতার পরই শহরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। মাওলানা আবদুল হামিদ খান সাহেব ঢাকা মোক্তার লাইব্রেরীতে মুসলিম লীগ ছাড়া সকল পার্টিকে, সকল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানকে, সকল ট্রেড ইউনিয়নকে ডেকে পাঠালেন। ঢাকায় যে কত রকম সংঘ ছিল সেদিন আমি দেখেছিলাম। ১৯৫২ সন ১৯৪৮ সন নয়। এবার আর হিন্দু কে, কমিউনিস্ট কে, কংগ্রেস এ নিয়ে কথা উঠল না। এবারে সকল বাঙালী যেন এক হয়ে দাঁড়াল। এবার আর আহ্সান মঞ্জিল বা তাদের খয়েরখা উচ্চ মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়—এবারকার আন্দোলন বাংলার সকল স্তরের সমুদয় মানুষের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এবারের সংগ্রামের কোন প্রস্তুতিপর্ব নেই, দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই। এবারকার সংগ্রাম যেন আগুনের শিখার মত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সভায় মাওলানা ভাসানী বক্তৃতা করলেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে এক একজন প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক বসবে ১৫০ নং মোগলটুলী অফিসে ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। সে সভায় "কমিটি অব একশনের" কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা করেন মাওলানা সাহেব। ওটাই আমারও ইচ্ছে ছিল—কারণ শ' তিনেক লোকের মধ্যে কোন আন্দোলনের ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা বোকামি। এমনিই মাওলানা সাহেব কঠোর ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। ৭ তারিখে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, কে. জি. মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ছোট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবুল হাসিম সাহেব, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে সভাপতি ছাড়া এল শামসুল হক সাহেব ও আতাউর রহমান খান সাহেব, যুবলীগের মোহাম্মদ তোহা ও অলী আহাদ সাহেব, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমি আর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতিন, কে. জি. মোস্তফা প্রভৃতি। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষে কে. জি. মাহবুব ছাড়াও তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালালউদ্দীন। প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হবে। তার জন্যে সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যে কর্মীদের উপর নির্দেশ দেয়া হলো।

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তাঁর নিজস্ব সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ফলে দীর্ঘদিন কারাজীবন যাপন করছিলেন তাই আমাদের সংবিধান সংক্রান্ত আন্দোলনে বা ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাইনি। তবে তার পরোক্ষ প্রভাব আমরা অনুভব করেছি।

আবুল হাসিম সাহেব বর্ধমান থেকে আসার পর আমার মনে হলো যে, ভারতে দু'বছর বাস করে এবং তিনি নিজে সর্বহারা হয়ে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। তিনি আল্লামা আজাদ সোবহানীর আদর্শে আরো উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর মধ্যে যে মার্কসীয় প্রভাব ছিল ১৯৪৪-৪৬ সনে তা আর তাঁর মধ্যে নেই—তবে প্রগতিবাদী রয়ে গেছেন। ঢাকা এসে তমদ্দুন মজলিসের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন পার্টি গঠন করেন। পার্টির নাম দেন "খেলাফতে রব্বানী" পার্টি। আমার সঙ্গে কয়েকদিন আলাপ হয়েছিল, কিন্তু আমি তাঁর মত ও আদর্শ গ্রহণ করতে পারিনি। অবশ্যই এতে তিনি বেশ দুঃখ পেয়েছিলেন। বর্ধমানে তাঁর বাড়িতে আগুন দেবার পর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে যখন ভিন্ন দেশের পথে যাত্রা করলেন তখন তিনি প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ ও সাম্যবাদীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে এসেছিলেন। অথচ সে অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বদরুদ্দীন উমরের উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতে ও পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে ১৯৪৬ সনের পর থেকে তার জন্য দায়ী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং ছাত্রজীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। তাঁর প্রথম পুস্তক ছিল 'সাম্প্রদায়িকতা', বইটি কি ভারত কি পাকিস্তান দু'দেশেই আদৃত হয়েছিল—কিন্তু পাকিস্তান সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে দেয়। রাজনীতিতে সে বামপন্থী। তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণের জন্যে সমাজে সমাদৃত। রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তান সরকার যখন এদেশে বন্ধ করে দিল তখন কিন্তু পিতা-পুত্র একই সভায় তাঁর বিরোধিতা করেছে। তেমনি ভাষা আন্দোলনেও দু'জনার বাংলা ভাষার প্রতি সমান সমর্থন ছিল।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগঠনের নেতৃত্বে বৃদ্ধ মাওলানা ভাসানীকে বাদ দিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকল শামসুল হক সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে। দু'জনেই কর্মজীবনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দু'জনেরই বাংলাদেশের কর্মীদের উপর প্রভাব ছিল বিস্তর। দু'জনেই নির্যাতিত হয়েছেন মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে। শামসুল হকের পরাজিত হবার পেছনে আমার মতে দু'টি কারণ—একটি বাস্তব রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ। অপরটি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আদর্শের ও কাজের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পূর্ণ সহযোগিতার অভাব।

অন্যদিকে শেখ সাহেবের স্ত্রী পরম ধৈর্যশীলা এবং শেখ সাহেবের রাজনীতির প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। শামসুল হক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে অনুপ্রাণিত করতে পরেননি কারণ বোধহয় শামসুল হকের স্ত্রী আফিয়া খাতুন ভাল ছাত্রী, ভাল চাকুরে আর শামুসল হককে বিয়ে করেছিলেন শামসুল হক পরিষদ সদস্য হবার পর। অন্যদিকে শেখ সাহেবের স্ত্রী বুদ্ধি হবার পর থেকেই তাঁর স্বামীর জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পেরেছিলেন। কারণ বিয়ে হয়েছিল শেখ সাহেবের সঙ্গে যখন তিনি ছোট বালিকা। তাই বাল্যে, কৈশোরে এবং যৌবনে স্বামীর সকল কাজের মধ্যে নিজকে অংশীদার করে ফেলেছিলেন। তাই শামসুল হক জেলে গেলে আফিয়া খাতুন তাঁকে

ছাড়িয়ে আনার জন্যে নূরুল আমীনকে 'বণ্ড' দিতে দ্বিধা করেননি। অন্যদিকে শেখ সাহেবের স্ত্রী শেখ সাহেবের জেলে যাওয়া, নির্যাতিত হওয়া এবং জীবন বিপন্ন করাকে তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত বলে গ্রহণ করে কোনদিন ভেঙ্গে পড়েননি। আফিয়া খাতুন চাইতেন শামসুল হক সাহেব উকিল হবে। হাজারখানেক টাকার আইনের বই তাঁর জন্যে ক্রয়ও করে ফেলেছিলেন। আফিয়া খাতুন ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী এবং পরে প্রফেসর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সচেষ্ট জেলের কয়েদীর সঙ্গে জীবন কাটাবার জন্যে নয়।

শামসুল হক সাহেবের দীর্ঘকাল কারাবাসের পর ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি পান। দু'মাস বিশ্রাম নেবার সময়ও পেলেন না এল ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন। শামসুল হক সাহেব আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুতরাং ইচ্ছে করলেই তিনি পিছিয়ে থাকতে পারেন না—যেখানে ডাক এসেছে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নিকট থেকে। অবশ্যই ঐ ডাক দিয়ে ৭ই জানুয়ারির পর মাওলানা সাহেব তাঁর গ্রামে চলে যান।

১৯৫২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি ৯৮ নং নবাবপুর সড়কে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক অফিসে "কমিটি অব্ একশনের" শেষ সভায় জনাব আবুল হাসিম সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্যান্য আলোচনার পর স্থির হয় যে, আন্দোলন আইন মোতাবেক চালানো হবে। আইন অমান্য করা হবে না। যদি আইন অমান্য করা হয় তবে কমিটি আপনা থেকেই ভেঙ্গে যাবে। ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যুবলীগের অলী আহাদ সাহেব। মাওলানা সাহেব অনুপস্থিত, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কারারুদ্ধ—শামসুল হক সাহেব পরিশ্রান্ত—জীবনযুদ্ধে আর সম্মুখ সারিতে থেকে লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা নিস্তেজ হয়ে গেছে—তার উপর তাঁর স্ত্রীর অসহযোগ—প্রথমা কন্যা শাহীন তাঁকে পেছন থেকে টানছে। দ্বিতীয় কন্যা সাকু সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছে। ঐ অবস্থায় তাঁর নিকট সংগ্রামী নেতৃত্ব আশা করা বাতুলতা। আবুল হাসিম সাহেবের খেলাফতে রব্বানী পার্টি তখনো সংগঠিত হয়নি—তাছাড়া তিনি তখন সর্বহারা। সুতরাং প্রস্তাবের পক্ষেই বেশি ভোট। যুবলীগ সভা ত্যাগ করল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কমিটি অব একশনের প্রস্তাবের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করল। তারা নিজেরা সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করল। কমিটি অব্ একশনের সদস্য বা পরিস্থিতির উপর চোখ রাখার জন্যে সকলে আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে জমায়েত হলো এবং সকাল ন'টায় অলী আহাদ সাহেব এসে খবর দিলেন যে, কয়েকজন পিকেটারদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কর্মীদের সভা ডাকা হয়েছে। স্থির হলো শামসুল হক সাহেব, আজিজ আহমদ এবং কে. জি. মাহবুব সাহেব যাবেন ছাত্রদের সভায় এবং সেখানে "কমিটি অব একশনের" প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করবেন। তাঁরা গেলেন সেখানে, কিন্তু তাঁরা মুখ খুলতে পারেননি ছাত্ররা তখন উত্তেজিত। যুবলীগ ও নতুন করে গঠিত ছাত্র ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই ছাত্রদের নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছেন

এবং তাঁরা 'শ্লোগান' দিচ্ছেন ১৪৪ ধারা মানব না—চলো্ চলো্ পরিষদ ভবনে। সর্বস্তরের ছাত্ররা একত্র হয়েছে—মেয়েরাও এবার এগিয়ে এসেছে। দশজন করে এক এক ব্যাচ ছাত্র-ছাত্রী আইন অমান্য করে পরিষদ ভবনের দিকে যাত্রা করে আর পুলিশ তাদের ধরে পুলিশ-ট্রাকে তোলে—তাদের বেশির ভাগই কুর্মীটোলা বা টঙ্গীতে ফেলে আসে আবার কাউকে কাউকে জেলে আটক করে। এমনি করে বেলা ১টার সময় ম্যাডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে টিয়ার গ্যাস ছাড়া হলো—"টীয়ার গ্যাসের" আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঢিল ও ইট ছোঁড়া শুরু হলো পুলিশের প্রতি। পুলিশও তখন ক্লান্ত, অধৈর্য তাই টীয়ার গ্যাসে কাজ না হওয়ায় পুলিশ সুপার ইদ্রিস সাহেব গুলী চালাবার হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকধারী পুলিশ পজিশন নিল, তারপর কয়েক রাউন্ট গুলী বেরিয়ে গেল। কতজন মারা গেল। কতজন মারা গেল তা নিয়ে অনেক প্রকার সংবাদ শহরে পৌঁছতে লাগল। কমিটির সদস্য ফজলুল হক সাহেবের বাড়িতে নতুন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে উপস্থিত হলেন। সেখানে খবর এসে পৌঁছল যে, বদরুদ্দীন উমর গুলীতে আহত বা নিহত হয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া বা রিকশা কিছুই চলছে না। আবুল হাসিম সাহেবকে একটি লোক সাইকেলের সামনে বসিয়ে ম্যাডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমি গেলাম হাসপাতালে সকল খবর সংগ্রহ করতে। তারপর বিকেলে আবার ফজুলল হক সাহেবের বাসায় গেলাম—পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের কি করণীয় তাই স্থির করতে। "কমিটি অব্ একশন" আর নেই। সুতরাং স্থির হলো যে, "সিভিল লিবার্টিজ লীগকে" "সিভিল লিবারটিজ কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে" পরিবর্তিত করে আমরা আইনের সাহায্যে যতটা ছেলেদের সাহায্য করতে পারি ততটাই করব। আর্মড ফোর্সের সাহায্য চাওয়া হলো—তারা হলগুলোকে ঘেরাও করলেন এবং ধীরে ধীরে আই. জি. জাকির হুসেন, ডি. আই. জি. হাফিজুদ্দীন ও পুলিশ সুপার ইদ্রিস ও শহর সুপার মাসুদের পরিচালনায় ছাত্রদের মাইক ছিনিয়ে নিলেন—অনেক ছাত্রদের গ্রেফতার করলেন। শামসুল হক, কে. জি. মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলী হবার পরেই পলাতক হলেন। যুবলীগের নেতৃবৃন্দ সর্বজনাব মোহাম্মদ তোহা, অলী আহাদ, জামাল জাহেদী ও অন্যান্য কয়েকজন পুরানা পল্টনের এক বাড়িতে ধরা পড়ে। তবু একটা কমিটি দাঁড়া করে রাখা হলো আতাউর রহমান খান সাহেবকে "কনভেনর" করে। ১৯৪৮ সনের মত সরকার এবার পরাভব স্বীকার করলেন না। তার ফলে কোন সমঝোতা হলো না। কোন আলোচনাই হলো না। শহীদ মিনার তৈরি হতে লাগল আর পুলিশ তাই ভাঙ্গতে লাগল। আন্দোলন ক্রমাগত বামপন্থীদের হাতে চলে গেল। সরকারে বর্বরতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়ে উঠল। কবিতা, লেখা, নাটক একুশকে রূপ দিল—ধর্মনিরপেক্ষভাবে। প্রতিবাদ যখন বিফল হলো প্রতিরোধ আরো জোরদার হলো—বাংলার বুদ্ধিজীবীরা সৃজনশীলতার ভেতর দিয়ে তাঁদের বাঙালীত্ব ফিরে পেল—আন্দোলনের বিফলতার মধ্য দিয়েই আত্মা-আবিষ্কারের পথ পেল বাঙালী জাতি হিসেবে—এবার আর মুসলিম হিসেবে নয়—এ যেন একটি নতুন চেতনা। বাংলার মাটি, বাংলার নদী, বাংলার প্রকৃতি বাঙালীকে আকৃষ্ট করল। ভুলে গেল তাঁরা

"পশ্চিমে আজ খুলিয়াছে দ্বার। সেথা হতে সরে আনে উপহার"। এখন থেকে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হলো তা বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী কৃষ্টি। পাকিস্তান ধ্বংসের বীজ দেশের প্রতিটি গ্রামে বপন করা হয়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। খাজা নাজিমুদ্দীন কপালে জয়টীকা নিয়ে করাচী ফিরে গেলেন বাংলায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে—বোঝেননি তখন হনুমানের লেজের আগুন এবার সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে শেষ করবে। নাজিমুদ্দীনের পতনের ঐ প্রথম ধাপের পরে এল দেশে খাদ্যভাব। যুদ্ধ সাময়িকভাবে শেষ হলো, ফলে পাটের দাম পড়ে গেল, তার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে এল।

কমনওয়েলথের প্রধান ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সিংহাসন আরোহণ করলেন।

পাঞ্জাবে কাদিয়ানী ও সুন্নী মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এর পেছনে ছিল পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মোমতাজ দৌলতানার নেতৃত্বের খেলা। স্যার জাফরুল্লাহ্‌কে তিনি কোনকালেই সহ্য করতে পারতেন না। সে নেতৃত্বের কোন্দল এসে দাঁড়াল কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী সুন্নী মুসলমানদের উত্তেজিত করা আবার ঐ পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন জমাতে ইসলামের মাওলানা মওদুদী। ফলে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সেনাবাহিনী পাঠানো হলো জেনারেল আজমের নেতৃত্ব। মাশাল ল' জারী করা হলো লাহোরে। পাকিস্তানের সর্বত্র হতাশা দেখা দিল।

১৯৫২ সনের নভেম্বর মাসে আমার এক বন্ধুর বাড়ি ভাষা আন্দোলন নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছিল। বন্ধুর ধারণা বাংলা ভাষা আন্দোলনে সবাই বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে যোগদান করেনি। তারা এসেছে ঐ সুযোগে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে আবার কেউ এসেছে সমস্ত ভারতকে এক করে ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। প্রথম দলে আছে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয়টিতে আছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। তারা একদিন সোভিয়েট সোসালিস্ট রাষ্ট্রের আদর্শে ভারতীয় উপমহাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করার পক্ষপাতি। আর একদল আছেন যারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়। আমি বললাম আমার কথা হচ্ছে, কে কি উদ্দেশ্যে যোগ দিয়েছেন সেটা বড় কথা নয়—দাবীটা যুক্তিযুক্ত কি না সেটাই হচ্ছে আমাদের বিচার্য বিষয়।

আমরা যখন আলোচনায় ন্যস্ত সে তখন ডাকল "সিন্‌থিয়া ঘরে চা দেবে না"। তার স্ত্রী ট্রের উপর কিছু খাবার ও চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুসলমান মেয়ে নাম 'সিন্‌থিয়া' কেমন করে হলো। আদাব দিয়ে দাঁড়ালাম বললেন, "বসুন"। বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলেন,—"এই আমার Joy for ever". আমি ওকে "জয়" বলেও ডাকি। কেমন যেন একটা গোলমালে পড়ে গেলাম। তাহলে এসব বানানো নাম। আসল নামটা তো জানা হলো না—আর ঠিক ঐ প্রশ্নটা করাও সমীচিন মনে করলাম না। ভদ্র মহিলা আমাকে বললেন,—"আপনি আমাকে 'জয়' বলেই ডাকবেন"। বন্ধু বললেন,—"আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন"। তারপর জয়কে বললেন,—"এবার তোমার লেখা শোনাবার একটা লোক যোগাড় হলো—সপ্তাহে ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ করবে অবশ্যই শনিবার সন্ধ্যায়, নইলে আসতে পারবে না কারণ অন্য সব

সন্ধ্যা মক্কেলের কাছে বাঁধা"। জয় বলল,—"আসবেন কিন্তু আগামী শনিবার সন্ধ্যায়"। বললাম,—"আসব"। জিজ্ঞেস করলাম,—"কি লিখছেন এখন"। বলল,—"হার্ডির টেস্ অব্ দি ডারবার ভাইল্স্"-এর অনুবাদ করছি—আপনাকে শনিবার খানিকটা শোনাব—কেমন হচ্ছে বলতে হবে কিন্তু।" আমি দু'একটা কথা বলে বিদায় হলাম। ১৯৩৫-৩৬ সনের পরে আর সাহিত্য চর্চা করা হয়নি। লেখাপড়া যা করেছিলাম ছাত্র হিসেবে তারপর আর নতুন কোন বই পড়িনি—ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস কোন বিষয় আর পড়া হয়নি। চার-পাঁচ বছর যখন শিক্ষকতা করেছি তখনো নতুন কিছু পড়া হয়নি—যে জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জন করেছিলাম তাই যথেষ্ট ছিল ছাত্রদের জন্যে। তারপর ১৯৪৪ থেকে একটানা ১৯৫৩—খবরের কাগজও সবটা পড়া হয়নি। আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হয় যে, বই পড়ার কথাটা একেবারেই মনে আসে না। রাজনীতির বেশির ভাগ কাজই অনর্থক। কর্মীরা যে কোন সময় আসতে পারে—সে ঘুম থেকে উঠার আগেই হোক আর দুপুর রাতেই হোক। বিশ্রাম নেই, চিন্তা করার অবসর নেই। যেসব সংবাদ কর্মীরা দিয়ে যায় তারই উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে যাই। ফলে মানবতাবোধ ক্রামগতই অন্তর থেকে কমে যেতে থাকে। অন্য রকম ভাবনা—আমাদের সহ্য করার কথা নয়। এ জন্যেই যাঁরা যত বড় রাজনৈতিক নেতা তাঁরা ততই "ইন্‌টেলেকচুয়াল"দের উপর বিরক্ত। ফজলুল হক সাহেব বলতেন "যারা খবরের কাগজ পড়ে তাদের ভোট আমি চাই না—কারণ তারা কোনদিনই আমাকে ভোট দেয়নি।" কি জিন্নাহ্, কি হক সাহেব, কি শহীদ সাহেব কাউকে আমি "ইন্‌টেলেকচুয়াল"দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে দেখিনি। জিন্নাহ্ সাহেব ২৪শে মার্চ ১৯৪৮ সনে যেদিন আমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ দান করেন সেদিন বলেছিলেন,—"I am a man of strong common sense and I believe in common sense alone".

সুতরাং যে চিন্তাধারা একটু "Uncommon" সেটা তাঁর নিকট পরিত্যাজ্য। এর কারণ বোধহয় রাজনীতিবিদরা বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত বর্তমানই তাঁর নিকট বাস্তব—বর্তমান বলতে বড়জোর পরের পাঁচ বছর। "ইন্‌টেলেকচুয়ালরা" ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন—বর্তমান তাদের নিকট "সামরিক" "Temporary Phase". রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে চায় যা বলে তা কার্যকরী করার দায়িত্ব তাদের। অন্যদিকে "ইন্‌টেলেকচুয়াল"রা স্বপ্নবাদী হতে পারেন কারণ তারা ক্ষমতায় যাবে না বলে তাদের সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব তাদের উপর যেহেতু বর্তাবে না সেজন্যে তারা দায়িত্বহীন কথাও বলতে পারেন। রাজনীতিবিদরাও দায়িত্বহীন কথা বলেন—বিশেষ করে নির্বাচনের সময়—সেটা ক্ষমতায় পৌঁছার জন্যে। তবে সেটা মারাত্মক হয় না কারণ সবাই জানে নির্বাচনে যা বলা হয়—তা নিতান্তই বক্তৃতাকে মানুষের মনে দাগ কাটাবার জন্যে—অর্থাৎ জনগণের সমর্থন লাভের জন্যে। জনগণও সেটা জানে—তাই তারাও ঐসব কথা ভুলে যায়—কতকটা ক্ষমার চোখে দেখে। কিন্তু "ইন্‌টেলেকচুয়ালরা" নির্বাচনকালীন "ওয়াদা"কে এত পবিত্র মনে করে যে, তারা রাজনীতিবিদদের কথায় ও কাজের মধ্যে কোন মিল দেখতে পান না—ফলে

"ইন্‌টেলেকচুয়াল"দের কাছে রাজনীতিবিদরা অভিনয় মঞ্চের অভিনেতা—তাদের কথার মূল্য ঐ মঞ্চেই সত্যি হয়ে থাকে।

আমিও ছোটখাট রাজনীতিবিদ, সুতরাং 'জয়ের' সঙ্গে পরিচয়ে আমার ভেতরে কি প্রতিক্রিয়া হবে তা স্থির করতে পারলাম না। সুতরাং যাব কি যাব না কয়েকদিন ভাবলাম—কিন্তু শনিবার দিন সত্যিই তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। জিজ্ঞেস করলেন আমি "টেস্" পড়েছি কি না—উত্তরে বললাম,—"না, একমাত্র হার্ডীর "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড" ছাড়া আর কোন লেখা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি।" সে তো শুনে খুব খুশী, বললে,—"ভালই হলো—অনুবাদ পড়ার পূর্বে বইটাই পড়া যাক।" পাশেই একটা চেয়ার টেনে পড়তে বসলেন। চাকর এসে চা দিয়ে গেল—আমি চা খেলাম, কিন্তু তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি সাহিত্যিক নই কিছুক্ষণ শোনার পরে আমার অস্বোয়াস্তি লাগছিল। ধরে ফেল্‌ল মনের অবস্থা। হঠাৎ কবিতার বই খুলে পড়তে লাগল কীট্‌সের "এন্ডিসিয়ন"। ছন্দটা শুনলাম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা মনে আসতে লাগল। সে কি জীবন ছিল—আর আজ কি জীবন। খুব যে ভাল লাগছিল তা নয়। তবু উঠার সময় বললাম,—"I enjoyed the evening so much." বললো,—"শনিবার আবার আসবেন কিন্তু"। বললাম,—"আপনার হাতের পাক এত ভাল যে—না এসে কি পারব ?" সে খুব খুশী হলো না। বলল,—"আমি আপনার মুখের স্বাদ নিয়ে ব্যস্ত নই আমি চাই আপনার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ করতে যাতে কানের ভেতর আমার পড়া আপনার অন্তরে গিয়ে পৌঁছে।" বাইরে এসে ভাবলাম কথাটা আমার ঠিক হয়নি। মেয়েরা পাকের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে তাই জানা ছিল এতদিন—এখন দেখলাম সেটা সব মেয়ের জন্যে সত্য নয়। পরের সপ্তাহে "বনলতা সেন" কবিতাটা পড়ছিল। সত্যি বলতে ছন্দ যেন আমার ভাল লাগল না। আমার মুখের দিকে চেয়ে বুঝল সে আবার পড়ল—এবার যেন ভাল লাগল—তৃতীয়বারে কবিতাটা আমার মনে একটা অপূর্ব ছবির সৃষ্টি করল। বুঝলাম কবিতা বোঝার জন্যে কানের "ট্রেনিং"-এর প্রয়োজন আছে। নভেম্বর থেকে ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় সেখানে গেছি অনেক সময়—অনেক কাজ ফেলেও। রাজনৈতিক জীবন যেন বৃথা সময়ের অপচয় বলে মনে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে "জয়" বা "সিন্‌থিয়া" বিদেশে চলে যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই জয় "ইন্‌টেলেকচুয়াল কম্পেনী" হিসেবে আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি—কিন্তু প্রায় দশ বছর প্রতি সপ্তাহে চিঠিপত্র লেখা চলেছিল। ধীরে ধীরে কমে গেছে—পরে থেকে গেছে।

তার যাবার দু'সপ্তাহ পূর্বে আমাকে করাচী যেতে হয়েছিল ত্রিদলীয় শ্রমিক সম্মেলনে যোগদানের জন্যে। সেখানে গিয়ে জানলাম আমাকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কিউবার রাজধানী "হাভানায়" যেতে হবে "আই.এল.ও.'-র প্লানটেশন কমিটির" সভায় চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা আলোচনা করতে।

১৯৫৩ সনের ১০ই মার্চ হাভানা রওনা হলাম। তখনকার দিনে বোয়িং বিমান হয়নি। সুতরাং আমাদের থামতে হয়েছে বিস্তর দেশের রাজধানী শহরে। করাচী পর্যন্ত

গেলাম "অরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজে" বিমান থামল কলকাতা ঘণ্টাকয়েকের জন্যে, আবার থামল দিল্লী, শেষ পর্যন্ত করাচী। যেদিন গেলাম সেদিনই ক্ষতিব সাহেব এসে বললেন,—"ভাল হয়েছে আপনি এসে গেছেন—আজ রাতেই ওয়েস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব্ লেবার আনুরিন বিভানকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করছে। বিচ লাকসারী হোটেলে' সন্ধ্যায় গাড়ি এসে আমাকে হোটেল 'মেট্রোপোল' নিয়ে গেল।" ইস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি বলে আমাকে বিভানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনেক আলোচনার পরে আমাকে বিভান বললেন, ফেরার পথে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করি—বাড়ির ঠিকানা দিলেন—টেলিফোন নম্বরও।

ঢাকা ছাড়ার আগের দিন বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। পাসপোর্ট চাই—বিদেশে যাবে চিকিৎসার জন্যে। আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি। পাসপোর্ট অফিসারকে বলেছিলাম কিন্তু এটা জানতাম না যে, সেটাই বুলবুলের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। মুসলমান সমাজে মেয়েদের গজল ছেড়ে গানের আসরে স্থান হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে, কিন্তু নৃত্যশিল্পে মুসলমান সমাজ বহুকাল পেছনে পড়েছিল। বুলবুল চৌধুরী প্রথম নৃত্যকলায় যে মুসলমান সমাজ পারদর্শিতা দেখাতে পারে তাই প্রমাণ করেছিল। আমাদের দেশের একজন চিন্তাবিদের মতে, "আমাদের সাহিত্যে যা ছিলেন নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতে যা ছিলেন আব্বাসউদ্দীন, চিত্রশিল্পে জয়নুল আবেদীন, নৃত্যশিল্পে বুলবুল চৌধুরী ছিলেন ঠিক তাই।"

১৪ই মার্চ করাচী থেকে হাভানা রওনা হলাম 'প্যান আমেরিকান' বিমানে। সঙ্গে আবদুল মান্নান চৌধুরী। তাঁর বাড়ি সিলেট। আমার পরামর্শদাতা হিসেবে চললেন। তিনি চা-বাগানের খবর আমার চেয়ে বেশি জানতেন তাই ঐ ব্যবস্থা।

অধিবেশন আরম্ভ হবে ১৬ই মার্চ, ১৯৫৩ সনে। সুতরাং যাবার পথে যদিও বৈরুত, রোম, ফ্রাঙ্কফোর্ট ও লণ্ডনে প্লেন থেমেছে, কিন্তু বিমানবন্দরের বাইরে যাবার কোন প্রশ্ন উঠেনি। নিউইয়র্কে ও "আইডল্ ওয়াইল্ড" বিমানবন্দরের বাইরে যাইনি যদিও কয়েক ঘন্টা থাকতে হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাও ছিল। আইডল্ ওয়াইল্ড থেকে আমেরিকার একটা 'ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ'-এ কিউবা রওনা হয়ে গেলাম। হাভানা বিমানবন্দর হাভানা শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে। হাভানা এসেই দু'টো বিপদের সম্মুখীন হলাম—প্রথম আমাদের মালপত্র (লাগেজ) ঐ বিমানে আসেনি। আমাদের লাগেজ টিকিটগুলো নিয়ে অনেক খোঁজাখুজি করেও মালপত্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়, প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত একজন ইংরেজী জানা লোক পাওয়া গেল না। আমরা যখন বিমানবন্দরে পৌঁছেছি রাত তখন দু'টা বাজে। সুতরাং ইন্টারপ্রেটারের জন্যে টেলিফোন করেও কাউকে তখন পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত একজন ট্যাক্সী ড্রাইভার ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল। কোথায় যাব আমরা। বললাম,—"হোটেলে।" আমরা ট্যাক্সীতে উঠে বসলাম। প্রায় রাত তিনটের দিকে 'হোটেল বিল্টমোরে' নামিয়ে দিল। আমাদের নিকট কোন হাভানার মুদ্রা ছিল না সেকথা হোটেলের "রিসেপশনিস্ট"কে বললাম—তিনি আমাদের "ট্রাভেলারস্ চেক" দেখে হোটেল থেকেই ট্যাক্সী ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। আমাদের দু'টো রুম ঠিক করে চাবী দিয়ে দিলেন প্রশ্ন

করলেন যে, আমাদের "লাগেজ" কোথায় ? বললাম আসেনি। হোটেল ম্যানেজার এয়ারপোর্টে টেলিফোন করলেন বোধহয় আমাদের কথা সত্যি কি না তাই পরীক্ষা করতে। টেলিফোনে কথা হলো স্প্যানিশে সুতরাং আমাদের বোঝার উপায় ছিল না। আমাদের যার যার রুমে যেতে বলে বললেন যে, আমাদের মালপত্র আগামীকাল এসে পৌঁছবে। পরদিন সকালে অধিবেশনের স্থান খুঁজতে বেরুলাম। অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে হতাশ হলাম। শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হলো এবং আমরা হাভানার কনফারেন্স হলে পৌঁছে গেলাম সময়মতই। সেখানে গিয়ে আফতাব আলী সাহেব ও তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো—তাঁরা সব শুনে আমাদের যে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে আমাদের মালপত্র আসার সংবাদ পেয়ে আই.এল.ও. থেকেই মালপত্র আনার ও হোটেল বিল্টমুরের দেনা-পাওনা মেটাবার ব্যবস্থা করা হলো। হোটেল ইংলেতেরিয়ায় আমাদের যার যার রুমে কাপড় ছেড়ে কনফারেন্স-এ যোগদান করি। হাভানা যেহেতু স্প্যানিশ শহর সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সকলেই আনন্দমুখর। দেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল বাতিস্তা। সি.আই.এ.'-র সাহায্যে কার্নেল থাকাকালীন ক্যু-য়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল। স্বৈরাচারী সরকার—কোনপ্রকার আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না জেনারেল বাস্তিতা। মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মচারীদের স্ফূর্তি করার জন্যে সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা করেছে। অনেক "নাটই ক্লাব" আমাদের জন্যে ব্যবস্থা হলো "Open Air night club.—TROPCIANA". প্রথম নাচ দক্ষিণ ইটালীর গ্রামের কৃষকদের জীবন, যারা ভূতে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়টি প্রায় একই চেহারার মেয়েদের বিভিন্ন দেশ থেকে খুঁজে বার করে বিভিন্ন ধরনের নাচ। তারপরে এল এক মেয়ে—যে বিবস্ত্র হবার অভিনয় দেখাল। তারপরে পূর্ব ইউরোপের একটি বেলে নাচ। কিউবার আবহাওয়া আমাদের পূর্ব বাংলার মতই অনেকটা। তাই স্যুট পরার চেয়ে হাউই শার্টের ব্যবহার বেশি। "সুগার-কেন প্লান্টেশন" দেখতে গেলাম একদিন—অত আখ যে একটা স্থানে হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আখগুলোর জাত ভাল—বেশ মোটা ও খুব মিষ্টি স্বাদ। পিকনিক করতে গিয়ে সবাই খাবার রেখে আখ চিবাতে লেগে গেল—মেয়ে-পুরুষ সবারই কি আনন্দ। আর একদিন বাসে করে সমস্ত দেশটাই প্রায় ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা হলো। অপরূপ সুন্দর দেশটা কালো পাথরের পাহাড়-পর্বতের মধ্যদিয়ে আঁকাবাঁকা পীচের রাস্তা। দেশের চারধারেই সাগরের ঢেউ এসে লাগছে এমনকি "ড্রাইভওয়ে" দিয়ে যাবার সময় উত্তাল তরঙ্গ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে আমাদের গাড়ির উপর।

হোটেলের বড় অসুবিধা হলো কেউ কথা বোঝে না। তাই ডিকশনারী হাতে করে রুটি, কফি, চিনি, দুধ প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের যে স্প্যানিশ দেয়া আছে তাতেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দি। সপ্তাহখানেক পরে অবশ্যই অনেকগুলো শব্দ মোটামুটি শিখে ফেললাম। জেনারেল বাতিস্তা একদিন সন্ধ্যায় "ড্রিংক্স'-এর নিমন্ত্রণ করলেন। যাকে বলে রিসেপশন। তৃতীয় সপ্তাহে আমরা প্রথম জানলাম যে, দূরে পাহাড় অঞ্চলে দুষ্কৃতিকারীরা লুকিয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে এক একটা শহর আক্রমণ করে আবার

হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আমরা থাকতেই একদিন হাভানায় বোমা ফাটল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তখন আমরা শুনেছিলাম ক্যাস্ট্রোর নাম—ছাত্রদের মুখে।

অধিবেশনে সবচেয়ে ভাল লাগল ড. কিনিম্যানের বক্তৃতা। শ্রীলঙ্কার সবাই ভাল ইংরেজী বক্তৃতা করে। ড. কিনিম্যান কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা। তাঁর পিতা ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জাস্টিস্। স্ত্রী ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হ্যারী পলেটের কন্যা। তিন সপ্তাহ কনফারেন্স চলার পর অধিবেশন শেষ হলো। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—তারা সবাই নিমন্ত্রণ করলে আমাদের। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করছিলেন ত্রিপতি। কংগ্রেসী পোশাক পরিধান করতেন এমনকি খদ্দরের টুপীটি পর্যন্ত।

আমরা প্রথম এলাম নিউইয়র্কে। সঙ্গে ছিল আই.এল.ও.'-র লিয়েজোঁ অফিসার মিস্টার ঘটক। অদ্ভুত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)-কে টেলিফোনে জানালাম যে, একদিনের জন্যে ওয়াশিংটনে বেড়াতে আসতে পারি যদি সময় হয়। তিনি বললেন, গাড়ি পাঠিয়ে দিবেন আমার জন্যে। খুব ভাল লাগল। মনে হলো দেশের কথা এখনো ভোলেননি।

আমেরিকায় নতুন এসেছি আর যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে এটা সত্যিই নতুন দেশ। যুবক-বৃদ্ধ কারো পোশাকেরই কোন তফাৎ নেই। শার্টের কাপড়টা হয়ত কড়া লাল তার মধ্যে বড় বড় কালো চেক অথবা বিচিত্র রং-এর উপর হাল্কা বড় বড় প্রজাপতির ছাপ, অথবা গাঢ় নীল রং-এর সার্টের উপর বাদামী রংগের বড় মাছের ছাপ। আর গলাই টাই—যেমন চওড়া তেমনি রং তার মধ্যে আবার উলঙ্গ মেয়ের ছবি বা কাউবয়ের ছবি বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছবি। গরমের সময় শার্টের হাতা গুটিয়ে রাখে সবাই কনুইর উপর পর্যন্ত।

মনে হলো আমেরিকানরা ছোট জিনিস ভাবতে পারে না। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং একশত তলারও বেশি। তাছাড়া অন্য অট্টালিকাগুলোও কম যায় না। রেস্তোরাঁয় বসলে তো অবাক হয়ে যেতে হয়। একটি চিনি রাখার পট এত বড় এবং ভারী যে, সেটা তুলে চায়ে চিনি দিতেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। একটা ম্যাচ এগিয়ে দিল তো সেটা ছোটদের খেলনার মোটরকার। খাবার চাইলে স্যালাড্ অর্থে একটা গরুর খাবার। মুরগীর ফ্রাই চাইলে মনে হয় আস্ত একটা টার্কী সম্মুখে এসে গেছে। নিউইয়র্ক 'টাইমস্' পত্রিকা কিনলে মনে হয় এক ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকা নিয়ে এলাম। কারণ পরে বুঝলাম। আমেরিকানদের খবরের কাগজ পড়ার রীতি আলাদা ধরনের। বহুলোক আছে কেবল স্পোর্টস কলামস্ পড়বে আর কিছু নয়। অনেকে কেবল স্টক এক্সচেঞ্জের খবর পড়বে, অনেকে কেবল কমিক পড়বে, এমনি করে বিভিন্ন রকমের পাঠক। রাজনীতির যে খবর তাতে সেই স্টেটের রাজনীতিই থাকে। অবশ্যই বিশ্বের খবরও পাওয়া যায় কিছু কিছু কেবল পাওয়া যায় না আমেরিকায় অন্যান্য স্থানে কি হচ্ছে। শুনলাম—পলিটিক্যাল অংশ ছাপা হয় কেবল বিদেশীদের জন্যে। বেশি লোকে পড়ে "ডাইজেস্ট" আবার সময় যার আরো কম সে পড়ে "ডাইজেস্ট অব্ ডাইজেস্টস্" যত ডাইজেস্ট আছে

তার মধ্যে "রিডারস্ ডাইজেস্ট" সবচেয়ে জনপ্রিয়।

"কিচেনে" ঢুকলে বোঝা যায় যে, জাতটা টেক্‌নোলোজিতে কত এগিয়ে গেছে। কত রকম গ্যাজেট যে তৈরি হয়েছে কাজের সুবিধার জন্যে এবং অল্প সময়ে কাজ সমাধা করার জন্যে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। গ্যাজেটগুলো সবই বিদ্যুৎশক্তিতে চলে—বার্ণার বা চুলা জ্বালাতে ম্যাচবাতির প্রয়োজন হয় না। নবটা ঘুরালেই জ্বলে উঠে। বার্ণারের পাশেই হয়তো রয়েছে আর একটা ছোট বৈদ্যুতিক গ্যাজেট। কমলা, টমেটো প্রভৃতি রস করার জন্যে।

আমেরিকানরা কথা বলতে ভালবাসে—অল্প পরিচয়েই জানতে চাইবে—কি করা হয়, কত বেতন—ব্যবসা হলে কত আয়, আয়কর ফাঁকি দেয়া যায় কি না ইত্যাদি। রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না—ইংরেজ যেমন ভূমিকা করে কথা আরম্ভ করে,—"I believe, may be I am wrong," or "I am afraid, you sound a bit unorthodox, and other People have other opinions in this subject". আমেরিকানদের সে বালাই নেই। ঝর ঝর করে বলে যায় যা খাঁটি—তাই। আমেরিকায় এত গ্যাজেট বেরুবার ফলে মেয়েদের বিস্তর সময় হাতে থেকে যায়—তাই চিঠি লেখার ব্যাপারে আমেরিকান মেয়েদের জুড়ি নেই। টাইপ-রাইটারে বড় চিঠি লিখতে সময় বেশি লাগে তাই বৈদ্যুতিক টাইপ-রাইটার ব্যবহার করবে—নানা ঢং-এ রঙিন ছবি তুলে প্রতি সপ্তাহেই পাঠাবে তার উপর ফাদারস্ ডে, মাদারস্ ডে থেকে আরম্ভ করে নিউইয়ার্স ডে পর্যন্ত হাজারো কার্ড—যার মধ্যে ছাপানো কবিতা রয়েছে তা পাঠাবে।

আমার প্রথমে মনে হয়েছিল ম্যানহাটন ও নিউইয়র্ক একই কথা—ম্যানহাটন দ্বীপটার নাম আর তার উপর শহরটাই নিউইয়র্ক। বেশ কিছুদিন পরে বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। ম্যানহাটন তেরো মাইল লম্বা দু'মাইল পাশে হাডসন নদীর মুখে একটি দ্বীপ। এর পূর্বে ইস্ট রিভার আর ঐ ইস্ট রিভারের অপর পাড়ে লং আইলেণ্ড। একদিন ব্রোঞ্জ চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে শুনলাম ওটাও নিউইয়র্ক। সুতরাং একদিন ব্রুকলিন পুল পার হয়ে ব্রুকলিনটা দেখলাম। রিশমণ্ডে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। নিউইয়র্ক অর্থে বোঝা যায় বহুতলা বিশিষ্ট অট্টালিকাসমূহ—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, রকফেলার সেন্টার, টাইমস্ স্কোয়ের আর হারলেম। আর ঐগুলো সবটাই ম্যানহাটনে তাই আমাদের মত বিদেশীর পক্ষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। টুরিস্টদের লক্ষে করে নিউইয়র্কের চারদিকে ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। স্ট্যাচুটিউ অব্ লিবার্টি পেরিয়ে গেলে বায়ে একটা অট্টালিকা কয়েক তলা তার প্রবেশপথ ছাদের উপর দিয়ে। লিফ্‌টে উঠে যায় ছাদে সেখান থেকে তর্ তর্ করে যার যার এপার্টমেন্টে চলে যায়। যে লোকটা মাইক ধরে সব চিনিয়ে দিচ্ছিল—সে বললো আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের কোথাও এমন বৈজ্ঞানিক থাকার ব্যবস্থা নেই। ম্যানহাটনের রাস্তাগুলো অদ্ভুত উত্তর-দক্ষিণের রাস্তাগুলো সব এভেনিউ আর পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তাগুলো সব স্ট্রীট—নাম নেই সবই কেবল নম্বর।

ড্রাগ স্টোরস্-এ ড্রাগ ছাড়া আর সবই পাওয়া যায়। স্টেশনারী, চকলেট, চিউইংগাম, বাচ্চাদের খেলনা, ঝর্ণা কলম ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস। তার সঙ্গে

পরিশ্রান্ত ক্রেতাদের জন্যে খাবার ব্যবস্থাও আছে। ফলের রস, চা, কফি, আইসক্রীম, স্যান্ডউইচ, অমলেট, মাললেট, স্ক্রেম্বলড্ আণ্ডা, মাখনে পেচড্ ডিম (Sunny side up) এমনি সব খাবার। আমেরিকায় ছোট গাড়ি নেই—মস্ত বড় বড় গাড়ি চাই। শো-রুমে লণ্ডন থেকে বা জারমেনী থেকে ছোট গাড়ি দেখার জন্যে আমেরিকান ছেলে-মেয়ে, বুড়ুদের ভীড় হয়। তাদের গাড়িতে থাকতে হবে রেডিও, সিগারেট লাইটার, ইলেকট্রিক হিটার, এয়ারকণ্ডিশনার এমনি সব জিনিস।

বড় রাস্তায় ক্রসিং থাকে না—ক্রসিং হয় মাথার উপর দিয়ে, নয় মাটির নীচ দিয়ে। নদীর নীচে দিয়ে টানেলে গাড়ি চলছে, ঠিক তখনই টানেলের উপর জাহাজ চলছে। অসুবিধা একমাত্র দেখলাম গাড়ি পার্ক করা। কয়েক ব্লক দূরে রাস্তার পাড়ে হয়ত গাড়ি রাখতে হয়। নানা পরিকল্পনার কথা অবশ্যই শুনলাম।

আমেরিকানদের বিশ্বের সংখ্যালঘুদের প্রতি খুব দরদ। ভারতের হিন্দু, পাকিস্তানের মুসলমান, ফিলিপাইনসে মুসলমান, বার্মায় মুসলমান, সিংকিয়াঙ্গে মুসলমান, রাশিয়ার ইহুদী, জাপানের কোরিয়ান, যুগোশ্লাভিয়ার ইটালিয়ান, চেকোশ্লেভেকিয়ার হাঙ্গারিয়ান এমনি সব সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্বন্ধে তারা খুব ভাবেন, কিন্তু তার নিজের দেশের সংখ্যালঘু নিগ্রোদের জন্যে কোন ভাবনা নেই। শ্বেতাঙ্গদের স্বাধীনতায় অনন্ত বিশ্বাস—তাদের স্বাধীনতা যে কতখানি তা বুঝতে কষ্ট হয় না—শ্বেতাঙ্গদের জন্যে পার্ক, চলাচলের রাস্তা, স্কুল, বাড়ির স্থান নির্বাচন, বেঞ্চ এমনকি নিগ্রোদের স্বাধীনভাবে মারধোর করার অধিকার সব রকম স্বাধীনতা আছে। দেশটা যেহেতু নিগ্রোদের নয়—তারা বহিরাগত সুতরাং আমেরিকানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে নিগ্রোদের স্বাধীনতা বোঝায় না।

কোন স্টেটের আইনের সঙ্গে অন্য স্টেটের সম্পূর্ণ মিল হতে পারে না। সেখানেও প্রত্যেক স্টেটের স্বাধীনতা রয়েছে নিজেদের ইচ্ছামত আইন করা ও প্রয়োগ করায়। তাদের দেশে সবচেয়ে সম্মানিত লোক মন্ত্রী। তার আদর্শ কি, সে মিথ্যে বাদী কি না, আয়কর ফাঁকি দেয় কি না—মাতাল কি না, এমনকি নিষিদ্ধ এলাকায় বা নাইট ক্লাবে যায় কি না—সে তাদের দেখার প্রয়োজন নেই যদি না কেলেঙ্কারী ধরা পড়ে। সে মন্ত্রী তাই বড় হবার জন্যে যথেষ্ট—আবার মন্ত্রিত্ব চলে গেলেই সে ছোট হয়ে গেল। নির্বাচনের সময় সেসব প্রার্থীরাই সাফল্য লাভ করে যারা মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় এবং ছোট শিশুদের বিনা দ্বিধায় চুমো খেয়ে যেতে পারে।

আমেরিকানদের ধারণা যে, জগতটা তাদের অধীনে। কথাটা অনেকটা ঠিক। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম—কাকে কাকে খেলায় নেয়া—কে কোথায় দাঁড়াবে—তার জন্যে বাছাই হয়, কিন্তু বল যার তার সম্বন্ধে বাছাইরও প্রশ্ন উঠে না—আর মাঠে তার স্থান সে নিজেই ঠিক করে নেয়—কারণ বলের মালিক সে। আমেরিকার ডলার আছে, ঐশ্বর্য আছে—সবাই তার মুখাপেক্ষী তাই তার মনে অমনি চিন্তা আসা স্বাভাবিক।

আমেরিকানদের দেশটাই নতুন নয়, তারা জাতি হিসেবেই নতুন নয়—তারা এখনো চরিত্রে ও স্বভাবে কৈশোরের অভ্যাস কাটাতে পারেনি—ছোট শিশু যেমন

মায়ের স্তনের প্রতি নিরবধি দৃষ্টি—আমেরিকানদেরও তাই—"বাস্ট" পাগল তারা। "চিউইংগামের" ভেতরে যেন স্তনের মাধুর্য লেগেই আছে—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে সবার মুখেই চিউইংগাম। খাবার সময় ছোট ছেলে-মেয়েদের মাংস কেটে হাতে কাটা দিয়ে দেয় তুলে খাবার জন্যে—তেমনি আমেরিকানরাও আগে দু'হাত ব্যবহার করে মাংস কেটে নেয়—তারপর ছুরি রেখে দিয়ে ডান হাতে কাটা নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করে। বিলেতে যে কাটা চামচ, ছুরি সবই ব্যবহার করে আর কাটা বা'হাতে ধরে উপর করে তার উপর ছুরি দিয়ে খাবার তুলে খাওয়াটাও আমার কাছে মনে হয় রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগকে লম্বা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমার কাছে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান লোককে অনেক বেশি ভাল লাগে ঐ ধরনের "ম্যানারস কন্সাস" লোকের চেয়ে। আমেরিকান মেয়েরা কিন্তু গলার স্বর সম্বন্ধে খুব সজাগ। বিরাট বপুর মেয়েরাও কিশোরীদের স্বরে কথা বলার চেষ্টা করে। মেয়েদের স্বাভাবিক চেহারা আমার ভাল লাগে—"মেকআপ" করা মেয়েদের দেখলে আমার মনে হয় যে, অসুন্দরকে ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। মেয়েদের চেহারা যত ভাল হবে তার "মেকআপ"-এর প্রয়োজন তত কম। তাই সদ্য ঘুম থেকে উঠা আমেরিকান মেয়েদের দেখলে তাদের বীভৎসতা ধরা পড়ে। তাই তাদের দেশে স্বামীরা স্ত্রীর নিকট থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আমেরিকান মেয়েরা অন্য মেয়েকে যত প্রশংসা করতে পারে—তা আর কোন দেশে পারে কি না সন্দেহ, সে বলবে, "She is such a dear, she is the sweetest woman I have ever met. She is so cute I would love to have you meet her."

আমেরিকার মেয়েদের ধারণা যে, ছুটিতে বেড়াতে গেলে স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাওয়া উচিত, তাতে স্বামীর প্রতিদিন একই মুখ বিছানায়, খাবার টেবিলে, বেখেয়াল কাপড়-জামায় দেখা থেকে মুক্তি পায় কিছুদিনের জন্যে। তাতে পরে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়—একই জায়গায় বেড়াতে গেলে সে নতুনত্ব পাওয়া যায় না। কূটনৈতিক চাকুরেদের মধ্যে একটা কথা আছে—সিগারেট কেসের শেষ সিগারেট খেতে নেই, একাধিক গ্লাস পানীয় পান করা উচিত নয়—মেয়েরা যখন প্রশংসা পাবার জন্যে অস্থিরচিত্তে তোমার চারপাশে ঘোরে তখন তাকে প্রশংসা করতে নেই। সবাইর প্রশংসা কুড়াবার পরে যখন সবাই তাকে ফেলে যায় তখন প্রশংসা করা উচিত। আমেরিকায় ওটা খাটে না—সিগারেট সবটা খেয়ে চেয়ে খাও, মাতাল না হওয়া পর্যন্ত মদ গেল, আর মেয়েদের দেখলে অসীম প্রশংসা চালিয়ে যাও।

সুরাপান ব্যাপারে আমার ধারণা লাজুক মানুষ, কম সাহসী লোক এদের পক্ষে একটু-আধটু সুরাপান জায়েজ করে দেয়া উচিত—কিন্তু যাদের বুদ্ধি খাটিয়ে, শান্ত ও স্থিরচিত্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তাদের পক্ষে সুরাপান একেবারেই নিষিদ্ধ করা উচিত। আমেরিকানরা এসব মতামতের ধার ধারে না। যা ভাল লাগবে তাই কর। ছুটির দিনে যত দ্রুত মন চায় গাড়ি চালাও—সামনের গাড়িটাকে ভাংতে হবে সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মর। শুক্রবার বিকেলে গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় আর সোমবার অফিসে যাওয়া হয় না—সোমবার কেন জীবনেও আর অফিস করা হয় না—কিন্তু এরই মধ্যে তার আনন্দ—ছুটি অর্থে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করা। তাই ক্রীসমাসের ছুটিতে কোন্ শহরে কত লোক রাস্তায়

'এক্সিডেন্ট' করে মরবে তার একটা মোটামুটি হিসাব আগে থেকেই কাগজে বেরিয়ে যায়।

একদিন হোটেলের রিসেপশনিস্ট খবর দিল যে, ওয়াশিংটন থেকে আপনার গাড়ি এসেছে। কাপড়-জামা পরে প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে এলাম। তারপর আড়াইশ' মাইল ড্রাইভ করে ওয়াশিংটন। এখানে আবার রাস্তাগুলো অন্য রকম এভেনিউ ও স্ট্রীটের ক্রসিং নয়, এবার ইংরেজী অক্ষরের সঙ্গে ইংরেজী সংখ্যার ক্রসিং। স্কাইস্ক্রেপার নেই—সুন্দর লে-আউট শহরের, শুনলাম—লে-আউট প্যারিস মডেলে তৈরি।

মোহাম্মদ আলী আমাকে দেখে খুব খুশী হলো। যেন বহুদিন পরে দেশের গন্ধ পেলেন। বললেন,—"দেশে যেতে খুব ইচ্ছে করে—কতকাল বিদেশে পড়ে আছি। মাঝে মাঝে ভাবি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আবার দেশে গিয়ে রাজনীতি করব। আমার মত জানতে চাইলে—আমি তাঁকে বললাম, গতবছর ভাষা আন্দোলনের পর দেশে রাজনীতির গতিধারার এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ঐ রাজনীতির পরিবেশে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে খুবই অসুবিধা হবে। একটি ঘটনার কথা মনে এল তখন। ফেব্রুয়ারি মাসের ত্রিদলীয় শ্রমিক অধিবেশনের পর ডাক্তার মালিকের বাড়ি ছিল মালিক এবং শ্রমিক নেতাদের নৈশভোজ। সেই ভোজের পর সৈয়দ ওয়াজিদ আলী শাহ্ আমাকে পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—নাজিমুদ্দীন সাহেবের পর বাংলা থেকে কে প্রধানমন্ত্রী হতে পরে বলে আমার ধারণা। আমি বলেছিলাম—কেন সে প্রশ্ন ? খাজা সাহেব বহাল তবিয়তে আছেন—আর তিনি ছুটি নিলে তাঁর গদিতে খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবকে বসিয়ে যাবেন। সেটাই খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিগত জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সে ঘটনাটা মোহাম্মদ আলীকে বললাম। এমনি করে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হলো। পরের দিন আবার নিউইয়র্ক। তারপর লণ্ডনের পথে। লণ্ডন থেকে আসার দিন আইসল্যাণ্ডের কেফ্লাভিকে যে "বাইটিং ফ্রস্ট" কাকে বলে তা বুঝেছিলাম—তেমনি ফেরার দিন কানাডার নিউগ্যাণ্ডারে শীত কাকে বলে বুঝেছিলাম।

এপ্রিল মাসে আমি যেদিন লণ্ডনে এসে পৌঁছলাম সেদিন সূর্যের আলো সে বছর প্রথম দেখা গেলো। হোটেলের রিসেপশনিস্ট বললো,—"You are so welcome you have brought with you sunshine of the Spring".

কেনসিংটন প্যালেস হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। সে হোটেলেই আবদুল মোন্তাকিম চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর এলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী—দু'জনেই আবদুল মন্নান চৌধুরী সাহেবের আত্মীয় এবং তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন—আমার সঙ্গে তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পরের দিন তাসাদ্দুক আহমদ এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আলী এলেন—দু'জনেই খবরের কাগজে চাকুরী করার জন্যে চেষ্টা করছেন। খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান তখন সি.এস.পি. ট্রেনিং-এ আছেন। তাঁকে বললাম যে, আমার সঙ্গে বৃটিশ মিউজিয়মে যেতে হবে। শামসুর রহমান তখন ওয়ার্কিং এনসাইক্লোপেডিয়া বলে পরিচিত। সত্যিই ওর সঙ্গে দু'দিন বৃটিশ মিউজিয়মে যে আনন্দ পেয়েছি—তা আর কোন লোকের সঙ্গে পেতাম কি না সন্দেহ।

এর পর আনুরিন বিভানের সেক্রেটারী আমাকে টেলিফোন করল—সময়ও নির্দিষ্ট করে দিল। বিভান তখন শেডো ক্যাবিনেটের মন্ত্রী আর শ্রমিক দলের কোষাধ্যক্ষ। তাঁর বাড়ি গেলাম বেলা এগারোটায়। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট, শ্রমিক দলের কর্মসূচী পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের ধারা এসব বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর লাইব্রেরী ঘরে। ঢুকেই দেয়ালে চোখ পড়ল বিশ্বের বিরাট মানচিত্র। লাইব্রেরীতে বইগুলো সাজান হয়েছে মানচিত্র দেখে। ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রন্থ সব এক জায়গায়, তেমনি পশ্চিম ইয়ুরোপ, সোভিয়েট রাশা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য—দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা আছে গ্রন্থরাজী। আমার ধারণা ছিল বিভান কয়লা খনির শ্রমিক—লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি জীবনে—তাই সোস্যালিজমের নামে আন্দোলনের রাজনীতিই করেন। লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ থেকে আমার সে ভুল ভাংল। বিভান অনুন্নত দেশের রাজনীতিবিদ নন। তাঁর সদ্য লেখা একখানা বই "In Place of Fear" আমকে উহার দিলেন।

তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর কিভাবে বেরিয়া নিজে উপস্থিত থেকে পূর্ব জার্মানীর শ্রমিকদের উপর গুলী চালিয়েছে। তারপর বললেন, ডাক্তারদের মুক্তি পাবার কথা—চেকোশ্লোভাকিয়ার সেক্রেটারীর কথা এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি "রেজিমেন্টেড সোসাইটি" সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মনে হলো অনেক কিছু শিখলাম সেদিন।

লণ্ডন থাকতেই খবর এল যে, গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করেছেন। গোলাম মোহাম্মদ তাঁর প্রক্লামেশনে বলেছেন—"I have been driven to the conclusion that the Cabinet of Khaja Nazim-uddin has proved entirely inadequate to grapple with the difficulties facing the country. In the emergency which has arisen I have felt incumbent upon my asking the Cabinet to relinquish office so that a new Cabinet, better fitted to discharge its obligation towards Pakistan, may be formed.

ওয়াশিংটন থেকে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলীকে করাচী ডেকে পাঠানো হলো এবং তাঁকেই সরকার গঠনের ভার দেয়া হলো। হামিদা মোহাম্মদ আলী ঢাকার জামদানী শাড়ী কিনে পাঠাবার জন্যে আমাকে যে ডলারগুলো দিয়েছিলেন—তা তাঁকে এখন টাকায় দিলেই চলবে—কারণ শাড়ী কেনার আর প্রয়োজন হবে না।

নাজিমুদ্দীনের পতনের সংবাদে আমি খুশীই হয়েছিলাম—যদিও গোলাম মোহাম্মদের কাজটা একেবারেই অগণতান্ত্রিক ছিল। আমি অবশ্য ছোট পরিধি থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর পতনটা দেখেছিলাম তখন। তার সঙ্গে সঙ্গে আহ্সান মঞ্জিলের কবর তৈরি হলো। দেশ যেন রাজনৈতিক মুক্তি পেল। মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের পথ খুলে গেল।

এর পরে থাকল যে দু'জন অভিজাত নেতা তাঁরা হলেন এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ও শহীদ সাহেব। একজন বৈবাহিকসূত্রে আভিজাত্যের দাবীদার—অন্যজন

পরিবার, শিক্ষা, কৃষ্টি এবং বংশ মর্যাদায় আভিজাত্যের দাবীদার—কিন্তু কেউ বড় জমিদারও নয় শিল্পপতিও নয়। আর দু'জনার কেউ বৃটিশের খেতাবপ্রাপ্ত নেতাও নন। আর তাঁরা কেউ মধ্যবিত্তের সাহায্য ছাড়া রাজনীতির আসর গরম করতে পারবেন না। মোটামুটিভাবে উচ্চ মধ্যবিত্তেরা যেমন ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী, রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, আশ্রাফউদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি ফজলুল হক সাহেবের দলে ভিড়ে গেলেন। শহীদ সাহেব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ও মানিক মিঞা সাহেবের উপর। শেখ সাহেব রাজনীতি বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেশ কিছু "কণ্ট্রাক্ট" যোগাড় করে বিস্তর টাকা করে ফেলেন। সেসময় তাঁর নিজের লোক যেমন চিটাগাং-এর আজিজ, জহুর আহমদ এমনি অন্যান্য জেলার অনেক যুবকর্মী ও ছাত্র যারা কলকাতায় পড়াশুনা করছিল তারা শেখ সাহেবের নেতৃত্ব মেনে নেয়। পাকিস্তান হবার পর ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগের কর্মীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে শেখ সাহেব যুবকর্মী সৃষ্টি করে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার করে জীবনের জয়যাত্রা শুরু করেন।

মানিক মিঞা সাহেব রাজনীতি করেননি কোনদিন। চাকুরী করেছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই শহীদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শহীদ সাহেব প্রথম তাঁকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসের সহকারী অফিস সেক্রেটারী, পরে 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে গেল ১৯৪৯ সনে। শহীদ সাহেব পাকিস্তানে এলেন, সঙ্গে এলেন মানিক মিঞা সাহেব।

আওয়ামী লীগ গঠিত হবার কিছুদিন পরেই মাওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' কাগজ বার করেন। ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রিন্টার ও পাবলিশার। দু'জনের মধ্যে কারো কাগজ চালাবার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—তাই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রথম কয়েক মাস পরে অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হতে লাগল—শেষে দু'পাতা মাসে একবার কেবল "ডিক্লারেশন"টা বাঁচিয়ে রাখছিল। মানিক মিঞা কলকাতা থেকে এসে—তাঁর ইত্তেহাদের অভিজ্ঞতা থেকে ভাবলেন যে, তিনি সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'কে দাঁড় করাতে পারবেন। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে আলাপের পর তিনি সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সঙ্গে তাঁর আর দু'জন কর্মী। আবদুল ওয়াদুদ এবং আবদুল আউয়াল। বছরখানেক কি যে কষ্ট গেছে তাঁদের উপর দিয়ে তা আতাউর রহমান সাহেব ও আমি জানতাম। আতাউর রহমান সাহেব "এড্ভার্টাইজমেন্টে"র জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর মক্কেলদের নিকট তাঁর "ফিস" কম নিয়ে ইত্তেফাকে "এড্ভার্টাইজমেন্ট" যোগাড় করে দিয়েছেন। শহীদ সাহেব এন. এম. খান ও আসগর আলী শাহ্কেও বলে দিয়েছিলেন সাহায্য করতে। অন্যদিকে হানিফ ব্রাদার্স ও বাবু রণদাপ্রসাদ শাহা এঁদেরও যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে বলেছিলেন।

কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মানিক মিঞা যেভাবে কাগজটাকে দাঁড়া করেছিলেন—তাঁর "রাজনৈতিক মঞ্চ" যেভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল—তা আমাদের দেশের

সাংবাদিকদের বিস্মিত করেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে আর কেউ এমনি করে বিনে পয়সায় একটা কাগজ হাতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিকে পরিণত করার কথা ভাবতে পারেনি আর পারবেও কি না সন্দেহ। একসময় এক মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য সকল পার্টির রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে খুশী রাখার চেষ্টা করেছেন—রাজনীতির উপর তাঁর প্রভাব ছিল বিস্তর। এমনকি শেখ সাহেব যখন ১৯৫৭ সনে বাণিজ্য-শিল্প-শ্রমমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন আমি বিদেশে জাতিসংঘে। সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্যে তিনি শেখ সাহেবকে জনগণ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের প্রচেষ্টায় তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয় এবং দু'জনে আবার একযোগে সংগ্রাম করতে থাকেন।

দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের নির্বাচনে বদরুদ্দীন সিদ্দিকী, সফিউল্লাহ্, ঠাণ্ডা মিঞা আরো কয়েকজনকে নিয়ে আমরা ফজলুর রহমান সাহেবের দলকে প্রথমবারের মত ভোটে পরাজিত করে কোর্টের সদস্য নির্বাচিত হই। ১৯৫৯ সনে মার্শাল ল' দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট ভেঙ্গে না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের আমি সদস্য ছিলাম।

নাজিমুদ্দীনের পতন, শাহাবুদ্দীনের রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্তি, ফজলুর রহমান সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির পরিসমাপ্তি—সবই মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের পথে অগ্রাভিযান।

নূরুল আমীন সাহেবের পক্ষে আর নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। শামসুল হকের নিকট মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর বত্রিশটা উপ-নির্বাচন বন্ধ করে রেখেছিলেন—শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হলো। নির্বাচন ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে। আমাদের শপথ ঐ নির্বাচনে জয়ী হতেই হবে। কারণ মুসলিম লীগের পরাজয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত ও শিল্পপতিদের এজেন্টদের পরাজয়। তারপর দিন আসবে যেদিন পূর্ববঙ্গ থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হবে।

লণ্ডন থেকে জেনেভায় এসে বেশ কিছুদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলাম তারপর দেশের পথে কায়রো হয়ে দেশে ফিরব স্থির করলাম।

১৯৫৩ সন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ঘটনা আমার জীবনের উপর রেখাপাত করেছিল। রুশ দেশে স্তালিনের মৃত্যুর পর লণ্ডনে বসে শুনেছিলাম যে, বেরিয়াকে ক্রুসচফ্, বুলগেলিন, কাগনোভিচ, মার্শাল জুকফ, মেলেনকফ প্রভৃতি সবই মিলে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেছে—তারপর ম্যালেনকফ্‌কে নেতৃত্বে বসিয়েছে। জেনেভায় এসে অবশ্যই শুনলাম যে, তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে।

ঐ বছরই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোসেনবার্গ এবং তাঁর পত্নীকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকরা আণবিক শক্তির গোপনীয় তথ্য রুশ দেশকে সরবরাহ করার অপরাধে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে এবং বহু লোকের আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁদের প্রাণভিক্ষা দেয়নি যার ফলে বৈদ্যুতিক চেয়ারে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন। আমরাও অনেকে কিউবা

থাকাকালীন ঐ রকম আবেদনপত্রে সই করেছিলাম। যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানের পূজারী অথচ তাদের দেশেই হিটলারের ইহুদী নিধনযজ্ঞের শিকার হবার ভয়ে যে রোজেন বার্গরা আশ্রয় নিয়েছিলেন মার্কিন মুল্লুকে তাদের মৃত্যু। এটা ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কি।

১৯৫৩ সন রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের করোনেশনের বছর—সুতরাং আমরা যারা কমনওয়েলথ্-এর নাগরিক তাদের প্রতি লন্ডনের বাস কন্ডাক্টার ও কাস্টমস্ অফিসারদের ভাল ব্যবহার পেয়ে এসেছি—যুক্তরাজ্যের গৌরব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কান্ডারী চার্চিলের সাহিত্যে নবেল পুরস্কার লাভ এক অপূর্ব আনন্দ এনে দিয়েছে। অবশ্যই আবার সেই বছরই একসময়ে লন্ডনের এক অতি সাধারণ নাগরিক যে পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়াছবিতে অপূর্ব হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন সেই চার্লি চ্যাপলীনকে সাম্যবাদী সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি অবশ্যই লন্ডনে ফিরে না গিয়ে সুইজারল্যান্ডই বাস করা স্থির করলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বাইশ বছর পর রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন। গুণের আদর হয়েছিল—তবে সময় লেগেছিল বিস্তর।

কায়রোতে যাব কি যাব না ভাবছিলাম কারণ জেনারেল নগীবের অধিনায়কত্বে রাজা ফারুককে ঈজিপসিয়ন সেনাবাহিনী ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে সিংহাসচ্যুত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। ১৯৫৩ সনে অবশ্যই কর্ণেল গামাল আবদুল নাছের নগীবকে নজরবন্দী করে নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আশ্চর্য ক্ষমতার খেলা। জেনিভা থাকতেই গাড়ীতে প্যারিস, পশ্চিম জার্মানী ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ঘুরে ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করলেন সেসব দেশের আই.এল.ও-তে মেহনতি মজুর প্রতিনিধিরা। অনেক ভেবেও শেষ পর্যন্ত কায়রো দু'দিন থাকার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারিনি কারণ "পিরামিড" সেটা ছিল আমার স্বপ্নের-ছোটবেলার সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। বৃটিশ মিউজিয়মে দ্বিতীয় রেমেসিস-এর বিরাট মূর্তি দেখে অভিভূত হবার পরে এবং মিশরের পুরাতন 'মমী' দেখার পর 'পিরামিড' দেখার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়েছিল। যদিও পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন বেড়াবার অনুকূলে ছিল না। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক "দেশ আমার তেল আমার" তাই তেলের জাতীয়করণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশে এমন ভীষণ আন্দোলন সৃষ্টি করলেন যে শেষ পর্যন্ত যুবক রেজাশাহ তাঁর সিংহাসন ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুতাবাসের সাহায্যে পালিয়ে জনতার রুদ্ররোষ থেকে প্রাণ রক্ষা করলেন—তারপর যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের সাহায্যে সেনাপতি জেনারেল জায়েদী শেষ পর্যন্ত মোসাদ্দেককে দমন করে অন্তরীণ করে রেখেছেন।

জেনেভা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। ওখানে অনেকেই জানাশোনা—দেশী বিদেশী এবং স্থানীয়। তাছাড়া সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। স্বাভাবিক হ্রদ, সুন্দর পাহাড়ের ছায়া, বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে ও রজ্জুতে ঝোলানো চেয়ারে বসে পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে—আবার সন্ধ্যায় রব্‌স্‌পিয়ারের সমাধি দ্বীপে বসে জালালী কবুতরগুলোকে গম ছিটিয়ে মজা দেখে দিন কাটছিল যদিও সুইসবাসীদের পয়সার লোভ ঐ আনন্দটাকে মাটি করে দিত। অমনি একটি দেশ থেকে বিপদসঙ্কুল দেশে যেতে খুব

ভাল লাগার কথা নয়।

তারপর একদিন রোম হয়ে কায়রো এলাম। এসে বুঝলাম না আসাই ভাল ছিল। চারদিকে তখনো সৈনিকদের পাহারা—বন্দুক নিয়ে রাস্তায় 'প্যারেড'। কোনরকমে গীজার পিরামিড এবং কয়েকটি স্ফিংক্স দেখে দেশের পথে যাত্রা। করাচী এসেও মনে হলো না দেশে এসেছি। যদিও সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। কেমন যেন এবার মনে হলো করাচী মধ্যপ্রাচ্যের অংশ, মরুভূমি, উট, দুম্বা, চেহারা সবই যেন মধ্যপ্রাচ্যের। বাংলাদেশের লোকের পক্ষে তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ হওয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে।

দেশে এসেই শুনলাম সাধারণ নির্বাচনের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। বৃদ্ধ ফজলুল হক সাহেব সরকারের এড্‌ভোকেট জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী সাহেব তাঁদের আওয়ামী মুসলিম লীগকে সজাগ করে তুলছেন। আবুল হাসিম সাহেবও তাঁর সেই দুর্দিনে নির্বাচনের কথা ভাবছেন। সাধারণ নির্বাচনের মুখে মাওলানা আক্রাম খাঁ পদত্যাগ করলেন। অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভা ডাকা হলো তাঁর পদত্যাপত্র বিবেচনা করার জন্য। মোহন মিঞা ও হামিদুল হক চৌধুরীরা ফজলুল হক সাহেবকে সভাপতি করতে চাইলেন। সভায় আক্রাম খাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো আর মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সাহেবের নাম ফকির আদুল মান্নান সাহেব প্রস্তাব করলেন। ফজলুল হক সাহেব তাঁর দলের অবস্থা দেখে পদত্যাগ করেন এবং পরে তাঁর বাড়িতে বসে নতুন পার্টি গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং তাঁর পুরাতন কৃষক-প্রজা পার্টি পুনর্গঠিত করার মনস্থ করেন। মোহন মিঞা ও হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে হক সাহেবের সঙ্গে যোগদান করেন। মোহন মিঞা ভাল সংগঠক আর হামিদুল হকের শক্তি, তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ছাড়াও তাঁর ইংরেজী দৈনিক "পাকিস্তান অবর্জাভার" হক সাহেবের শক্তি বৃদ্ধি করল। মুসলিম লীগের সংবাদপত্র রইল খাজা নূরুদ্দীনের "মর্নিং নিউজ"। আর মোহন মিঞার কাগজ দৈনিক "মিল্লাত"। দৈনিক মিল্লাতে সম্পাদক প্রথমে মোতাহার হুসেন সিদ্দিকী এবং পরে কবি ও সাহিত্যিক মরহুম সেকেন্দার আবু জাফর। দৈনিক "সংবাদ"-এর সম্পাদক খায়রুল কবির, নূরুল আমীন সাহেবের আত্মীয়—অর্থের যোগাড় করলেন রেজাই করিম সাহেব। তাঁর মাথার উপর তখন খড়গ ঝুলছে—বর্মা রিফিউজি ক্যাম্পের টাকা আত্মসাতের অপরাধে ধাবলে ট্রাইব্যুনাল তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তিন বছর জেল ও পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। তার ভাগ্য ভাল। তখনই পাকিস্তান হয়ে গেল এবং তিনি তার পিতা ও ভ্রাতাদের সহ ঢাকায় পালিয়ে আসেন। এসেই চট্টগ্রামের মুনসিফ ইউসুফ সাহেবের আদালতে একটি "ডিক্লারেটরী সুট" করে এক রায় পেয়ে যান যে, "বিদেশী কোর্টের" রায় তার উপর জারি করা যাবে না। সে রায়ের বিরুদ্ধে সরকার-এর পক্ষ থেকে যাতে আপিল না হয়—তার জন্যে দিনরাত নুরুল আমীন সাহেবের বাসায় থাকেন। নুরুল আমীন সাহেবও সুযোগ বুঝে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে "সংবাদ"-এর জন্যে এটা খুব মোটা অর্থ চাঁদা দিতে বলেন। রেজাই করিম সাহেব রাজী হয়ে গেলেন। খায়রুল কবির

(পরবর্তীকালে জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) সাহেবকে সাহায্য করতে এলেন "অবর্জাভার" থেকে সর্বজনাব জুহুর হুসেন (রায়পন্থী) আর কে. জি. মোস্তফা (সাম্যবাদী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত)।

এদিক থেকে আওয়ামী লীগের অবস্থা বেশি ভাল নয়—একখানা সাপ্তাহিক "ইত্তেফাক"—সম্পাদক মানিক মিঞা সাহেব। শহীদ সাহেব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ইত্তেফাককে দৈনিকে পরিবর্তিত করতে নির্বাচনের পূর্বে।

এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তার পূর্বে আর একটু পেছনে যেতে হয়। আমি মধ্যবিত্ত শব্দটি ব্যবহার করে যাচ্ছি—কিন্তু তার একটা ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়নি—সেজন্যে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি আলোচনা প্রয়োজন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কলকাতার অনেক সাধারণ লোক অজস্র টাকা উপার্জন করে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ নাম করা যায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। যিনি কোম্পানীর 'এজেন্সী' নিয়ে কেবল ধনী হননি নতুন সামন্তবাদ সৃষ্টি করেন এবং ঐ মুৎসুদ্দী শ্রেণীর স্বার্থেই "বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাই কলকাতার প্রথম মধ্যবিত্ত। জাতিতে হিন্দু—প্রথম ভদ্রলোক শ্রেণী। ভদ্রলোক শ্রেণীতে স্থান কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মাথার মণি—কায়স্থের কাজ লেখা। কেরাণী থেকে উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, কোম্পানীর গোমোস্তা পর্যন্ত। বৈদ্য সাধারণতঃ ডাক্তার তবে কায়েস্থের কাজ করতে বাধা নেই। এই তিনে মিলে "ভদ্রলোক" শ্রেণী। এদের মতে অন্য কোন লোক ভদ্রলোক বলে দাবী করতে পারে না। এরা কোম্পানীর সৃষ্টি এবং লর্ড মেকলের ভাষায় ভদ্রলোক অর্থেই—"ক্লার্ক"। এরা কলকাতার নাগরিক বা শহুরে। গাঁয়ের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন ভদ্রলোকদের দৃষ্টি পড়ল গ্রামের সম্পদের উপর—ফলে জমিদারী করার আকাঙ্ক্ষা।

বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন তাল সামলাতে পারছিল না। তারপর এল পাবনা জেলায় কৃষক বিদ্রোহ—খাজনা বন্ধের আন্দোলন। সুরেন বারুজ্যে ভদ্রলোকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন। বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে "ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন" গঠন করে গ্রামভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৮৫ সনে বেঙ্গল টেনেন্সী আইন পাস হলো প্রজারা অন্ততঃ বুঝতে পারল যে, সমাজে তাদের স্থান কতদূর এবং কোথায় সে সীমানা টানা হয়েছে। তিনি পূর্ববঙ্গের মফঃস্বল শহরে এসে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। জনতার সে সভায় দুঃস্থ মানুষের সম্বন্ধে দু'একটি ভাল কথা বলেই শহুরে ভদ্রলোকেদের সমস্যা যেন জনতার বিশেষ সমস্যা তাই বুঝিয়ে যেতেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল সাংবাদিকের স্বাধীনতা, পরিষদে দেশীয় প্রতিনিধির স্থান করা, আমলাদের গঠন পদ্ধতি নতুন করে সাজান যাতে দেশী লোক শাসনকার্যের কাঠামোতে কর্তৃত্ব করতে পারে। তাঁর বক্তৃতার শেষ কথা যে জনতার সমস্যা সমাধান এসব না হওয়া পর্যন্ত করা যাবে না। কিন্তু ঐগুলো সব

ভদ্রলোকদের সমস্যা আর সেজন্যে শক্তি সঞ্চয় করার অস্ত্র ঐ জনতা। এমনি করে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের শাসন-তান্ত্রিক শুকনো প্রস্তাবসমূহ থেকে তাঁর পন্থা অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপ। শহুরে মানুষের স্বার্থে জনগণের শক্তি জাগিয়ে তুলে তিনি ভবিষ্যতে জনগণকে সমস্যা সচেতন করে তুলতে সাহায্য করলেন।

ঠিক ঐ যুগেই জনাব ফজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাই প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরেণ হয়েও রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকেন। পথ ও পদ্ধতি সুরেন বারুজ্যের। গাঁয়ের কৃষককে নতুন শহরের মুসলমানদের সমস্যার সঙ্গে একাত্ম করে শক্তি সঞ্চয় করা। শহরের নতুন মুসলমান উকিল, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং চাকুরীজীবীদের "ভদ্রলোকের" আসনে সমাসীন করা। ঐ ভিত্তিতেই তাঁর কৃষক-প্রজা আন্দোলন। বৃটিশের কারখানায় তৈরী নবাব, নাইট, খানবাহাদুরদের নেতৃত্বের তুলনা করা যায় এক পুরুষ আগে হিন্দু মুৎসুদ্দীদের বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের। আর ফজলুল হক সাহেবের প্রজা পার্টির তুলনা করা যায় সুরেন ব্যানার্জীর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের। সুরেনবাবু বৃটিশ-রাজের কাছ থেকে যে ক্ষমতা দেশের লোকদের জন্যে চাইতেন ফজলুল হক সাহেব হিন্দু ভদ্রলোকদের নিকট থেকে তাই মুসলমানদের জন্যে চাইতেন। মুসলমানদের জন্যে বেশি আসন, বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, মুসলমানদের জন্যে চাকুরী ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ আর তার সঙ্গে প্রজাদের জন্যে সুবিধা আদায়। তিনি প্রজাদের জন্যে কি করেছেন তার চেয়ে তিনি কি দাবী করেছেন। যেমন ১৯৩৭ সনে ক্ষমতায় আসার পূর্বেই খাজা নাজিমুদ্দীন ফ্রি প্রাইমারী আইন (Free Primary Education Bill) কৃষি ঋণ আইন (Bengal Agricultural Debtors Act) পাস করেছেন। কিন্তু বাংলার জনগণের কাছে ঐসব আইন হক সাহেবের। হক সাহেবই এসবের জন্য প্রশংসার পাত্র। যে-ই ইসলামিয়া কলেজ করে থাকুক, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাঁর প্রচেষ্টায়ই হোক না কেন গ্রাম-বাংলার জনগণের জন্যে সব প্রশংসাই হক সাহেবের প্রাপ্য, কারণ হক সাহেবই মুসলমানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। হক সাহেব একাই নিপীড়িত, শোষিত গ্রাম-বাংলার প্রতিনিধি। তিনি শহরের শিক্ষিত মুসলমানদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে। এখানেই সুরেন ব্যানার্জী ও হক সাহেবের নেতৃত্বের বিশেষত্ব।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলতে আমাদের সমাজে যারা শহরে কাজ করে যেমন শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, কেরাণী, ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কর্মচারী, অফিসের কর্মচারী, উকিল বা ডাক্তারদের বুঝায়। এরা কাজের চেয়ে কথা বলে বেশি, রাজা উজির মারে চা-খানায়। রাজনীতি আলোচনা করে এবং রাজনীতিতে যারা পারে অংশগ্রহণ করে, যারা সংসারের চাপে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা রাজনীতিবিদদের কুৎসা করে সময় কাটায়। সবাইর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। তারা অবশ্যই শহরের কারখানার শ্রমিক বা মেহনতি লোককে গাঁয়ের মেহনতি লোকের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলে রাখে। গাড়ীর চালক, ওয়ার্কশপের বড় মিস্ত্রী এরা যত টাকাই

উপার্জন করুক না কেন তারা মধ্যবিত্তের সমাজের বাইরে—তাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে মানতেও উপরোক্ত স্কুল-কলেজে পড়া স্বল্প বেতনভোগী লোকেরা নারাজ। যদিও তাদের বিত্তহীনও তারা বলতে পারে না। অন্যদিকে ঐ মধ্যবিত্তের মধ্যে কেউ যদি মন্ত্রী হাইকোর্ট জজ, রাষ্ট্রদূত, সুপিরিয়র সার্ভিসের লোক, দেশ-রক্ষা বিভাগের উপরস্থ কর্মচারী, মিল বা ফার্মের মালিক হয় তখনই সে উচ্চ-মধ্যবিত্তের আসনে সমাসীন হয়—অবশ্যই তাদের লেখাপড়া জানতে হবে। আর যেইমাত্র সে আসনে বসা অমনি তারা মধ্যবিত্তের কুৎসার পাত্র হয়ে উঠে।

১৯৫৩ সনে বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরে সত্যি কোন স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে কি না এবং তারা কোন্ পটভূমি থেকে এসেছে তা এখনো সঠিক নির্ণয় হয়নি। বিত্তহীন দিনমজুরী করে জমির মালিক হয়ে হাল কিনে কৃষক হয়েই সে বিত্তহীনের পর্যায় থেকে উপরে উঠেছে—ছেলেকে স্কুলের পড়া শেষে শহরে চাকুরী পেয়ে সে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সেখান থেকে কিছুটা উপরে উঠতে পারলেই মধ্যবিত্ত। এমনি করেই উচ্চ মধ্যবিত্তের জন্মও হতে পারে—অবশ্য শহরের বাসিন্দা হতে হবে—গাঁয়ে থাকলে উচ্চ মধ্যবিত্তের আসন পায় না। আবার এদেরই সন্তান-সন্ততি-সাধারণ মধ্যবিত্ত হয়ে কেউ বা সর্বসান্ত হয়ে-সর্বহারার দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মধ্যবিত্তের রাজনীতি তাই সদা পরিবর্তনশীল এবং সে কারণেই সমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা দেয়,—কেউ কঠিন পরিশ্রম করে জীবনযাপন করতে বড় একটা চায় না। আবার অসৎ উপায়ের উপার্জনের টাকার সঙ্গে ছ'টি রিপুর তাড়নায় তাদের চিত্ত অস্থির হয়ে উঠে। তারা ক্রমাগতই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের ফাঁদে পড়ে। পার্টি ও রিসেপশনে বিশেষ করে বিদেশীদের ইন্দ্রজালে ও সৌন্দর্যের ঝলমল আবহাওয়ায় জড়িয়ে পড়তে চায়। তারা হুইস্কি, শেমপেইন, কোনিয়াকের ভক্ত হয়ে উঠে এবং যে হারে তাদের চরিত্রের পতন হয় সে হারেই জীবনের দূষিত মান রক্ষা করার জন্যে অন্ধকার পথে পয়সার জন্যে পা বাড়িয়ে দেয়। এসব মধ্যবিত্তের স্বার্থেই এখন পর্যন্ত আমাদের নেতৃত্বের উৎপত্তি তাই ক্ষমতা গ্রহণ করার পর যাদের উপকার করার জন্য নির্বাচন চালান হয়েছিল তাদের কথা ভুলে শুধু নিজেদের কথাই ভেবে মরে। অবশ্যই এটা যে কেবল আমাদের দেশের জন্যেই সত্য তা নয়—অন্যান্য দেশের উপরও প্রযোজ্য। আনুরিন বিভান বলেছেন,—নির্বাচনের সময়ই কেবল দেশের দরিদ্র শ্রেণী "এজেন্ডাভুক্ত" হয় নির্বাচনের শেষে ঐ "এজেন্ডা" আবার পাঁচ বছরের জন্যে "পোস্টপন্ড" করা হয়ে থাকে। বামপন্থীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য শাসন কাঠামো ঠিক রাখার জন্যে।

নেতাদের মধ্যে হক সাহেবেরই বাংলার মানুষের চেহারা ও নাম মনে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। যার সঙ্গে তিনি কিছুদিনও কাজ করেছেন অনেক বছর পরেও তাকে নাম ধরে ডেকে কাছে বসাতে অসুবিধা হয়নি ফলে সবাই তাঁর স্নেহে মুগ্ধ হতো এবং তাঁকে আত্মীয় বলে ভাবতে অসুবিধা হতো না অন্য পক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব সারা বাংলায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী রাজনীতি করেও পাঁচশত লোকের নাম মনে রাখতে পারেননি ফলে তাঁর কাছ থেকে সাধারণ লোকেরা কোন স্নেহের বা অন্তরের স্পর্শ পায়নি কেবল

কয়েকশ' লোক ছাড়া। ফলে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে বিশেষ শিষ্যদের উপর কতকটা বিশেষ ধরনের এজেন্সী সীস্টেম। তাই ফজলুল হক সাহেব যে কোন "প্ল্যাট-ফরম" পেলেই ওটাকে নিজস্ব করে নিতে পারতেন। শহীদ সাহেবের জন্যে প্রয়োজন হতো তাঁর বিশেষ শিষ্যদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সেটা মুসলিম লীগই হোক বা আওয়ামী লীগই হোক। এদিক দিয়ে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মিল শহীদ সাহেবের তুলনায় অনেক বেশি। আবুল হাসিম সাহেবের ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি অনেকটা অন্য ধরনের। তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে আবার চাই নিজস্ব পার্টি যাদের থাকবে একটা আদর্শ, যারা হবে নিঃস্বার্থ কর্মী এবং বিশেষ কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী। তাদের খরচ পার্টি বহন করবে। অনেকটা লেনিনের বলশেভিক পার্টি থেকে বোধহয় ধার করা। তিনি ১৯৪৪ সনে রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐ পথেই দু'বছরের মধ্যে সারা বাংলার একচ্ছত্র নেতা হতে পেরেছিলেন। বিরোধী দলসমূহের চারজন নেতার মধ্যে এক আবুল হাসিম সাহেব ছাড়া আর কারো রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন আদর্শ ছিল না বা কারো সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞানও ছিল না, তবে অনেক কারণে তাঁর রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত স্বল্পায়ু হয়েছিল বাকী তিনজনের তুলনায়।

১৯৫৩ সনের নভেম্বর মাসে বামপন্থী ছাত্ররা এবং যুবসম্প্রদায় ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল সেই ছাত্ররা নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করার জন্যে আন্দোলন চালালেন। ফজলুল হক সাহেব ও মাওলানা ভা-ানী যথাক্রমে কৃষক-প্রজা পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি একটি "যুক্তফ্রন্ট" গঠন কবতে রাজী হলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান "যুক্তফ্রন্ট" গঠনের বিরোধিতা করছিলেন। শহীদ সাহেব ঢাকায় এলেন এবং তিনিও যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা ও হামিদুল হক, মোহন মিঞা, আবদুস সালাম খান প্রভৃতি কিছু কিছু কৃষক-প্রজা ও আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা যুক্তফ্রন্ট গঠনের উপর জোর দিলেন—শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমান রাজী হলেন এবং হক সাহেব ও মাওলানা সাহেব "যুক্তফ্রন্ট" চুক্তিটি সই করেন। শহীদ সাহেব বললেন যে, দু'টো প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরা যখন সই করেছেন তখন আর কোন সইয়ের প্রয়োজন নেই। "যুক্তফ্রন্ট" শেখ সাহেবের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফরিদপুরের যে নেতাদের তিনি স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে প্রায় বহিষ্কার করে ফেলেছিলেন—তাঁরাই আবার প্রাদেশিক রাজনীতিতে "যুক্তফ্রন্টে"র বদৌলতে নেতা হয়ে বসলেন।

শেখ সাহেব জনাব হক সাহেবের মতই তাঁর কর্মীদের সবার নাম মনে রাখতে পারতেন এবং হক সাহেবের মতই তাঁর দলের সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতেন। হক সাহেবের মতই শেখ সাহেব খাঁটি বাঙালী পরিবেশে বেশি আনন্দ পেতেন—আবার হক সাহেবের মতই তাঁর পূর্ববর্তীরা বা সমসাময়িক নেতারা দেশবাসীর স্বার্থে যে কাজটুকু করেছেন তার সম্পূর্ণ প্রশংসার অধিকারী হতো পারতেন। তাঁদের দু'জনার এ ধারণা ছিল যে, স্যার আবদুর রহিম ইসলামিয়া কলেজের জন্যে বা

নাজিমুদ্দীন শিক্ষকদের বা কৃষকদের জন্যে কি করেছেন তা কাগজে বা সরকারী দলিল-দস্তাবেজে যাই থাকুক দেশের শতকরা নব্বুইজন নিরক্ষর লোকের নিকট সেসব কাজ কার দান বলে পৌঁছেছে সেটাই বড় কথা। শেখ সাহেব ফজলুল হক সাহেবের মতই সাধারণ বাঙালীর তুলনায় দীর্ঘদেহের এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন—সত্যি বলতে তাঁরা দু'জনই দক্ষিণ বাংলার লোক এবং অনেক ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মিল ছিল।

শেখ সাহেব অন্যদিকে শহীদ সাহেবের মতই সংগঠনকে শক্তিশালী করে ক্ষমতা দখল করার পক্ষপাতি ছিলেন এবং যাতে তাঁর নিজস্ব লোকের নেতৃত্বে সে সংগঠন গঠিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। শহীদ সাহেব রাজনৈতিক মঞ্চ ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে মনে করতেন না—মঞ্চের অভিনেতা যেমন সকল সময় স্মরণ রাখে যে, সকলের দৃষ্টি রয়েছে তার প্রতি তেমনিভাবে রাজনৈতিক নেতা শহীদ সাহেব রাজনীতি ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতেন যে, তাঁর দিকে সকলের দৃষ্টি তাই চলাফেরায় কথাবার্তায়, বক্তৃতা মঞ্চে তিনি ছিলেন অভিনেতা, এখানে নেতা এবং অভিনেতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কেবল যখন ক্ষমতায় আসতেন তখন কঠিন মানুষ হতেন। শেখ সাহেবও তাঁর নিকট থেকে অভিনয়ের ভাবভঙ্গি আয়ত্ত করাকে প্রয়োজন মনে করতেন। তারপর শেখ সাহেব আবুল হাসিম সাহেবের নিকট শিখেছিলেন সংগঠনের মধ্যে আবার তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুগত এবং আস্থাশীল দল গড়ে তোলা এবং তাঁদের নেতৃত্বে সংগঠনকে সংহত করা। তারপর শহীদ সাহেবের পদ্ধতি অনুসারে একেবারে নিজস্ব এজেন্ট সৃষ্টি করে তাঁদের কথামতই রাজনীতি পরিচালনা করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। তবে শহীদ সাহেব তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে রাজনীতির মধ্যে কোনদিন স্থান দেননি, শেখ সাহেব এ ব্যাপারে জনাব হক সাহেবকে অনুসরণ করেছেন। শেখ সাহেব শহীদ সাহেবের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন কারণ শহীদ সাহেব সংগঠনের সকল প্রকার অর্থের প্রয়োজন মেটাতেন। কিন্তু তিনি হক সাহেব, শহীদ সাহেব বা আবুল হাসিম সাহেবের মত লেখাপড়ার দিকে খেয়াল না করায় তাঁদের গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হননি। আমার জানামতে জেলজীবনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই ছিল তাঁর একমাত্র নিত্য সহচর।

যুক্তফ্রন্ট গঠন করার পর বড় সমস্যা হলো সেক্রেটারিয়েট কিভাবে গঠন করা হবে। কোন পার্টি কোন পার্টিকে বিশ্বাস করে না—সুতরাং দু'জন যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো—কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে জনাব কফিলুদ্দীন চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ পার্টির পক্ষ থেকে জনাব আতাউর রহমান খান সাহেব। কিন্তু এভাবে সেক্রেটারিয়েট চালনা করা সম্ভব নয় তাই শহীদ সাহেব ও হক সাহেব আমাকে ডেকে বললেন যে, আমি সেক্রেটারিয়েটের ভার নিতে পারি কি না কারণ আমি দু'টোর কোন পার্টিরই সদস্য নই। আমি শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম যদিও কাজটি ছিল দূরুহ। আমরা নভেম্বর মাসে সদরঘাট সিম্পসন রোডে অফিস খুলে বসলাম। আমার একার পক্ষে যেহেতু অত বড় অফিস চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল সেজন্যে জমিরুদ্দীন সাহেবকে (তখন তিনি আতাউর রহমান সাহেবের জুনিয়র হিসেবে কাজ করছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের লোক কিন্তু ঢাকায় তাঁর চাকুরীতে "অপসন" দিয়ে পরে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন) সহকারী সেক্রেটারী করে নেয়া হলো এবং হিসাব রক্ষার কাজ তাঁকে দেয়া হলো, কারণ

ট্রেজারার আবদুস সাত্তার সাহেব (এডভোকেট পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পরে জাস্টিস)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না দৈনন্দিন হিসেব রক্ষা করা। কিন্তু এ খবর যখন কৃষক-প্রজা পার্টি অফিসে পৌছল তখন জমিরুদ্দীন সাহেব আওয়ামী লীগের লোক সেই অজুহাতে সোলেমান সাহেবকে পাবলিসিটি সেক্রেটারী করে পাঠিয়ে দিলেন। একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো মনোনয়ন দেবার জন্যে, তার চেয়ারম্যান করা হলো শহীদ সাহেবকে এবং সমসংখ্যক প্রতিনিধি দু'পক্ষ থেকে সেখানে স্থান পাবে বলে স্থির হলো। একটি আপিল বোর্ড হলো ফজলুল হক সাহেব, মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে নিয়ে। অর্থাৎ ১৯৫৩ সনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের সেক্রেটারিয়েটের কাঠামো ঠিক হলো।

ইত্তেফাককে দৈনিকে পরিবর্তন করা হলো এবং ইত্তেফাককে বলা হলো যুক্তফ্রন্ট-এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে কারণ জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) সাহেবও কোন পার্টির লোক ছিলেন না। মোহন মিঞার "মিল্লাত" ও হামিদুল হকের "পাকিস্তান অবর্জাভার" কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্যদের কাগজ। সুতরাং তাঁদের কাগজকে যুক্তফ্রন্টের মুখপাত্র বলে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। ইত্তেফাক আমার সহিযুক্ত চিঠি, বিবৃতি বা নির্দেশই ছাপতো অন্য কোন বিশেষ নেতাদের নির্দেশ ছাপাত না। ফলে পর বৎসর নির্বাচনের পূর্বে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে যুক্তফ্রন্ট রক্ষা পেয়েছে।

❐